অবশেষে আমি সত্যপথের সন্ধান পেলাম

ডঃ মুহাম্মদ আল তিজানী আল সামাভী

ভূমিকা

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম"

আমার এই গ্রন্থটি সাধারণতঃ একটি ভ্রমণকাহিনী। জীবন্ত গবেষণা। আকীদার জগতে একজন মাজহাবী লেখক ও দ্বীনি গবেষকের এটি একটি কষ্টসাধ্য অনুসন্ধিৎসা।

যেহেতু এই গবেষণার পূর্ণ ফসল--স্বচ্ছ জ্ঞান ও গভীর চিন্তা শক্তির উপর নির্ভরশীল, যে জ্ঞান–অনুভূতি মানুষকে অন্যসব সৃষ্টি থেকে উন্নততর–করেছে; সেহেতু আমি পুস্তকটি প্রত্যেক সত্য প্রত্যাশী জ্ঞানীদেরকেই উপহার দিচ্ছি। যারা আপন চিন্তা শক্তি, যাচাই ও গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বাতিলের বেড়াজাল থেকে সত্যকে চিনে পৃথকীকরণ করতে পারে, যারা সব বক্তব্যই ন্যায়ের মানদন্ডে মেপে অধিক যৌক্তিকতাকে প্রাধান্য দিতে পারে এবং কোরআন হাদীসের মহাসমুদ্র ঘেটে কোনটা জোরালো কোনটা হালকা, কোনটা যৌক্তিক কোনটা অযৌক্তিক, কোনটা দলিলী আর কোনটা গতানুগতিক আবেগ– তা পৃথক ও বিন্যস্ত করতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ

"যারা সব কথা শুনে ভালগুলোর অনুসরণ করে, সে সব লোক তারাই যাদের আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন এবং তারাই প্রকৃত জ্ঞানী।" (আল কোরান –৩৯ঃ১৮) সেই সব ব্যক্তিদের খেদমতে বইটি উপস্থাপন করলাম এ আশায়, যেন আল্লাহ বিভ্রান্তির আগেই আমাদের চোখ খুলে দেন, হেদায়াত করেন, অন্তরকে নূরের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। খোদা আমাদের কাছে সত্যকে এমনভাবে স্পষ্ট করে দেন যাতে বাতিলের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। আমরা যেন অসত্য থেকে বাঁচতে পারি এবং তিনি যেন আমাদেরকে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করেন। অবশ্যই তিনি শ্রবনশীল ও প্রার্থনা কবুলকারী।

– মুহাম্মদ আল তিজানী আল সামাভী

প্রকাশকের কথা

এই বই আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার বাসিন্দা ও তিউনিসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক জনাব ডঃ মুহাম্মদ তিজানী আল সামাভীর গবেষণামূলক বই। যা ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশে, অনেক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে সেই বইয়ের উর্দু "ফির ম্যায় হেদায়াত পা গায়া" বা ইংরেজী "Then I was guided" –এর বাংলা অনুবাদ করেছি। জনাব তিজানী সাহেব নানা ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে সত্য পথের সন্ধ্যান পেয়েছেন তা প্রতিটি পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন। তিনি কোন মতের অনুসারী না হয়ে খোলামন এবং সত্য সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন এবং সত্য মিথ্যা কিভাবে পৃথক করে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে বর্জন করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন।। আল্লাহ্ও তাই বলেছেন, "তুমি সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে বর্জন কর সেটা যতই কঠিন হোক না কেন।" বাংলা ভাষা ভাষীদের মধ্যে যারা সত্য সন্ধ্যানী গবেষক আছেন এই বই তাদের উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। সম্ভাব্য সতর্কতা সত্বেও কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। আশা করি আগামীতে সম্মানিত পাঠক–পাঠিকাদের সহযোগিতায় সে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা হবে।

–প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়
প্রকাশকের কথা
ভূমিকা
আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ
হাজ্জ এ বায়তুল্লাহ্
সফল ভ্রমণ-মিশরে
সমুদ্র পথের আলোচনা
আমার প্রথম ইরাক সফর
জনাব আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও হযরত ইমাম মূসা কাজেম (আঃ)
সন্দেহ ও প্রশ্নাবলী
নাজাফ সফর
উলামাদের সাথে সাক্ষাত
সন্দেহ প্রবণতা ও অস্থিরতা
হেজাজের সফর
গবেষণার সূচনা
বিশদ অধ্যয়নের সূচনা, নবীর সাহাবীদেরকে শিয়ারা ও সুন্নিরা যে যেভাবে দেখেছে
হুদাইবিয়ার শান্তি সন্ধিতে সাহাবীদের আচরণ
বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনা ও সাহাবী
উসামার সৈন্যবাহিনী ও সাহাবী
সাহাবাদের ব্যাপারে কোরআনের ভাষ্য
কুফরী অবস্থানে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার আয়াত
জিহাদের আয়াত
সাহাবাদের ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) যা বলেছেন
দুনিয়া লাভের প্রতিযোগীতা সম্পর্কিত হাদীস
সাহাবাদের সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মতামত
সাহাবীরা এমনকি নামাজেও পরিবর্তন করেছে
সাহাবাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান
পরিবর্তনের সূচনা
একজন আলেমের সঙ্গে কথোপকথন
জ্ঞানালোক প্রাপ্তির কারণসমূহ
জনাবে ফাতেমা (আঃ) এর সাথে আবু বকরের মতবিরোধ
যেসব হাদীস আলী (আঃ) এর অনুসরণ ওয়াজিব করা হয়েছে
মূল বক্তব্যের বিরুদ্ধে গবেষণা চালানোর ফলে মুসলিম উম্মার এ দুর্দশা
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
গবেষণার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বন্ধুদের প্রতি আমন্ত্রণ
সত্যের পথে পরিচালনা

আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ

এখনও আমার স্মৃতিতে ঘটনাটি উজ্জ্বল হয়ে আছে, আমার দশ বৎসর বয়সে, যেদিন আব্বা রমজানের তারাবী পড়াতে মহল্লার মসজিদে আমাকে নিয়ে যান এবং নামাজে দাঁড় করিয়ে দেন যা দেখে স্বভাবতই মুসল্লিগণ অবাক হয়ে যায়।

ক'দিনেই বুঝতে পারলাম, আমার শিক্ষক এ ধরণের কিছু ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন যাতে আমি আব্বার সাথে অন্তত ৩/৪ রাত তারাবির নামাজ জামাতে পড়ি এবং অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। হলোও তাই, এক সময় আমিই মহল্লার সম-বয়সীদের জামাত পড়াতাম এবং অপেক্ষায় থাকতাম কখন ইমাম সাহেব কোরআনের অর্ধেক শেষ করবেন।

আমার পিতার আকাংখা ছিল আমি মাদ্রাসা ছাড়াও বাড়ীতে রাত্রে কিছুক্ষণ কোরআন পড়ি। বাড়িতে যার নিকট কোরান শিক্ষা গ্রহণ করতাম তিনি অন্ধ ও একজন বিচক্ষণ কোরআনে হাফেজ এবং আমাদের আত্মীয় ছিলেন। এর ফলে যে বয়সে ছেলেরা সাধারণতঃ মনযোগ দিয়ে লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলার জীবনকে অধিক ভালবাসতো সে বয়সেই আমি কোরআনের অর্ধেক হেফজ করে ফেলি। আর তাই আমার শিক্ষক তার অনুগ্রহ ও উদ্ভাবনী মানসিকতা দিয়ে আমাকে বেছে নিয়ে তেলাওয়াতের নিয়ম-কানুনই শুধু নয় বরং বার বার খোজ-খবর নিয়ে, কোরাআন শিক্ষার প্রতি আমাকে মনযোগী করে তোলেন। ফলে পরবর্তীতে আমি যখন জামাতে নামাজ আদায় ও কোরআন তেলাওয়াতের পরীক্ষায়, আমার পিতাও শিক্ষকের ধারণার চেয়েও বেশী নাম্বার পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হই, তখন গুরুজনদের সাথে সাথে এলাকাবাসীও আমাকে খুব আদর-স্নেহ করতে থাকেন। তারা আমার প্রশংসার সাথে সাথে

আমার আব্বাজানের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও শিক্ষককেও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। সবাই এক বাক্যে বলতে থাকেন সবই মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে হয়েছে।

আমার জীবনের সেই অধ্যায়টা এমনই আনন্দঘন ছিল যা মনে হলে আমার বুক আত্মগর্বে ফুলে উঠে। সেটা স্মৃতিবিস্মৃতি হওয়া আমার জন্যে সত্যিই অসম্ভব। কারণ আমার সুনাম এবং খ্যাতি শুধু মহল্লায়ই নয়, গোটা শহরেই এক সময় ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে সুখকর হলো রমজানুল মোবারকের সেই বরকতময় রাতগুলো, যে-গুলো আমার ধর্মীয় জীবনে- মনকে এমন রেখাপাত করে যে নিদর্শনগুলো আজও জ্বল জ্বল করছে। কেননা সে সময় যখনই আমি প্রশংসাকারী অসংখ্য মানুষের ভীড় ঠেলে প্রশস্ত রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চেয়েছি তখনই প্রশংসাকারীর ভিড়েই একাকার হয়ে গেছি। অতীতের এই স্মৃতিচারণই আমাকে আধ্যাত্মিকতার উচুস্তরে পৌঁছতে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আমার মনোজগতকে এক ঈমানী নূরে আলোকিত করে, জীবনে দায়িত্বানুভূতির নতুন প্রেরণা জাগায়।

এগুলো সেই প্রেরনা ও দায়িত্বানুভূতির বোঝা যা বাবা আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, বা এও বলা যায়- এই যান্ত্রিক কুটকৌশলের যুগে জামাতের ইমামতির বোঝা শিক্ষক আমার উপর চাপিয়ে দেন, অথচ সর্বদাই আমি অনুভব করি এ দায়িত্ব পালনের মত উচ্চতর মান আমার অর্জিত হয়েছে কি না? অথবা অন্ততপক্ষে যে স্বপ্ন আমাকে নিয়ে মুরুব্বীগণ দেখতেন, সেখানে পৌঁছার ব্যাপারে আমার কোন গাফলতি আছে কিনা? কারণ আমি আমার শৈশব ও যৌবন তুলনামূলকভাবে ভাল কাটিয়েছি; সেখানে ক্রুটি ও উচ্ছ্বাসের সংমিশ্রন ছিল, কিন্তু অধিকতর আনুগত্য ও সচেতনতার উদ্দীপনাও একে বারে কম ছিল না। আল্লাহর রহমত, তিনি আমাকে হেফাজত করেছেন। আপন ভাইদের মাঝেও আমি কিছুটা ভিন্নধর্মী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলাম।

এটা অস্বীকারের উপায় নেই, আমার জীবন গঠনে আমার মরহুমা মাতার হাতও কম ছিল না। সেই ছোট সময়, সবেমাত্র যখন বুঝতে শিখেছি, তখন তিনি নামাজ, পবিত্রতার মাসলা-মাসায়েলের সাথে সাথে আমাকে আল কোরআনের ছোট ছোট সূরাগুলো মুখস্ত করান। যখন বড় হয়েছি, তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুটা চোখে চোখে রাখতেন। মা আমাকে মানুষ গড়ার শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর মৃত আত্মার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হউক!

— **ডঃ মুহাম্মদ আল তিজানী আল সামাভী**

আমার নাম সম্পর্কে কিছু কথা

আমার নাম তিজানী রাখার অন্যতম কারণ হলো 'সামাভী' বংশের এই শব্দটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। মূলতঃ ঘটনা হলো- আলজেরিয়া থেকে এসে যখন শায়খ আহমদ তিজানীর পুত্র 'কাফসা' শহরে 'সামাভী'র গৃহে মেহমান হন, সে সময় থেকেই শহরের অধিকাংশ লোক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষ করে জ্ঞানী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সবাই এই 'তরিকা-ই-তিজানিয়ার' অনুসারী হয়ে যায়। আর 'সামাভী' বংশের গোটাটাই এই তিজানী তরিকার ভক্ত হয়। এ জন্যে আমার মা আমার নাম তিজানী রাখেন, আর এ নামের জন্যে আমিও 'সামাভীয়ার' সকলেরই আদরের ধন ছিলাম। যেখানে ২০টির মত গোত্রের বসতি ছিল এবং এর বাইরেও আমার পরিচিতি সবার কাছেই ছিল। যারা 'তিজানীদের সাথে বন্ধুত্বও বিশ্বাসে সম্পৃক্ত ছিল। আর এ কারণেই রমজানের যে বরকতময় রাতে কোরানের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হই- সে সব কথা কিছুটা আগেই বলেছি, সে রাতে সমস্ত মুসল্লিগণ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, হাতে চুমু দিয়ে দিয়ে বলেছে-এসবই আমাদের পীর শায়খ আহমদ তিজানীর বরকতে হয়েছে। আর সবাই আমার মাকেও এজন্য ধন্যবাদ দিয়েছে।

একটি কথা এখানে বলা খুবই প্রয়োজন যে 'তরিকা-ই-তিজানীয়া' আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লেবানন, সুদান, মিশর ও পশ্চিমাদের মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ। এর অনুসারী একটি বড় গ্রুপও আছে যারা অন্য কোন অলী আল্লাহদের কবর জিয়ারত করে না। কারণ তাদের বিশ্বাস, পৃথিবীতে যত আউলিয়া আছেন সকলেই জ্ঞানের ব্যাপারে একে অন্যের মুখাপেক্ষী, একমাত্র শায়খ আহমদ তিজানীই এমন একজন অলী আল্লাহ, যিনি স্বয়ং হুজুর (সাঃ) থেকে বিরাট জ্ঞানের ভান্ডার পেয়েছেন। অথচ তিজানীর সময়কাল নবুওয়াতের

তেরশত বৎসর পরের। উপরন্তু এরা বর্ণনা করে -শায়খ আহমদ তিজানী বলেছেন যে, রাসুল (সাঃ) জাগ্রত অবস্থায়ই আমার কাছে এসেছেন, স্বপ্নে নয়, আর এটাও বলেন- তার পীর সাহেব পূর্ণ নামাজের যে বর্ননা দিয়েছেন তা ছত্রিশ খতম কোরআনের চেয়েও উত্তম।

আমি আমার লেখার কলেরব বৃদ্ধি করতে চাই না তাই 'তিজানীয়া তরিকার' আলোচনা এখানেই সমাপ্তি টানছি। ইনশাল্লাহ এ কিতাবের অন্য জায়গায় বিষয়টি নিয়ে আবারও আলোচনা করবো।

আমিও আর সব যুবকদের মত তাদের সেই বিশ্বাসকেই বুকে ধারণ করে কৈশোরের দরজা পেরিয়ে যৌবনের-ঘরে পা দিয়েছি। তবে আল্‌হামদু লিল্লাহ আমরা সকলেই মুসলমান- সকলেই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে সম্পৃক্ত। এবং মদীনায় সমাহীত ইমাম মালেক (রাঃ) এর মাজহাবের অনুসারী, তবে উত্তর আফ্রিকায় যে সব বিভিন্ন সুফি-সাধক আছেন আমরাও তাদের সংস্পর্শের বাইরে নই। আপনি শুধু এক 'কাফসা' শহরের কথাই ধরুন সেখানে তিজানীয়া, কাদেরীয়া, রাহমানিয়া, ইসাবিয়া ইত্যাদি সিলসিলা বর্তমান আছে।তাদের প্রত্যেকের অনুসারীও আছে। এবং কোরআন খতম, খাৎনা, সাফল্য-ব্যর্থতার মান্নত ইত্যাদি ধরনের অসংখ্য মাহফিল রাতভর হয়। সে গুলোতে প্রত্যেক সিলসিলার গজল, জিকির-আজকার পড়া হয়। এসব সুফি সাধকদের তরিকা দ্বীনি নিদর্শন ও আউলিয়ায়ে কেরাম, সালেহীনগণের সম্মানের ব্যাপারে খুবই গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে।

হজ্জ এ বায়তুল্লাহ

"আরবী এবং ইসলামী গবেষণা পরিষদের" মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সম্মেলনে যোগদানের জন্য, তিউনিসিয়ার 'জাতীয় গবেষনা পরিষদ' তিউনিসিয়ার প্রেরিত ছয় জনের সাথে আমার নামও অন্তর্ভূক্ত করে দেয়; যারা মক্কা কন্‌ফারেন্সে প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। আর সে জন্যেই গোটা প্রতিনিধি দলে নিজেকে ছোট ও খুবই সাধারণ মনে হতে থাকে। কারণ–দলের দু'জন ছিলেন অধ্যাপক, তৃতীয়জন ছিলেন রাজধানীর একটি বড় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, চতুর্থজন ছিলেন লেখক, পঞ্চমজনের পরিচয় আমার মনে নেই, তবে সম্ভবত তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কোন নিকটআত্মীয় হবেন হয়তো।

আমাদের এই ভ্রমণটা ছিল মূলত অনির্ধারিত, ফলে নিজ শহর "কাফসা" থেকে রওনা হওয়ার পর প্রথমে আমরা এথেন্স যাই, সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করে আম্মামে পৌঁছি। সেখানেও চার দিন অবস্থান করি, তারপর সৌদি যাই। সম্মেলনে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তখন পবিত্র 'হজ্জ্ব এ উমরা' কাজ সম্পাদন করি। আল্লাহর ঘরে প্রথম বারের মত প্রবেশ করতেই মনে হয়, আমি যেন আমার অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি; মন ছটফট করছিলো যেন হাড্ডিমাংস চিরে বেরিয়ে এসে খোদায়ী নিদর্শন, পবিত্র বায়তুল হারামকে দু'চোখ ভরে দেখব; যাকে দেখার জন্য দিবারাত্র কতই না স্বপ্ন দেখেছি। চোখের পানির বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন নেমে আসে দু'চোখ ভরে। মনে হয় আমি নিজেকে কোথায় যেন ডুবিয়ে দিয়েছি। তখন মনে হচ্ছিলো ফেরেস্তা স্বয়ং আমাকে উঠিয়ে হাজীদের উপর দিয়ে বলাকার মত কাবার ছাদে নিয়ে গেছে, আর আত্মহারা আমি সেখানে সর্বশক্তি দিয়ে 'তলবিয়া' ঘোষণা করছি। 'লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক" আমি হাজির প্রভু, তোমার দরবারে হাজির।

সঙ্গী হাজীদের তালবিয়া শুনে আমার মনে হলো বেচারারা হজ্জের জন্য টাকা-পয়সা, মাল-সামানা তৈরী করতে ও প্রস্তুতি নিতে নিতেই জীবন সায়াহ্নে এসে গেছে- তারা কি করে আমার মত বেগবান ও জজবাপূর্ণ হবে? আমি আল্লাহর রহমতে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই, হঠাৎ করে এখানে এসে গেছি। যখন আমার বিমানের টিকেট কনফার্ম হলো, হজ্জের ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, তখন আমাকে আব্বা কান্নাভেজা কণ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলছিলেন- "হে পুত্র তোমার যাত্রা শুভ হউক। খোদারই ইচ্ছা ছিল যে খুব অল্প বয়সে তুমি হজ্জের বরকত পাবে। 'তুমি সৈয়দ সিদি আহমদ তিজানীর সন্তান আল্লাহর ঘরে যেয়ে আমার জন্য দোয়া করো, যাতে আমারও তার ঘর জিয়ারতের সৌভাগ্য হয়।"

এজন্যে আমার মনে হয় 'কাবার প্রভু' আমাকে তার অনুগ্রহের সাহায্যে ডাক দিয়েছেন এবং যেখানে পৌছার আগ্রহ আমার চিরদিনের, সেখানে তিনি আমাকে পৌছিয়েছেন। এই পবিত্রতম জায়গায় কত নবী-রাসুল, বুর্জুগ মৃত্যুর কোলে নিশ্চিন্তে আজীবনের জন্য ঘুমিয়ে আছেন। অতএব বুক ফেটে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ার অধিকার আমার চেয়ে বেশী আর কার আছে? এই খোদায়ী অনুভূতি ও স্পর্শকাতর মন নিয়েই আমি নামাজ, তাওয়াফ, সাফা-মারুয়ার সায়ী ও জমজমের পানি পান করেছি।

আমি জাবালে নূর ও জাবালে রাহমাতে, যেখানে মানুষ একে অপরকে অতিক্রম করার পাল্লা দিয়ে চলে। আরোহন করেছি হেরা পর্বতের গুহায় একি অবস্থা। মূলতঃ এগুলো হলো এশকে এলাহীর উচ্চাসনে পৌছার মাধ্যম। এই সব স্থানগুলোতে দেখা গেল একজন সুদানী যুবক ছাড়া আমার আগে কেউ পৌছতে পারেনি। গন্তব্যে গিয়ে আবার ফিরতে থাকি যেন হুজুর (সাঃ) এর কোলে প্রত্যাবর্তন করছি এবং তাঁর পূতপবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের সুঘ্রাণ অনুভব করছি। এই স্মৃতি আমার অন্তরের এত গভীরে গেথে আছে- পাথরের খুদাই মুছে গেলেও সেই খোদাই অনুভূতি বিস্মৃত হওয়া কোনকালেই আমার জন্য সম্ভব নয়।

আল্লাহর রহমতে এতসবের জন্য হজ্জের আহকাম পালনকারীদের যারাই আমার সাথে মিলিত হতেন, তারাই আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন ও চিঠি লিখবে বলে আমার নাম ঠিকানা নিয়ে যান। এমন কি আমার সঙ্গীরা সফরের নিয়মানুযায়ী পরবর্তীতে তিউনিসিয়ার রাজধানীতে এসে পুনরায় যখন মিলিত হই, তখন সকলেই আমার দিকে আগ্রহের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে থাকেন- কিন্তু এক সময় তাদের আগ্রহ আমার প্রতি তেমন ছিল না। সফল সফর; সম্মেলনে যোগদান ও হজ্জের কারণে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর আমুল পরিবর্তন হয় আর তারাই এখন আমাকে ভালবাসতে থাকে। কারণ আমার প্রাপ্ত হেফ্জ, কেরাত, গজল ও বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী উপহার সামগ্রী- ইসলামী বিশ্ব থেকে আগত প্রতিনিধিদের কাছে, আমাদের প্রতিনিধি দলের সম্মান, ইজ্জত- বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

আরবে আমাদের অবস্থানের সময় ছিল পঁচিশ দিন। সেই দিনগুলোতে আমরা বিভিন্ন আলেমদের ভাষণ শুনেছি, তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি। ফলে আমরা ওয়াহাবী বিশ্বাসের প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ি। আমি সিদ্ধান্তে আসি যে, 'হারামাইন শরীফাইনের' হেফাজতের জন্য আল্লাহ যেহেতু ওয়াহাবীদের বেছে নিয়েছেন, তাই তারা হয়ত বিশ্বের আর সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী ও পবিত্রতম। দুনিয়ায় তাদের সমকক্ষ হওয়ার উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত বুঝি নেই। আল্লাহই তাদেরকে কবুল করেছেন, ধনাঢ্য করেছেন, তাঁর ঘরের মেহমানদের (হাজীদের) খেদমত করার সৌভাগ্যে ভাগ্যবান করেছেন।

হজ্জের আহকাম শেষে সৌদি পোষাক ও রুমাল মাথায় পরে যখন দেশে ফিরলাম, তখন আমাকে খুব জাক-জমকপূর্ণ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সর্ম্বধনার আয়োজন স্বয়ং আব্বাজান করেছিলেন। আর এত লোক হয়েছিল- পুরো ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, ভিড়ে সব কিছুই একাকার। তরিকা-ই-ইসাবিয়া, তিজানীয়া ও কাদেরীয়ার নেতৃবৃন্দ আমাকে সামনে নিয়ে ফুল ও 'দফ' বাজিয়ে বাজিয়ে শহরময় ঘুরেছে,

আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কালেমার শ্লোগানে গোটা শহর মুখরিত করে তুলেছে। মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরজায় আমাকে দাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন চারপাশ ঘিরে মানুষ আমাকে চুমু দিতে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে অধিকবয়স্করা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকেন, আর আল্লাহর ঘরও রাসুলের মাজার জিয়ারতের এশকে দাড়িছিড়ে, বুক চাপড়ে মাতম করে কাঁদতে থাকেন। কারণ তারা জীবনে এত অল্প বয়স্ক হাজী কাফসা শহর বা আশ পাশের কোন শহরেই দেখেনি। এ যেন আমার জন্যে খোদার বিশেষ রহমত।

সেই অতীতটা আমার জন্য ছিল খুবই আনন্দদায়ক ও জাকজমকপূর্ণ। প্রতিদিন শহরের বড় বড় ঘরের ভদ্রলোকেরা আমাদের ঘরে দোয়া, সালাম ও বরকত নেওয়ার জন্য আসতো। কখনও কখনও আমি ভীষণ লজ্জা ও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তাম, যখন তারা আব্বার সামনেই দোয়া-ফাতেহা ইত্যাদি নিতে চাইতো, আবার কখনও এজন্য গর্বও অনুভব হতো।

আমার ছেলে বেলায় মরহুমা আম্মার অভ্যেস ছিল, কেহ ঘরে আসলে, আমার গলায় তাবিজ দিতেন ও ঘরে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে দিতেন, যাতে আমার শয়তানের ধোকা ও ফাসাদ থেকে কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। আমার হজ্ব পরবর্তী এই সময়টাতেও তার সেই পুরোনো অভ্যাসের কোন ব্যঘাত ঘটেনি।

আব্বা একাধারে তিন রাত অভ্যাসগত নিয়মানুযায়ী তিজানীয়াদের তাবারক বিতরণ করতেন এবং প্রতিদিন একটা করে দুম্বা জবাই করে দর্শনার্থীদের খাওয়াতেন। লোকজনের আগ্রহও এত প্রবল ছিল যে সামান্য কোন বিষয় হলেও তারা আমার কাছে আসতো, জিজ্ঞেস করতো, আর আমি সৌদিদের প্রশংসায় ছিলাম পঞ্চমুখ। এও বর্ণনা দিতাম যে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কি ধরণের সুব্যবস্থার আঞ্জাম দিচ্ছে।

শহরবাসী আমার নামের আগে আলহাজ্ব উপাধি লাগিয়ে দিয়েছে। আর নামটি (উপাধিসহ) যখনই ব্যবহৃত হতো লোকদের মানসপটে আমার চেহারাই ভেসে উঠতো। এভাবে আমার নাম ডাক- জোস প্রতিপত্তি শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিশেষ করে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও ইখওয়ানুল মুসলেমিনের মত অন্যান্য সংগঠনগুলোতে।

আমি শহরের ছোট ছোট অলিতে গলিতে ও মসজিদ সমূহে গিয়ে কুসংস্কার, অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও শির্ক থেকে বাচার জন্য তাবলিগ চালিয়ে যাই। যখন ক্রমেই অবস্থার কিছু উন্নতি হয় তখন মসজিদে জুমার খুৎবার পূর্বে দারসের (ওয়াজ) নিয়ম চালু করি। আমি বিশেতঃ জামে আবু ইয়াকুব ও জামে কবির উভয় জুমার মসজিদেই সময় সময় যেতে থাকি। আর এগুলোতে শনিবার ধর্মীয় ও সৃজনশীল বিষয়াবলীর উপর শিক্ষা দিতাম, সে ক্লাশগুলোতে, সেই কলেজের ছাত্ররাও অধিকহারে যোগ দিত, সে কলেজে আমি কলা ও অর্থনীতির উপর লেকচার দিতাম। আমি তাদের মস্তিষ্ক থেকে সেকুলার, ধর্ম নিরপেক্ষও নাস্তিক অধ্যাপকদের ঢুকে দেওয়া জঞ্জালের আবরণ সাফ করতাম। তাই ছাত্ররা আশ্চর্য হওয়ার সাথে সাথে আমাকে গভীর শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো।

ছাত্ররা আমার ক্লাশের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো আবার অনেকেই আমার বাড়ীতে এসে পড়তো, কারণ অনেক সময়ই আমি বাড়ীতে বসে সহায়ক পুস্তকাদি ঘাটাঘাটি করতাম, যাতে করে ক্লাশে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে পারি। এবং প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে পারি।

আমার যে বৎসর হজ্ব করার সৌভাগ্য হয়, সে বৎসরই মায়ের পছন্দমত, যাকে আমি কোন দিন দেখিনি একজন সহজ-সরল মহিলাকে বিয়ে করি। কারণ মারা যাবার আগেই মা আমার বউ দেখে যেতে চেয়েছিলেন। মা তার স্বামীর অন্যসব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তাদের ধুম

ধামের সাথে বিয়েও দেন। তাই তার মনের আকাঙ্খা ছিল আমাকে তিনি বর সাজাবেন। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, আমার বড় দুই ছেলের জন্যও মা দেখে গেছেন, আলহামদু লিল্লাহ, তিনি এমন সময় দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন যখন তিনি আমার প্রতি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। দু' বৎসর আগে আব্বাও ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আল্লাহর ঘর জিয়ারতের তৌফিক তার হয়েছিল।

ইসরাইলের সাথে পরাজিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের বিশেষ করে আরবদের লজ্জায় মুখ দেখানোর অবস্থা ছিল না, তখন বিপ্লবের ঝান্ডা উচিয়ে ঝড়ের বেগে একজন যুবক হুংকার দিয়ে উঠে। তিনি ইসলামের কথা, মসজিদে গিয়ে, সকলকে নামাজ আদায়ের কথা বলতে থাকেন। এই যুবক পুরুষটিই লিবিয়ার গলা থেকে গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে ফেলে দেয় এবং স্বাধীনতার পূত-পবিত্র শ্লোগান উচ্চারণ করেন। তখন আরব ও ইসলামী দুনিয়ার অধিকাংশ যুবকদের মত আমার মনেও তাকে দেখার, তার সাথে কিছু বলার কামনা জাগে। আগ্রহের এই আতিশয্যই, লিবিয়াকে খুব নিকট থেকে দেখার জন্য আমরা চল্লিশজন ছাত্র শিক্ষক ও কিছু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের এক প্রতিনিধিদল, বিপ্লবের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে লিবিয়া ভ্রমণে বের হই। সকলেই মহা খুশী, সবার মনেই ধারণা জাগে, আরব ও মুসলমানদের ভাগ্যের দিগন্তে বোধহয় সূর্য্যের আলোকচ্ছটা উকি দেই- দিচ্ছে।

বিগত ক' বৎসর ধরেই কিছু বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্র আসতে থাকে। যেগুলো তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রেরণাকে ধারালো করে। তাই কতিপয় বন্ধুর পিড়াপিড়িতে, যারা বিগত সফরগুলিতে আমার সাথে যেতে চেয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে ভ্রমণের এক লম্বা (তিনমাস) প্রোগ্রাম করি। সিদ্ধান্ত হয় গ্রীষ্মের ছুটিটাও কাটিয়ে দেব। তাই আমাদের সফর-সূচী তিনমাসের মত লম্বা হয়। কর্মসূচী ছিল শুকনোর দিনে লিবিয়া পৌছবো, এবং সেখান থেকে যাব মিশর। মিশর থেকে সামুদ্রিক পথে লেবানন। লেবানন থেকে সিরিয়া ও জর্ডান হয়ে যাবো

সৌদি আরব। দুটি উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার চিন্তা করি, প্রথমত উমরা হজ্জ পালন করা, দ্বিতীয়ত ওহাবীদের নিকট থেকে ওহাবী মতবাদ সম্পর্কে আরও ভালভাবে জেনে শুনে আসা, যাতে ফিরে এসে ছাত্রদের মাঝেও মসজিদে সাধারণ মুসল্লিদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা যায়।

তাবলিগের এই পদ্ধতির কারণে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতেও আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কারণ যখন কোন পথিক জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে আসতো, তখন আমার বক্তৃতাও শুনতে পেত। নিজ শহরে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকেও তা বলতো। এক সময় এ খবর সাধককুল শিরমণি বিখ্যাত পীর শায়খ ইসমাইল হাদফীর কান পর্যন্ত গেল। তিনি এক খ্যাতনামা কবি আবুল কাশেম আলসাব্বীর পুত্র। শায়খ এর সাগরেদগণ সমগ্র তিউনিসিয়া এমন কি ফ্রান্স-র্জামানী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কাফসা শহরে অবস্থানরত ইসমাইল হাদাফীর খলিফা- ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে আমি যে সব কষ্টসাধ্য কাজগুলো করছি তার প্রশংসা করে আমার কাছে লম্বা এক চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন ভাল কাজতো বটেই, কিন্তু কোন সৎকর্মই ফায়দা দিতে পারে না, যতক্ষণ না তা কোন খোদাপ্রাপ্ত পীরের সান্নিধ্য ও অনুমতি প্রাপ্ত না হবে। একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন- "যার কোন পীর নেই, তার পীর হয় শয়তান।" সেই চিঠিতে তিনি আমাকে দ্রুত শায়খ ইসমাইল হাদাফীর সাথে সাক্ষাতের দাওয়াত দেন। এবং জোর দিয়ে বলেন- "তোমার একজন পীরের সান্নিধ্য খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় তোমার কাজ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।" তবে তিনি আমাকে সান্ত্বনাও দেন যে, 'সাহেবে জামান' পীর ইসমাইল হাদাফী নাকি অন্য সবার চেয়ে আমাকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে করেন। এ সবে আরও অনুপ্রাণিত হলাম। আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহে মনে যেমন প্রশান্তি আসলো, তেমনি চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে গেলে। আমার মধ্যে দুর্লভ সব গুণাবলী জড়ো হচ্ছে, খোদা যেন উত্তর উত্তর আত্মিক উৎকর্ষের দিকেই নিয়ে চলেছেন।

অতীতে আমি সাইয়্যেদুল হাদী আল হাফিয়ানের অনুসারী ছিলাম। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পীর ও সাধক। তার অনেক মোজেজা ছিল। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পীর সাহেব আমাকে শিষ্যতুল্য স্নেহ করতেন এবং বন্ধু হিসেবে ভালও বাসতেন। এভাবেই আমি পীরকুল শিরমণি হযরত আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) সহ অনেক অলী আল্লাহর অনুসারী ছিলাম। হযরত জিলানী (রঃ) নিজেই একজন মুজাদ্দেদ ও পথ প্রদর্শক। সে যাই হউক আমি শায়খ ইসমাইলের সাথে সাক্ষাতের জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করি, অবশেষে সেই শুভক্ষণে যখন তার ঘরে পৌছিলাম তখন উপস্থিত সকলেই অবিভূত হয়ে আমাকে দেখছিলেন। জনতার ভিড়ে সমাবেশ ঠাসা ছিল। শ্বেত-শুভ্র পোষাক পরিহিত কিছু উচ্চতর গুনাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিও সেখানে দেখতে পেলাম। এমন সময় সালাম ও সকলের শুভ কামনায় শায়খ ইসমাইল হাদাফী মঞ্চে উপবেশন করেন। গোটা মজমা (সভা) তাঁর সম্মানে দাড়িয়ে পড়েছে, তাঁর হাতে সকলেই চুমু দিচ্ছে।

আমার সেই পরিচিত খলিফা, যিনি চিঠি দিয়েছিলেন- তিনি হাতের ইশরায় শায়খ সাহেবকে চিনিয়ে দিলেন, কিন্তু আমি পরিচিত হওয়ার তেমন কোন আগ্রহ দেখালাম না। কারণ এখানে যে সব রীতি-নীতি দেখলাম-আমি এসবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শিষ্যদের মুখে পীরের অলৌকিক ঘটনাসমূহ শুনে তাঁর প্রতি আমার যে কাল্পনিক মহানুভূতি ও ব্যক্তিত্বের যে দুর্লভ অনুভুতি সৃষ্টি হয়েছিল, অথচ সামনা সামনি দেখে পীর সাহেবকে তেমন কিছু মনে হলো না। আমার কল্পনার ইসমাইল হাদাফী ও বাস্তবের হাদাফী সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই তার প্রতি আমার বিশেষভাবে আগ্রহী না হওয়াই স্বাভাবিক। আমিতো দেখলাম একজন সাদাসিধে বৃদ্ধকে যার মধ্যে আমার প্রত্যাশিত জ্যোতি নেই।

সাক্ষাৎকার দানের সময় তার খলিফা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। পীর সাহেব মারহাবা বলে আমাকে তার ডান পাশে বসিয়ে কিছু খেতে দেন। খাবার শেষে আমার স্বপ্রশংস পরিচিতি আবার তার কাছে তুলে ধরা হয়। যাতে করে আমাকে বায়াত করানো সহজ হয়। তখন সকলেই আমার গলা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন, মনে হয় তারা আমার অনেক পরিচিত। আমাকে বরণ করে নেয়ার এই আয়োজন আমাকে অনুভূতিপ্রবন করে তুললো, পীর সাহেব অভ্যাগতদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর দানের এই পর্বে আমার প্রতিক্রিয়াশীল মনের গহীনে কিছু প্রশ্নের উদয় হলো, যেগুলো উত্থাপন করায় উপস্থিত মুরিদরা আমায় ভালচোখে দেখলনা। যদিও সেগুলো কোরান হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত তবুও হুজুরের সামনা সামনি আমার এহেন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা বেয়াদবী হিসেবেই গণ্য হলো। কেননা এটাই চিরাচরিত নিয়ম যে, পীর সাহেবের উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারে না। শায়েখ সাহেব উপস্থিত জনতার বিরূপমানসিকতা বুঝতে পারলেন, সবাইকে জানিয়ে দিলেন, "ও কিছু না যা হবার হয়েছে, যার উত্থান জ্বালাময়ী তার শেষ নূরানি।" ফলে আস্তে আস্তে মনোপীড়ার কুয়াশা কাটতে থাকে, সকলেই বুঝলেন হয়তো এর মধ্যে হুজুরের কোন হিকমত কাজ করছে। ফলে সবাই আমাকে আগের মতই খাতির যত্ন করতে থাকে। কিন্তু পীর সাহেব খুবই চালাক ও দূরদর্শী ছিলেন। তাই তিনি তার প্রধান খলিফা দিয়ে হৃদয় গ্রাহী কিছু ঘটনার ওয়াজ করাতে থাকেন, যাতে আমি আবার হুজুরকে কিছু প্রশ্ন করে বিব্রতকর পরিবেশ সৃষ্টি না করে বসি।

গুনীজনদের এই মাহফিলে একজন আলেমও এসে বসলো, তা দেখে বক্তা বললেন- "প্রথমেই আপনারা গোসল করে আসেন"। কিন্তু উক্ত আলেমরা যেহেতু গোসল সেরেই এসেছিলেন; তাই সকলের সাথে বসে যাবেন এমতাবস্থায় ঘোষণা করা হলো- "আবার গোসল

সেরে আসেন"। আলেম ভাবলেন হয়ত কোথাও কোন অসুবিধা আছে, যা দিব্য দৃষ্টিতে হুজুরের গোচরিভূত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয়বার খুব ভালভাবে দেখেশুনে গোসল সারলেন এবং অতিথিদের মাঝে এসে বসলেন- তখন খলিফা তাঁকে ধম্‌কে বললেন- "যাও আবার গোসল করে এসো"! তখন মাওলানা সাহেব কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "হুজুর আমি আমার এলেম ও আহ্‌কামানুযায়ী গোসল করেছি- এর বেশী কিছু জানি না,যদি সত্যিই আমার কোন মন্দ আল্লাহর কাছ থেকে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে জেনে থাকেন আমাকে বলে দিন, এ ছাড়া আমার কিছু করার নেই"। তখন 'আরেফ' বললেন- "আচ্ছা বসো"। এ ঘটনার মূল টার্গেট যে আমি, তা শুধু আমি নই উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলো।

অতঃপর পীর শায়খ ইসমাইল হাদাফী সাহেব মুশাহেদা মুরাকাবার সেলসেলায়ে ফায়েজের জন্য যখন ভিতরে চলে গেলেন, তখন সকলেই আমাকে ঘিরে ধরে ঠেলা-ধমক দিতে থাকলো যে পীর সাহেবের সামনে চুপ থাকা ও তাঁকে সম্মান দেয়া জরুরী। তা না হলে জীবনের সব সৎকাজই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেন তুমি কি কোরানের সেই আয়াতসমূহ পড়নি? যাতে বলা হয়েছেঃ

"হে ঈমানদারগণ- তোমরা তোমাদের স্বর নবী (সাঃ) এর কণ্ঠ স্বরের উঁচু করিও না, আর যে ভাবে তোমরা পরস্পর জোরে জোরে কথা বল তেমনিভাবে জোরে (নবীর সামনে) কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কৃত সকল কাজ নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তোমরা তা অনুভবও করতে পারবে না।" (সূরা- হুজরাত, আয়াত. ২)

আমি আমার অবস্থান বুঝতে পারলাম এবং সকল আদেশ নিদ্বিধায় বিনম্রভাবে অনুসরণ করতে থাকলাম। ফলে শায়খ সাহেব আমাকে অনেক আপন করে নিলেন। আমি তার কাছে তিন দিন ছিলাম। এ সময় বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছি, কোনটা জানার জন্যে আবার কোনটা এমনিতেই পরীক্ষা করার জন্যে। পীর সাহেব খুব ধীরচিত্তে

বুঝে শুনে উত্তর দিতেন, বলতেন, কোরাআনের একটা বাহ্যিক দিক আছে, আরেকটা গোপন। কোরাআনের এই গোপন ভান্ডার আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমার উপর খুলে দিয়েছেন এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আমাকে অবহিত করেছেন। সালেহীন আরেফীনের একটা পরম্পরাও আছে যেমন-আমার থেকে ওলীয়ে কামেল আল্লামা আবুল হাসান সাজলী পর্যন্ত, আর তার থেকে বিভিন্ন আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যম হয়ে এই ধারাবাহিকতা হযরত আলী (কাঃ) পর্যন্ত পৌচেছে।

একটা কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়- যখন হালকা-ই জিকির শুরু হয় তখন তা খুবই আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হয়। পীর সাহেব জলসা শুরু করলেন মধুর কণ্ঠে তাজবিতসহ কোরান তেলাওয়াতের দ্বারা, তারপর কিছু "কাশিদা" পেশ করলেন। এরপরই গজল জানেন এমন মুরিদ গজল গাইলেন। এসব গজলে দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের প্রাধান্য বেশী ছিল। সাধন ভজনের কথাও ছিল। মানুষ আস্তে আস্তে উত্তেজিত হতে থাকে। হুজুরের ডান দিকে যে শিষ্য বসেছিলেন, সে পুনরায় কোরআন পাঠ করতে থাকেন। 'সাদাকাল্লাহু' বলে তিনি শেষ করেন। হুজুর আবার কাব্যিক ছন্দে গজল গাইতে থাকেন, সাথে সাথে সকলে স্বর মিলাতে শুরু করে। এভাবে একে একে সকলেই গেয়ে শেষ করেন। হউক না তা একটি মাত্র শ্লোক। অবস্থা তখন অচৈতন্যের দিকে যেতে থাকে। একেকটি কাসিদার কলি আওড়াতে থাকে, আর সকলেই এশকে মাতুয়ারা হয়ে হেলতে-দুলতে থাকেন। পীর সাহেব দাড়িয়ে পড়তেই সকলে তার সাথে উঠে দাড়িয়ে যায়, চলে জিকির আর গানের তালে তালে গোলবন্দী হয়ে পাগলের মত করতে থাকে হুজুর এই গোলকের মধ্যমণি। আবার মাঝে মধ্যে পীরের নাম নিয়ে আহ-ওহ করতে থাকে, আর পীর সাহেব সবার মাঝে হেলতে দুলতে থাকেন। মাহফিল যখন খুব এশকের রঙে রঙিন হয়ে উঠে তখন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে এশক-বিরহের গান গাওয়া শুরু হয়। এ সময় অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ চিল্লাচিল্লি করতে থাকে যেন পাগল হয়ে গেছে। গানের তালে তালে স্বর উঁচু হতে থাকে, যখনই

তাল কাটা হয়ে যায় বা সবাই চুপ হয়ে যায়- আবার প্রথম থেকে শুরু হয়। পীর সাহেব উঁচু কণ্ঠে গজলের শেষ পর্য্যায় যখন টান দেন- তখন সবাই চুপ হয় এবং সকল সাগরেদ হুজুরের মাথা-কাধ ও চুলে চুমু দিতে দিতে বসতে থাকে এসব ঘটনা আমি তাদের হালকায় শরিক হয়ে দেখেছি আমিও তাদের মত করেছি কিন্তু ভাল লাগেনি। কেননা ছোট সময় থেকে আমার যে বিশ্বাস জন্মে ছিলো- যে "শির্ক না করা, আল্লাহ ছাড়া কাওকে উসিলা না বানান" এই সবই ছিল তার বিপরীত।

এসব মনে পড়তেই কাঁদতে কাঁদতে আমি মাটিতে ঢলে পড়লাম। আমি সন্ত্রস্ত, আমি বিভ্রান্ত- এই বিপরীত মুখী বিশ্বাস আমার মস্তিষ্ককে কুরে কুরে শেষ করে দিতে চাইছে। এক দিকে এল্‌মে তাসাউফ (সুফী বিদ্যা) যে জ্ঞানের পুরো আকাশ রুহানীয়াতে পরিপূর্ণ, যা দ্বারা মানুষের ভিতরে আল্লাহর নৈকট্যের অনুভূতি জাগ্রত হয়, যা নেককার ও মারেফাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় অর্জিত হয়। অন্য দিকে ওয়াহাবী ধ্যান ধারণাপ্রসূত সেই সামুদ্রীক উচ্ছাস যার অধিকাংশতে শুধু কুফরী আর কুফরী। যারা বলেন এই সবই শির্ক, আর খোদা শির্ককে কখনই মাফ করেন না। যেখানে স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) স্বপ্রবৃত্ত হয়ে কোন উপকারে আসে না, খোদার দরবারে তাকে কোন উসিলা বানান যায় না, সেখানে এই সব পীর আওলিয়াদের কি ক্ষমতা আছে, উসিলা হওয়ার?

শায়খ ইসমাইল সাহেব নতুন করে দীক্ষা দেন এবং কাফসা শহরে আমাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন। তবুও আমি ভিতরে ভিতরে পরিতৃপ্ত ছিলাম না। যদিও আমি সুফীদের প্রতি ইতিবাচক ছিলাম, সব সময় তাদেরকে গভীরভাবে অনুভব করতাম, শ্রদ্ধা করতাম- আউলিয়া, নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের অস্তিত্ব আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে মিশে গিয়েছে। তবুও আমি মনের এসব অনুভূতিকে ঝেড়ে মুছে ফেললাম। কারণ আল্লাহ বলেছেন-

"আর আল্লাহর সহিত আর কাউকে মাবুদ হিসাবে মান্য করো না। তিনি ছাড়া কেহই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়"। (সূরা-কাসাস. ৮৮) তাই যখন আমাকে কেউ বলতো খোদা তালা এরশাদ করেছেন-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং তার কাছে পৌছার উসিলা তালাশ করো। (সূরা- মায়দা. ৩৫) তখন সোজা বলে দিতাম যে, উসিলা অর্থ হলো সৎকাজ। সৌদি আলেমরা আমাকে যা শিখিয়ে ছিল তাই তাদের বলে দিতাম। আসলে আমি সত্যি সত্যিই তখন বিভ্রান্ত ছিলাম, কোন পথে যাব? অনেক সময় আমার ঘরে হুজুরের অনেক মুরিদ আসতো, আমি তাদের নিয়ে শাববেদারী করতাম- হালকা জিকিরের ব্যবস্থা করতাম।

শাববেদারীর সময় হালকায়ে জিকির হতে যে আওয়াজ হতো, তাতে আশ পাশের লোকজনের অসুবিধা হতো, ঠিকমত ঘুমোতে পারতো না। কিন্তু মুখ খুলে কিছুই বলতো না। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর কাছে নালিশ করতো যে, তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি যখন আমি জানতে পারলাম তখন হালকাতে অংশ গ্রহণকারীদের বললাম- হালকা জিকির তোমাদের বাড়ীতে হলেই ভালো হয়। আমি তিন মাসের জন্য দেশের বাইরে যেতে চাই বলে, অপারগতার কথা প্রকাশ করলাম। অতঃপর স্ত্রী, সন্তানও আত্মীয় স্বজনদের আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে সফরে বেরিয়ে পরি।

সফল ভ্রমণ— মিশরে

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে, শুধু মাত্র 'কেনানে' পৌঁছার ভিসা নিতে যতটুকু দেরী হয়, ঠিক ততটুকু সময়ই আমরা অবস্থান করেছি। খুশির ব্যাপার হলো সেখানে গিয়ে কিছু বন্ধু বান্ধবের দেখা পাই, যারা খুব সহযোগীতা করে দ্রুত সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ্ তাদের মঙ্গল করুন!

সড়ক পথে কায়রো ভ্রমন খুবই ক্লান্তিকর। কারণ একাধারে তিন দিনের রাস্তা। একটা টেক্সি ভাড়া নিয়েছি, পেসেঞ্জার হলাম আমি আরও তিনজন মিশরী, যারা লিবিয়াতে চাকুরি করে। তারা দেশের বাড়ীতে যাচ্ছিল। গল্প-সল্প করে গেলে পথ চলা সহজ হয় তাই আমরা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছি। কথার ফাঁকে ফাঁকে কোরআনের আয়াত পাঠ করছিলাম। আমার এহেন দ্বীনি আলোচনার সঙ্গি হওয়ার ফলে চার জন আমাকে যথেষ্ট সমীহ্ করতে থাকে। মোট কথা তারা আমাকে এতটাই আপন করে নিল যে, সবাই তাদের মেহমান হওয়ার জন্য আমাকে চেপে ধরে। তাদের মধ্যে আহমদকে আমার বেশী ভাল লাগলো, তাই সকলের দাওয়াৎ সম্মানের সাথে ফিরিয়ে দিয়ে একমাত্র আহমদের দাওয়াতটাই কবুল করলাম। একেত সার্বিকভাবেই আমি তার বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে পড়ি দ্বিতীয়তঃ তার পরহেজগারী আমাকে মুগ্ধ করে।

সে যাই হউক, আহমদ তার সাধ্যমত আমার মেহমানদারী করে নিজ দায়িত্ব সে যথাযথ ভাবেই পালন করেছে। আল্লাহ্ তার মঙ্গল করুন। আমি বিশ দিন কায়রোতে অবস্থান করি। সে সময় আমি বিখ্যাত গায়ক ফারিদ আল-তারাশ এর সাথে তার নীল নদের পাড়ের বাড়িতে যেয়ে সাক্ষাৎ করি। আমি যখন তিউনিসে, তখন মিশরীয় সংবাদপত্র সমূহ যা আমাদের ওখানে পাওয়া যায়, তাতে ফরিদুল আতরাশ সাহেবের জীবন-চরিত সম্পর্কে পড়েছিলাম। আর

তখন থেকে আমার মনোকাঙ্খার সৃষ্টি হয় যে, কায়রো পৌঁছেই তার সাথে দেখা করবো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তার সাথে মাত্র বিশ মিঃ সাক্ষাৎ হয়। কারণ যে সময় আমি সেখানে যাই সে সময় তিনি লেবাননের উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

কায়রোতে যেয়ে, দ্বিতীয় যে'ব্যক্তিটির সাথে মিলিত হই, তিনি হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্বারী জনাব শায়েখ আব্দুল বাসেত মুহাম্মদ আঃ সামাদ। যাকে আমি আমার জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতাম। সৌভাগ্যই বলতে হয়, তার সাথে তিন দিন অতিবাহিত করতে পেরেছিলাম। তার সাথে অবস্থানকালীন সময়ে, তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সাথেও দেখা হয়- তাদের সাথে অনেক বিষয়ে মত বিনিময় হয়। তারা আমার সুচিন্তিত অভিমত, বিষয় ভিত্তিক সুস্পষ্ট বক্তব্যও বুদ্ধিমত্তায় অভিভূত হয়। যেমন আমাদের মধ্যে যখন পরহেজগারী ও তাসাউফ বিষয়ক কথা শুরু হয় তখন আমি বলি- আমি তরিকা-ই-তিজানীয়া ও তরিকা-ই মাদানীয়া উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। আবার যখন তারা নিজেদের জ্ঞানের বহর দেখাতে যেয়ে, ইউরোপীয় দুনিয়ার ইতিহাস তুলে ধরতো, তখন আমি প্রাচ্যে কাটানো আমার গ্রীষ্মকালীন ছুটির দিনগুলোর স্মৃতি চারণে প্যারিস, লন্ডন, হল্যান্ড, ইটালী, স্পেনসহ অনেক দেশের ঘটনা বলতে থাকি। কখনও হজ্জের আলোচনা শুরু হলে আমি বলি, আল্লাহর রহমতে হজ্জ করেছি এখন ওমরাহর জন্য যাচ্ছি। উপরন্তু গারে সুর, মাকামে ইব্রাহীম ইত্যাদির পুঙ্খানোপুঙ্খো আলোচনা করি, যা তারা কেন, তাদের পূর্ব পুরুষ যারা হজ্ব করেছে, তারাও ভালভাবে দেখেনি, জানে না? এমন কি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে, আমি এমন কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও ঘটনা প্রবাহের দিন ক্ষণ সহ বলতে থাকি, যা উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকে। রাজনৈতিক বিষয়াবলির আলোচনায় আমি এতটাই অকাট্যভাবে নিজের যৌক্তিক অভিমত ব্যক্ত করি যে, তারা সবাই চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবেই এক সময় বললাম- "আল্লাহ 'নাসেরের উপর রহমত বর্ষণ করুন (যিনি সালাহউদ্দিন আয়ুবী হিসাবে খ্যাত ছিলেন) কারণ অট্টহাসি তো দূরে থাক সে নিজের জন্য মুচকী হাসিও হারাম করে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে জনগণ যখন তিরস্কার করে বলাবলি করতো- এই কেমন, স্বয়ং হুজুর (সাঃ) যেখানে, মুচকী হাসি ছাড়া কারও সাথে কথাই বলতেন না, সেখানে তিনি এটাকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন! উত্তরে তিনি বলতেন- আমার মুচকী হাসি তোমরা কেন চাও? অথচ দেখনা মসজিদে আকসা দুশমনের নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহর কসম- যতদিন পর্যন্ত না আকসাকে মুক্ত করবো বা সেজন্য নিজে শহীদ হবো, ততদিন পর্যন্ত আমি হাসতে পারি না"।

কায়রোতে অবস্থান কালে যে অসংখ্যা মিটিং হয়, তার সবগুলোতে আমি ভাষণ দেই। আমার বক্তৃতার সময় আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের বড় বড় প্রফেসারগণ উপস্থিত থাকতেন। এবং আমার বক্তৃতায় কোরানের আয়াত হাদীসে মুতাওয়াতের অকাট্য দলিল ও নির্ভুল প্রমান তুলে ধরতাম, তখন সাধারণ জনতাতো বটেই, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়েখগন ও উষ্ণ হয়ে উঠতো- অনুপ্রেরণা বোধ করতো। আমাকে তারা প্রশ্ন করতেন, আমি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়েছি। আমি গর্বের সাথেই বলতাম তিউনিসিয়ার 'যায়তুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সনদ নিয়েছি, যা আজহারের চেয়ে অনেক পুরাতন, উপরন্তু বললাম যে, ফাতেমিরা আল আজহারকে বানিয়েছিল, তারাই তিউনিসিয়ার মাহদীয়া শহর হতে শুরু করেছিল।

এভাবেই আমি আল-আজহারের অনেক আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত হই যারা আমাকে কিছু দুর্লভ পুস্তকাদি উপহার দেন। একদিনের ঘটনা- আমি আল আজহারের পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্যের লাইব্রেরীতে বসে ছিলাম। তখন মিশরের জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের একজন সদস্য এসে লাইব্রেরীর মালিক ভদ্রলোককে বললেন- যুদ্ধবিধ্বংস্ত কায়রোর রেল লাইন মেরামতের ব্যাপারে মিশরের বড় বড় মুসলমান ও খ্রীষ্টান কোম্পানীগুলোর একত্রে বৈঠক হইতেছে, আপনাকেও সেই বৈঠকে যেতে হবে। কুতুবখানার মালিক ভদ্রলোক আমাকে ছাড়া যেতে চাইলেন না। তাই

আমিও সাথে গেলাম। সেখানে মঞ্চে এক আজহারী আলেম ও প্রধান অতিথির মাঝখানে আমাকে বসান হলো। একে একে সবাই কথা বলছে, আমাকেও কিছু বলতে বলা হলো। আমি মসজিদ ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলাম বিধায় বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস আগে থেকেই ছিল। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কিছু বললাম।

এ সব অনুষ্ঠানাদীতে বক্তৃতা দেওয়ার পর আমার ভিতর বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হলো যে, আমিও বোধ হয় বড় আলেম হয়ে গেছি। কারণ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় আলেমগণ আমার ভুয়সী প্রশংসা করে বলতেন- আরে তোমার স্থানতো তিউনিসিয়া নয় বরং আল আজহারে। সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার হলো স্বয়ং নবী (সাঃ) এর সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহ আমাকে তারা অনুগ্রহ করে যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো- কায়রোতো হযরত হুসেইন (আঃ) এর মসজিদের খাদেম আমাকে বললেন- হুজুর (সাঃ) আমাকে স্বপ্নে বলেছেন, আমি যেন সব বরকত ময় জিনিসগুলো তোমাকে দেখিয়ে দেই। তাই তিনি আমাকে একাকী এমন একটি রুমের ভিতর নিয়ে গেলেন, যেখানে সে ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নিষেধ। আমাকে সহ ভিতরে গিয়ে, তিনি দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর সেই বরকতময় সিন্দুকের তালা খোললেন, যেখানে হুজুরের জামা-কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষিত ছিল। আমি সেগুলো দেখতে লাগলাম, আর দিশা হারা হয়ে চুমু খেতে লাগলাম। আমার প্রতি হুজুরের এই বিষয়টি বড় মেহেরবানীর কথা চিন্তা করে, আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশপ্রায় হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। আরও আশ্চর্য হলাম সেই খাদেম সাহেবের প্রতি যিনি আমার জন্যে এত কিছু করলেন অথচ তার জন্য সামান্য বিনিময় পর্যন্ত নিলেন না। কিন্তু আমি যখন তাকে জেঁকে ধরলাম এবং ভীষণ পিড়াপিড়ী শুরু করলাম, তখন সামান্য কিছু নিয়ে আমাকে আর্শিবাদ করে বললেন- "তুমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকটজনদের অন্যতম"।

এ ঘটনার পর আমি কেমন জানি হয়ে গেলাম, আমার প্রতি হুজুরের (সাঃ) এই অনুগ্রহ, আমাকে রাত জাগা নিশাচরের মত উদ্‌ভ্রান্ত করে দিলো- চোখের নিচে দাগ পড়ে গেছে শুধু ভাবতে ভাবতে যে- ওয়াহাবীদের বিশ্বাস নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন অন্যসব মানুষদের মতই। মনে হতে লাগলো, এই বিশ্বাস মূলতঃ একটা মিথ্যা বিশ্বাস। যেখানে শহীদগন জীবিত, আল্লাহ তাদের রেজেক দেন, সেখানে মহান ব্যক্তিত্ব পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সর্দার তিনি কি করে মরে যেতে পারেন- অন্য সব মানুষের মত। এই চিন্তাও বিশ্বাসকে আমার ছোটকালের শিক্ষায় অধিকতর মজবুত করেছে। অতীতে সুফী বিদ্যার যে শিক্ষা পেয়েছি, তাতে বলা হয়েছে, আওলিয়া-ই কেরাম ও পীর মাশায়েখগণের উপর প্রদত্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে তারা জাগতিক সকল বিষয় জানতে পারেন। কারণ হিসাবে বলা হতো, এই বুজুর্গ ব্যক্তিদের এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে- তারা অধিক নেককাজ ও ইবাদত করেন বলে। যেমন হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হয়েছে- "হে আমার বান্দাগণ তোমরা এতই ইবাদত কর, যে আমি তোমাদের উন্নতির সেই শিখরে পৌছাব, যেখানে পৌছলে তোমরা যা বলবে, আল্লাহর রহমতে তাই হয়ে যাবে"। আমার এই বিশ্বাস আমাকে জড়োসড়ো করে ফেলেছে। কায়রো অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে, এই হতভাগা সবগুলো মসজিদ জিয়ারত করেছে, নামাজ পড়েছে। ইমাম মালিক (রহঃ) এর মসজিদ হতে শুরু করে আবু হানিফার মসজিদ পর্যন্ত, আর ইমাম শাফেয়ীর মসজিদ থেকে নিয়ে আহমদ বিন হাম্বলের মসজিদ পর্যন্ত, সবগুলোই জিয়ারাত করেছি। এমন কি হযরত জয়নুল আবেদীন (আঃ) ও ইমাম হুসাইনের (আঃ) মসজিদেও নামাজ পড়েছি। আর "যাবিয়াতুৎ তিজানীয়া" জিয়ারাত ছিল খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এ বর্ণনা অনেক লম্বা- যা এইতর কলেবর বৃদ্ধি পাবে অথচ আমাদের সংক্ষিপ্ত করাই উদ্দেশ্য- তাই বললাম না।

সমুদ্র পথের আলোচনা

বৈরুতগামী একট মিশরীয় জাহাজে আমার সিট আগেই বুক করা ছিল। এই হিসাবে আমি ইসকান্দারিয়া থেকে রওনা হই। আমি আমার সিটে হেলান দিয়ে বুঝতে পারলাম আমার শরীরও মানসিকতার উপর খুব ধকল গেছে তাই কিছুক্ষণ শুয়ে নেই। জাহাজ দুই/তিন ঘন্টা ধরে নদীর উপর চলছে। শুয়ে শুয়ে আমার কাছের ব্যক্তিকে কারও সাথে কথা বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন-এই ভাই বোধ হয় (আমাকে দেখিয়ে) খুবই পরিশ্রান্ত, কথা শুনে আমি চোখ খুলে বললাম- জ্বী ভাই, কায়রো থেকে ইসকান্দারিয়া পর্যন্ত ভ্রমণেই আমি ক্লান্ত, তার উপর জাহাজ সময় মত ধরার জন্য সারারাত জেগে রয়েছি। কথা শেষ করে বুঝলাম, এই ব্যক্তির কথাবার্তায় মনে হচ্ছে সে মিশরীয় নয়, তবুও কিছু কথাবার্তা বলি- এমন মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে তার সাথে আমার পরিচয় দিবো এবং তার পরিচয়ও আমি জেনে নেব। জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন তিনি ইরাকী, নাম মুনয়েম, বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। কায়রো গিয়েছিলেন আজহারে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর থিসিস জমা দিতে।

অতঃপর আমরা মিশরের ব্যাপারে, ইসলামী দুনিয়ার ব্যাপারে, আরবদের ব্যাপারেও আরবদের পরাজয় ও ইহুদীদের বিজয়ের ব্যাপার সহ অনেক বিষয়ই আমাদের গল্পে অবতারণা করেছি। আপনারাতো (পাঠকগণ) বুঝেন যে কথার পর কত কথাই বেরিয়ে আসে। আমি আমার কথার সময় এও বললাম- ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারণ হলো, মুসলমান ও আরবদের ছোট ছোট রাষ্ট্রে ও বিভিন্ন মাজহাবে বিভক্ত হওয়া। মুসলমানগণ বিশ্বে অনেক হওয়া সত্বেও চুনোপুটি দুশমনের কাছে তাদের কোন দাম নেই শুধু এসব কারণে।

বেশী গল্প হয়েছে মিশর ও মিশরীয়দের নিয়ে, বিজিত হওয়ার কারণগুলোর ব্যাপারে আমরা একমত ছিলাম।

আমি এও বললাম, পরাশক্তিরা আমাদের বিভক্ত করে দুর্বল করে রাখছে, যাতে করে আমাদের উপর খবরদারী করতে পারে এবং আমাদের নাকে রশি দিয়ে টানতে পারে। পরাশক্তিদের এই ষড়যন্ত্রের আমি চরম ভাবে বিরোধী। আমার এও ভাল লাগে না যে, এখনও আমরা হানাফি, মালেকীতে বিভক্ত। এ সম্পর্কিত একটা ঘটনা তাকে বললাম- কায়রোর অবস্থানের সময় একদিন আমি মসজিদে আবু হানিফাতে আসরের নামাজ পড়লাম। কিন্তু নামাজ শেষ করতেই যিনি আমার পাশে দাড়িয়ে ছিলেন তিনি মেজাজ গরম করে আমার দিকে তেড়ে আসলেন এবং শক্ত ভাষায় ধমক দিয়ে আমাকে বললেন- তুমি নামাজে হাত কেন বাঁধ নাই? উত্তর খুব বিনম্রভাবে দিলাম- মালেকীরা হাত খুলেই নামাজ পড়ে, আর আমি মালেকী। তিনি রেগেই বললেন- তাহলে মালেকী মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়, এখানে কেন? অতঃপর সেখান থেকে আমি খুব অপমানিত এবং রেগে-মেগে চলে আসলাম- যাতে আমি খুব অস্থির বোধ করি।

এ সময় ইরাকী ভদ্রলোক মুচকী হেসে বললেন- দ্বিতীয় উদাহরণটি আমার, আমি শিয়া। এটুকু শুনতেই আমি অগ্নিশর্ম হয়ে গেলাম। এবং কোন ভদ্রতাবোধের তোয়াক্কা না করেই বললাম- যদি আমি জানতাম আপনি শিয়া, তাহলে কথাই বলতাম না। তিনি বললেন- কেন?

বললাম আপনারাতো মুসলমানই না, আপনারাতো হযরত আলীর এবাদাত করেন। অথচ যে সত্যাশ্রয়ী, সেতো ইবাদাত করবে আল্লাহর। (আর আপনারা) মুহাম্মদের (সাঃ) রেসালাতে বিশ্বাসী নন, আর জিব্রাইলকে দোষারূপ করেন এই বলে যে, সে আমানতের খিয়ানাত করেছে। রেসালাত আলীর (আঃ) কাছে না পৌছিয়ে সে মুহাম্মদের নিকট নিয়ে গেছে। এ ধরণের অনেক কথাই বললাম। আর আমার কথা বলার এই পুরা সময়ে আমার সফরসঙ্গী কখনও মুচকী হেসেছে, আবার কখনও না. হাওলা ওয়ালাকুয়াতা বলেছে যখন আমার কথা শেষ হয়েছে, তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি শিক্ষক? ছাত্রদের পড়াও"? বললাম- "হ্যাঁ"। তিনি বললেন- "মাশাল্লাহ শিক্ষকেরই যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ জনতাকে দোষারোপ করা বৃথা। কেননা সাধারণ মুর্খরাতো জন্তু সমতুল্য, তাদের কিছুই জানা থাকে না"।

আমি বললাম- "আপনার উদ্দেশ্য কি, কি বলতে চান"? তিনি সোজাসুজি বললেন- "মাফ করবেন, আপনি কি বলবেন-এই মিথ্যে তথ্যগুলো আপনাকে কে দিয়েছে"?

আমি বললাম- "ইতিহাস থেকে, আর সে সকল মানুষের কাছে থেকে, প্রসিদ্ধ যারা"।

তিনি বললেন- "মানুষের মুখের কথা বাদ দেন- তবে শ্রদ্ধেয় ভাই, আপনি ইতিহাসের কোন পুস্তকগুলো পড়েছেন বলবেন"?

আমি তখন ইতিহাসের কিছু বইয়ের নাম বলতে শুরু করলাম। যেমন "আহমদ আমিনের ফজরুল ইসলাম, জোহাল্ ইসলাম, জাহরুল ইসলাম" আরও অনেক কিতাবের নাম বললাম।

তিনিঃ "ভাল, কিন্তু আহমদ আমিনের বক্তব্য শিয়াদের উপর দলিল হবে কেন"? তিনি আরও বললেন- "ন্যায় এবং ইনসাফের কথা হলো শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থারাজীর দ্বারাই তাদের বিরুদ্ধে প্রমান আনা যৌক্তিক"।

আমিঃ "যে কথা সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ তার কি আবার কোন প্রমানের দরকার আছে"?

সেঃ "শুনো-'আহমদ আমিন প্রথম যখন ইরাকে গেলেন তখন নাজাফে আশরাফের যে সব শিক্ষকরা তার সাথে দেখা করেন, তাদের একজন আমিও ছিলাম। আমরা যখন তাকে শিয়াদের বিরুদ্ধে তার বইতে যে সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে সবের ব্যাপারে তার কৈফিয়ত চাইলাম তদুত্তরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, তিনি শিয়াদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, পূর্বে কোন শিয়ার সাথে তার দেখাও হয়নি", তখন আমরা বললাম-

"কোন কোন সন্দেহ খুবই শক্ত গুনাহ' যা আপনার উপর বর্তায়। যখন আপনি আমাদের ব্যাপারে কিছু জানেনই না তখন কি করে আমাদের সম্বন্ধে লিখেন"? এরপর তিনি আরও বললেন- "ভাই! যখন কোরআন দ্বারা আমরা ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন করি, তখন বুঝতে হবে কোরআন আমাদের জন্য অকাট্য প্রামান্য গ্রন্থ হলেও তা তাদের জন্য নয়, যেহেতু তারা তা বিশ্বাসই করে না। কিন্তু তারা যা বিশ্বাস করে সে সব গ্রন্থ থেকে যদি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় তবেই সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত ও মজবুত। অর্থাৎ তাদের কথা দ্বারাই তাদের ভুল প্রমাণ করবো। প্রচলিত কথানুযায়ী তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন"।

ভ্রমণ সঙ্গীর এই বক্তব্য শুনে আমার মনে হলো তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি মিষ্টি পানি পান করলে যেমন তৃপ্তি পায়, আমার অবস্থাটাও হলো ঠিক তেমনিই। ভ্রমণ সঙ্গীর এই বক্তব্য আমাকে খুব প্রভাবিত করলো- এবং বুঝতে পারলাম আমি মন্দ আক্রোশের উপর বাস করছি। বিতর্কটা একটা পরিনামের দিকে এগোলো। কেননা ভদ্রলোকের জোরালো বক্তব্য, বিশ্লেষণ, অকাট্য প্রমান আমার মন গ্রহণ করে নিল। তাই যদি আমি কিছু সময় নষ্টও করি, কিছু সময় ধৈর্য্য সহকারে তার কথা শুনি, তাতে ক্ষতি তো নেই? তাই আমার সফর সঙ্গীবন্ধুকে বললাম- "এর অর্থ এই যে আপনারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেসালাতের উপর ঈমান রাখেন"? তিনি বললেন- "শুধু আমি নই বরং সমগ্র শিয়াদের এটাই বিশ্বাস। আরে ভাই, যদিও আমার কথা বিশ্বাস করো তাহলে দুধ দুধই আর পানি পানিই ধরা পড়বে"। আপনারা শিয়া ভাইদের সম্পর্কে এমন খারাপ ধারণা করবেন না। 'কতিপয় ধারণা-গুনাহ্' এ কথা বলে তিনি আরও বললেন, "যদি আপনার বিবেক, যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়, আর আপনার চোখ সত্যকে বিন্যস্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে আপনাকে ইরাকের শিয়া ওলেমা ও সাধারণের সাথে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ রইলো। তবেই

বিরুদ্ধবাদী ও মতলববাজদের মুখোশ খুলে যাবে।" আমি বললাম- "মনেও তো আশা ছিল ইরাকে যাব এবং সেখানকার অতি পুরাতন ইসলামী নিদর্শনগুলো দেখবো যা আব্বাসীয়রা রেখে গেছে, বিশেষ করে বাদশা হারুন-অর-রশিদের কৃত্তিগুলো। কিন্তু চাইলেই তো হয় না কিছু প্রতিবন্ধকতাও আছে। প্রথমতঃ আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না, খুব কষ্ট করে নিজের এই ওমরার ব্যবস্থাটুকুন করতে পেরেছি। তাই আরও অর্থ যোগান খুবই কঠিন। দ্বিতীয়তঃ আমার পাসপোর্ট সমস্যা; আমার যে পাসপোর্ট এতে ইরাকের ভিসা দেবে বলে মনে হয় না। এই সমস্যা গুলো না থাকলে অবশ্যই আসতাম।" ইরাকী ভদ্রলোক বললেন- "আমি যখন আপনাকে দাওয়াত দিয়েছি, তখন যাতায়াতের ভাড়াটা আমারই- উপরন্তু ইরাকে আমার গরীব খানারই মেহমান হবেন। বাকী থাকলো পাসপোর্ট সমস্যা। এটা খোদার উপর ছেড়ে দেন, আল্লাহ্ যদি চান তা হলে পাসপোর্ট ছাড়াই যেতে পারবেন। আমরা দামেস্কে পৌঁছেই ইরাকের ভিসার ব্যাপারে চেষ্টা করবো।" আমি সফর সঙ্গীর কথায় মনে মনে খুব খুশী হলাম, আর তাকে বললাম, "ইনশাআল্লাহ্ আগামী কাল উত্তর দেব"।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাগরের বুকচীরে জাহাজ এগিয়ে চলছে। যতদূর দৃষ্টি যায় পানি আর পানি। আমি শয়ন কক্ষ থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে এসে দাড়ালাম। মনে মনে ভাবছি, আমার বিবেক দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছে। এই মহাপ্রকৃতির মহান স্রষ্টার শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে আজ এতদূর আনতে পেরেছেন। দোয়া করছি, হে প্রভু, আমাকে মন্দ এবং মন্দের বাহকদের হাত থেকে বাঁচাও, ভুল বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করো। আমার চিন্তার জগতে যে রঙ্গিন ছবি স্পষ্ট করেছ, তা এক এক করে আমার স্বরণের পর্দায় ভেসে উঠছে। আমি যে ঐশ্বর্য্যে লালিত হয়েছি, জীবনে যে সব চমকের মুখোমুখি হয়েছি, আজ সবই স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে- একটার পর একটা ঘটনা ফিল্মের মত আসছে যাচ্ছে, আর আমি এক মহা সৌভাগ্যের ভবিষ্যতের দিকে

যেন এগিয়ে চলছি। আর অনুভূত হচ্ছিল, আল্লাহ আর রাসুল যেন আমাকে, তাঁদের বিশেষ অনুগ্রহে সবকিছুর যোগান দিচ্ছেন। কতক্ষণ এভাবে ভেবেছি জানি না, সম্বিত ফিরে পেয়ে মিশরের দিকে তাকালাম, যার অংশ বিশেষ এখনও জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। মনে মনে আল বেদা বললাম, এটা সেই মিশর যার সবচেয়ে বড় পাওনা হলো আমি হুজুর (সাঃ) এর জামায় চুমু দিয়েছি, তা এখনও স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতসব ভাবছি। এরপর আমার এই নতুন শিয়া বন্ধুর কথাগুলোও ভাবছি। যিনি আমার আজন্ম-লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের ওয়াদা করে আমার মন খুশিতে ভরে দিয়েছে (ইরাক ভ্রমণের দাওয়াত দিয়েছেন), এই সংবাদটাই এখন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই সেই ইরাক, যাকে বাদশাহ হারুন বানিয়েছেন। আর মামুন ঢেলে সাজিয়েছেন। আর বাদশাহ মানুন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি 'দারুল হেকমাহ' এর (বিজ্ঞানাগারের) স্রষ্টা। এ সময় ইসলামী সভ্যতা শীর্ষস্থানে উন্নীত ছিল। যেখানে ইউরোপীয় দেশের অনেক ছাত্রই জ্ঞানান্বেষণে আসতেন, উপরন্তু ইরাক কুতুবে রাব্বানী শেখ হযরত আঃ কাদের জিলানীর শহর। যে জিলানীর সুনাম তরীকাপন্থী বিশ্বের আনাচে কানাচে। যার মর্যাদা অন্যসবের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। যে গুলো জিয়ারতের স্বপ্ন সাধ আমার পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ সব ভাবনার সাগরে সাতার কাটছি, কতক্ষণ এভাবে আনমনা হয়ে কেটেছে বলতে পারব না, তখন- খাবারের ঘন্টা আমার ভাবনার ছেদ টেনে দিল। আমি হোটেলের দিকে রওয়ানা হলাম। সাধারণত ভিড়ের মধ্যে যা হয় তাই হচ্ছে- একেবারে গাদাগাদী- একজন আরেকজনের আগে যাওয়ার জন্য পাল্লা দিচ্ছে। চেচামেচির এ অবস্থায় কানে আওয়াজ ধরতে চাচ্ছে না। এ সময় দেখি আমার সেই শিয়া বন্ধু পিছন দিকে আমার কাপড়ের আস্তিন ধরে আস্তে করে টানছেন এবং বলছেন- "আরে ভাই, কারণ ছাড়া নিজেকে ঠকিও না, সবার

শেষে আমরা খুব শান্তিতে খেতে পারবো, তখন এই ভিড় এবং হট্টগোল কমে আসবে"। "আমি তোমাকে সবখানে খুজেছি- কি নামাজ পড়েছ?" বললাম "না, পড়িনি"। তিনি বললেন- আস আগে নামাজ পড়ে নেই, পরে খেতে বসবো ক্ষন- ইতিমধ্যে ঝামেলা শেষ হবে।"

আমি তার কথা মেনে নিলাম এবং অজু করে তাকে আগে দিলাম নামাজের ইমামতি করার জন্যে, যাতে দেখতে পারি কিভাবে সে নামাজ পড়ে। আমি পরে চুপিচুপি দ্বিতীয়বার পড়ে নেব।

কিন্তু যখন একামতের পর সে নামাজের কেরাত ও দোয়া পড়তে লাগলো তখনি আমার মনের দুর্বলতা কাটতে শুরু করে। আমার অনুভব হলো সাহাবাই কিরামের মধ্যে কারও পিছে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছি, যাদের তাকওয়া, খুশোখুজো সম্পর্কে কিতাবে অনেক পড়েছি। নামাজ শেষে সে এমন সব বড় বড় দোয়া পড়তে লাগলো যা আমি ইতিপূর্বে নিজ দেশে বা যে সব দেশে সফর করতে গিয়েছি সেখানেও শুনিনি। আর যখন শুনলাম সে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহলে বায়তের উপর দরুদ পড়ছে, তখন আমার অন্তর খুশিতে ভরে গেল, আশ্বস্ত হলাম সব শেষে দেখলাম তার চোখে পানি এবং দোয়ার মাঝে বলছেন- "হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তর খুলে দিন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন"।

নামাজের পর হোটেলে ঢুকে দেখি সব খালি হয়ে গেছে, যতক্ষণ আমি না বসলাম তিনি বসলেন না। দুটো প্লেট দেওয়া হয়েছে তারটা আমাকে দিলেন আমারটা তিনি গ্রহণ করলেন। কেন না আমার প্লেটে গোসত কম ছিল। খাবার সময় এমন ভাবে তদারকী করতে লাগলো যেন আমি তার মেহমান, এবং খাওয়ার ব্যাপারে, পানিয়ের ব্যাপারে, দস্তরখানের ব্যাপারে এমন সব ফজিলত বর্ণনা করলেন যেগুলো আমার কান কোন কালেই শুনেনি।

এইসব ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগলো। এরপর এশার নামাজ আদায় করলাম। কিন্তু মাগরিবের মতই অনেক দোয়া কালাম পড়লেন, লম্বা হওয়ায় স্মরণে রাখতে পারলাম না। আমি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলাম, তার সম্পর্কে আমার ধারণা যেন পাল্টে যায়। কেননা 'অনেক অনুমান গুনাহ' এ কথা কয়জনে জানে?

এরপর আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু স্বপ্নে ইরাককে দেখতে লাগলাম। প্রত্যুসে আমার চোখ খুলল যখন ফজরের জন্য তিনি আমাকে জাগালেন। ফজরের নামাজের পর আল্লাহর কাছে উভয়েই দোয়া করতে লাগলাম সেই সব অনুগ্রহের উল্লেখপূর্বক, যা তিনি মুসলমানদের কে দিয়েছেন। অতঃপর আমি আবার শুয়ে পড়লাম যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখলাম, সে আমার বিছানার উপর বসে তাযবিহ্ পাঠ করছেন। এটা দেখে আমার অন্তরটা পুলকিত হলো, তৃপ্ত হলো এবং নিজে খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

আমরা হোটেলে বসে খানাপিনা করছি এসময় সাইরেন বেজে উঠলো এবং ঘোষণা দেওয়া হলো লেবানন বন্দরের কাছেই আমাদের জাহাজ এসে গেছে। আর আমরা বৈইরুত বন্দরের উপকণ্ঠে পৌছবো দুই ঘন্টা পর। আমার সাথী প্রশ্ন করলেন- "কি ভাই চিন্তা ভাবনা করেছেন"? বললাম- "যদি ভিসা পাই তাহলে কোন বাধা নেই"।

বৈইরুত অবতরণ করে রাতটা সেখানেই কাটালাম। এরপর বৈইরুত থেকে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে পৌছেই প্রথম ইরাকের পর্যটন কেন্দ্রে গেলাম এবং অসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার ভিসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। যখন আমরা সেখান থেকে ফিরি, তখন তিনি আমাকে মুবারকবাদ দিলেন এবং খোদার বিশেষ অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করলেন।

আমার প্রথম ইরাক সফর

নাজাফের বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানির ইয়ারকন্ডিশন এক লম্বা বাসে চড়ে আমরা দামেস্ক থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। যখন বাগদাদ গেলাম তখন দিনের উষ্ণতা চল্লিশ ডিগ্রি। বাস থেকে নেমেই আমরা অত্যাধিক সুন্দর ছিমছাম একটি মহল্লা, যেখানে আমার বন্ধুর বাসা, সেদিকে রওয়ানা দিলাম। পুরা বাসা ইয়ারকন্ডিশন, তাই সেখানে পৌছে প্রশান্তি অনুভব করলাম। বন্ধুটি বাসার ভিতর থেকে কাপড় বদলানোর জন্য একধরণের ঢিলাঢালা লম্বা জামা নিয়ে আসলেন- যাকে তাদের ভাষায় দশদাশা বলা হয়।

দস্তরখানায় বিভিন্ন প্রকারের ফলমূলসহ খাবার দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রী হেজাব পরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম দিলেন। তার পিতা একজন আলেম, তিনি আমার সাথে এমন ভাবে মুসাফা করলেন যাতে মনে হলো অনেক দিনের পরিচিত আমরা। অর্থাৎ তার পিতা কাল আবা উড়িয়ে দরজায় দাড়িয়ে আমাদের সালাম দিলেন, মারহাবা বলে শুভাগমন জানালেন। মা না আসায় আমার দোস্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন- আমাদের এখানে মেয়েদের সাথে মুসাফাহ্ বৈধ নয় বিধায় আম্মার ব্যাপারে আমরা দুঃখিত। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, যাদের আমরা দ্বীনের বাইরে মনে করি অথচ তারাই প্রকৃত দ্বীনের চর্চা করছে। আর সফরের প্রথম দিনেই আমার বন্ধুর উচ্চতর ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ, প্রাঞ্জল সহমর্মিতা ও মানবিকতা দেখে আমার অনুভব হলো- আমি বোধ হয় মেহমান নই বরং তাদেরই অতি আপনজন। রাতে সবাই ছাদের উপর শুতে গেলাম, সেখানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিছানা পাতা আছে। আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাইনি, শুধু ভাবছি।

বাস্তবেই আমি না স্বপ্নে? আসলেই কি আমি সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানীর শহরে এসেছি?

বিরবির করে আওড়ানো আমার কথা শুনে বন্ধু মুচকি হেসে বললেন- তিউনিসবাসীরা আঃ কাদের জিলানীর ব্যাপারে কি বলেন? বাস-আর কি, মুহতারামের সমস্ত কেরামতি-গুণাবলী যা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, একে একে সব তার কাছে বললাম এবং বললাম তিনি হলেন আউলিয়াদের কুতুব, যেমন-নবী (সাঃ) সমস্ত নবীগণের সর্দার। এভাবেই তিনি আবার সমস্ত আওলিয়াদের সর্দার, যার পদ মুবারক সকল অলী আওলিয়াদের কাঁধের উপর রক্ষিত। তিনি বলতেন, মানুষ কাবার তাওয়াফ করে সাত বার আর আমি কাবা তাওয়াফ করি আমার তাবুসহকারে।

এ সব কথা বলে আমি আমার বন্ধুকে বুঝাতে চেয়েছি, যে জনাব শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তার কতিপয় একান্ত মুরিদ ও তার প্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছে সশরীরে উপস্থিত হন, তাদের অসুস্থতা আরোগ্য করান এবং বিপদের প্রতিবিধান করেন। কথাগুলো বলার সময় আমি ওয়াহাবী বিশ্বাস যা দ্বারা আমি খুব প্রভাবিত ছিলাম, ভুলে যাই বা ভুলে যেতে বাধ্য হই। যে এসব কথা মুলতঃ শিরক। আমি যখন বুঝলাম আমার দোস্তের এ সব কথায় আগ্রহ নেই, তখন বললাম- "কি ভাই আপনারা কি বিশ্বাসী নন? এগুলো কি সঠিক নয়- আপনার কি অভিমত"।

দোস্ত আমার হেসে দিয়ে বললেন- "ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ- যাও এখন শুয়ে পড়গে। আগামী কাল আল্লাহ্ চাহেতো আঃ কাদের জিলানীর (রহঃ) মাজার জিয়ারাতে যাব"। একথা শুনে আমার মন যারপর নাই খুশিতে তোলপাড় করতে থাকলো। আর মনে হতে লাগলো ইস এখন যদি সকাল হয়ে যেত। অতঃপর শুয়ে পড়লাম- বেলা না উঠা পর্যন্ত ঘুম ভাঙল না। ফজরের নামাজ পর্যন্ত কাযা হয়ে গেল। বন্ধু বললেন, আমাকে বেশ কয়বার নিষ্ফল জাগানোর চেষ্টা করেছেন আমি আরাম করি তাই আর বিরক্ত করেন নি।

জনাব আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও
হযরত ইমাম মুসা কাজেম (আঃ)

নাস্তা করেই আমরা (বাবুশ শায়খ) জিলানীর মাজার এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আর আমার চোখ যখনই সেই বরকতময় স্থান দেখলো- যা দেখার জন্য মন আনচান করছিল, তখনই আমি দৌড়ে বেহুশের মত ভিতরে প্রবেশ করলাম যে, তার কোলে আমাকে সোপর্দ করবো- মাজারের যেদিকেই আমি যাচ্ছি আমার দোস্ত ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করছে। শেষে সেখানে পৌছলাম, যেখানে জিয়ারতকারীগণ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার মত ঝাপিয়ে পড়ছে। দেখলাম বায়তুল্লাহর তাওয়াফের মত মানুষ ঘুরছে। অনেকে মিষ্টি নিক্ষেপ করছে আর তা উঠিয়ে খাওয়ার জন্য মানুষ পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। আমি দৌড়ে যেয়ে দুই টুকরা উঠালাম। বরকতের জন্য একটুকরা সেখানেই খেয়ে ফেললাম, আরেক টুকরা শুভাকাঙ্খিদের দেওয়ার জন্য পকেটে রাখলাম, সেখানেই নামাজ পড়লাম, অনেক অনেক দোয়া করলাম। পানি পান করলাম যেমন জমজমের পানিয়ের মত।

বন্ধুকে বললাম- আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা খাম কিনে আমার দেশের বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখি, যে খামের উপর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) এর ফটো আছে। যাতে বন্ধুদের আত্মীয়দের কাছে বলতে পারি যে, দেখ যেখানে কেও যাওনি সেখানেই আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে গেছে।

একটু সময় পেয়ে এক হোটেলে দুপুরের খাবার খেলাম। হোটেলটি যতদুর মনে হয় বাগদাদের মাঝখানে। অতঃপর বন্ধু ভাড়ায় টেক্সি নিলেন এবং আমরা কাজমীন পৌছলাম। কাজমীন যে আমরা যাব তা তখনই বুঝেছিলাম, যখন তিনি টেক্সি ড্রাইভারের সাথে কথা বলার সময় শব্দটির উচ্চারণ বারবার করছিলেন। কাজমীনে আমরা টেক্সি থেকে নামলাম- কিছু দূর হেঁটে চলছি নারী-পুরুষ শিশু

কিশোর আবালবৃদ্ধ বনিতার কনভয় এগিয়ে চলছে- আমরাও সে দিকেই যাচ্ছি। জনতার হাতে কাঁধে কিছু আসবাব পত্রও আছে, যে দৃশ্য দেখে আমার হজ্বের কথা মনে হলো। এখনও লক্ষ্য স্থানে যেতে পারিনি। এমন সময় স্বর্ণ দ্বারা মুড়ান কিছু পিলার ও মিনার দেখতে পেলাম, যা চোখকে ঝলসে দিল।

আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে এটা শিয়াদের মসজিদ। কারণ এরা মসজিদকে স্বর্ণরৌপ্য স্তরে মুড়িয়ে দেয় যা ইসলামে হারাম। এটা মনে হতেই মন চাইল আমি যেতে অস্বীকার করি। কিন্তু বন্ধুর মনের দিকে লক্ষ্য করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গে চললাম।

প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলাম শ্বেতশুভ্র শশ্রু মন্ডিত কিছু বয়বৃদ্ধলোক দরজা মুছছেন আর চুমা দিচ্ছেন, কিন্তু যথেষ্ট বড় একটা সাইন বোর্ড দেখে আমার একটু শান্তি লাগলো। যাতে লেখা ছিল বেপর্দা মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। এবং সাথেই ইমাম আলী (আঃ) এর একটি হাদীস লিখা রয়েছে- "এমন সময় আসবে যখন নারীগণ উলঙ্গপ্রায় পোষাক পরবে.....।" দেখতে দেখতে দরজার স্থানে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, দরজাগুলো স্বর্ণ দ্বারা মুড়ানো এবং সুন্দর করে কোরানের আয়াত খোদাই করা। সেখানে আমার বন্ধু প্রবেশের দোয়া পাঠ করলেন।

দোয়া দরুদ পড়ে বন্ধু যখন ভিতরে ঢুকলেন আমিও তার পিছে পিছে চললাম। আর আমার মনে হতে লাগলো সেই সব কিতাবের লিখনগুলো যাতে শিয়াদের কাফের বলা হয়েছে। ভিতরে যেয়ে আমি যে অবস্থা দেখলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর আমি যেহেতু অনভিজ্ঞ ও অপরিচিত তাই ভেবাচেকা খাওয়ারই কথা। সময় সময় এদিক সেদিক চেয়ে জিয়ারতকারীদের দেখছি। যারা জিয়ারত করছে, কেঁদে কেঁদে বেহুশ হচ্ছে, চুমু দিচ্ছে। আবার অনেকে নামাজও আদায় করছে। তখন আমার হুজুরের (সাঃ) সেই হাদীস মনে পড়ল যেখানে তিনি বলেন- "খোদার লানত ইহুদী ও নাসরাদের উপর কারণ তারা তাদের ওলিদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"। আমি আমার বন্ধু থেকেও অনেক দুরে পড়ে গেছি, যিনি ভিতরে ঢুকেই কাঁদতে থাকেন। আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখে সেই

খুটিটার পাশে গেলাম। যেখানে জিয়ারত সম্পর্কিত বিষয়াবলি লেখা। আমি এগুলো পড়ছি। আশ্চর্যের বিষয় তাতে এমন বড় বুজুর্গের নাম লিখা যার কথা জীবনেও শুনিনি। যে জন্য অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। আমি এককোনে দাড়িয়ে ফাতেহা পড়ে দোয়া করলাম- হে খোদা! যদি এই কবরবাসী মুসলমান হয়, তাহলে তাকে মাফ করো- তুমিত সবকিছুর নিপুন তত্ত্ব জান।

এ সময় আমার বন্ধু কাছে এসে কানে কানে বললো, যদি তোমার কোন সমস্যা থাকে তাহলে এখানে খোদাকে বল সমাধা হয়ে যাবে। আমরা এটাকে বাবুল্ হাওয়ায়েজ (সমস্যা সমুহের দরজা) বলি। কথাটা আমি শুনেও না শুনার ভান করলাম, আল্লাহ্ মাফ করুন। দাড়িয়ে দাড়িয়ে আমি সেই সব শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রু মন্ডিত মাথায় কাল সাদা পাগড়ী বাধা লম্বা লম্বা দাড়ি কপালে সেজদার চিহ্ন, গা থেকে ঘ্রাণ আসছিল এমন বৃদ্ধদের দেখছিলাম। বৃদ্ধগুলিকে দেখছি যারা প্রবেশ করছে আর দাড়ি টেনে টেনে ছিড়ছে- বুক চাপরে কান্নার রোল ফেলে দিয়েছে। এসব দৃশ্য আমার মন ও মস্তিষ্ককে ভাবিয়ে তুললো। যে সত্যিই কি এদের চোখের পানি সম্পূর্ণই মিথ্যে, বৃথা? এই বুড়ো লোকগুলি কি বিভ্রান্তিতে আছে? এগুলো ভাবতে ভাবতে অস্থির চিত্তে বেরুলাম্। তখন আমার বন্ধুও সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে মাজারের দিকে মুখ রেখে পিছিয়ে পিছিয়ে বেরুলেন যাতে কবরবাসীর কোন বেয়াদবী না হয়।

আমি বললাম- "এটা কার মাজার"?

বন্ধু- "ইমাম মুসা কাজেম (আঃ) "।

আমি- "এই ইমাম মুসা কাজেম (আঃ) আবার কে"?

বন্ধু- "সুবহানআল্লাহ! তোমরা আহ্‌লে সুন্নাত জ্ঞানের পথ ছেড়ে দিয়ে -গড্ডালিকাকে গ্রহন করেছ"।

আমি রাগতস্বরে বললাম- "আপনি একি বলছেন যে, আমরা জ্ঞান বুদ্ধির পথ ছেড়ে দিয়ে বাকলকে ধারণ করেছি"?

তিনি বললেন- "ভাই চটে উঠছ কেন, আপনি যখন ইরাকে এসেছেন তখন থেকেই আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) এর নাম বার বার স্মরণ করছেন- আমি যদি বলি তিনি কে? যাকে আপনি যারপর নাই সম্মান দিচ্ছেন। আমি গর্বিতভাবে সোজাসুজি বললাম- তিনি হলেন রাসুল (সাঃ) এর বংশধর। তাঁর পরে যদি কেও নবী হতো, জিলানীই হতেন"।

"বন্ধু বললেন- ভাই আল সামাভী, ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে কি তোমার কোন ধারণা আছে?"

আমি কোন কালক্ষেপন না করে বললাম- "অবশ্যই আছে"? তবে ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা সাদামাটা কারণ আমার প্রফেসার ও শিক্ষকগণ ইতিহাস পাঠের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ যোগাতেন না। বলতেন- ইসলামের ইতিহাসে কিছু কাল অধ্যায় আছে- তা পাঠে কোনই উপকারে আসে না। যেমন আমার গ্রামারের শিক্ষক -ইমাম আলী (আঃ) এর ভাষণসহ "নাহজুল বালাগা" পড়ান। এটা পড়ার সময় ক্লাশের অন্যান্য ছাত্র ভাইয়ের মত আমিও খুব বিচলিত হয়ে পড়ি এবং জিজ্ঞেস করি "সত্যিই কি এটা ইমাম আলী (আঃ) এর বক্তৃতা"? শিক্ষক বললেন- "অবশ্যই- কেন না? হযরত আলী ছাড়া এ ধরণের উচ্চাঙ্গের ভাষাশৈলি শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের এমন মনোহরী উপস্থাপনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? যদি এটা হযরত আলীর বক্তৃতা না হতো তাহলে প্রখ্যাত ইসলামী পন্ডিত যেমন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ, যিনি মিশরের প্রখ্যাত মুফতি তিনি এ গ্রন্থকে অতিশয় সম্মান দিতেন না"। আমি বললাম- "ইমাম আলী (আঃ) আবু বকর ও ওমর (রাঃ) কে খেলাফতের খিয়ানতকারী বলে"। শুনে উস্তাদ অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং আমাকে খুব শক্ত ভাবে ধমক দিলেন- "যে যদি দ্বিতীয়বার এ ধরণের কথা বল তাহলে বের করে দেব।" শিক্ষক আরও বললেন- "আমি গ্রামার পড়াতে এসেছি ইতিহাস নয়। আমাদের সেই ইতিহাস দিয়ে কি দরকার যার পাতায় পাতায় খুন লড়াই এবং ফেৎনার ঘটনায় ভরপুর। খোদা আমাদের তরবারীকে মুসলমানদের রক্ত থেকে যেমন পবিত্র

রেখেছেন, তেমনি আমাদের জিহ্বাকেও অন্যায় দোষারোপ থেকে মুক্ত রাখতে বলেছেন"। শিক্ষকদের এই কথায় আমি সন্দেহ মুক্ত হতে পারলাম না। বরং রাগ ধরলো যে আমরা অনর্থক গ্রামার অধ্যায়ন করছি। এর পর আমি ইসলামের ইতিহাস পড়ার বেশ কবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সময়ও সাধ্যের অভাবে সে পথে যেতে পারিনি। আমার শিক্ষকগণকেও দেখেছি তারা ইতিহাসের তেমন কদর করেননি। না এটা পাঠ করার কোন আগ্রহ দেখিয়েছেন, মনে হয় ইতিহাসকে তাকের উপর রেখে দেবার ব্যাপারে সবাই যেন একমত। তাই আপনি কাউকেই পাবেন না, যার কাছে ইতিহাসের কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে। তাই আমার বন্ধু যখন ইতিহাস অধ্যায়নের কথা বললেন, তার প্রতি রাগে হ্যাঁ বলে দিয়েছি, কিন্তু আসলে আমিও জানি "ইসলামের ইতিহাস বেশ কিছু কাল অধ্যায়ে ঢাকা যেগুলোতে ফেৎনা-ও ঝগড়ার বর্ণনাই পাওয়া যায়"।

বন্ধু- "তুমি কি জান আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কখন কোন শতাব্দির কোথায় জন্মগ্রহণ করেন"?

আমি- "আনুমানিক হিজরী ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দিতে"।

তিনি- "তাঁর মধ্যে এবং রাসুল (সাঃ) এর মধ্যে কতদিনের ব্যবধান"?

আমি- "আনুমানিক ছয় শত বৎসরের"।

বন্ধু- "যখন ব্যবধানটা ছয় শত বৎসরের তাহলে তার ও রাসুলের মধ্যে কমপক্ষে বার পুরুষ অতিক্রান্ত"?

আমি- "হ্যাঁ, এটাতো বলার অপেক্ষা রাখে না"।

তিনি, "যেমন মুসার (আঃ) বাবা ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) তাঁর বাবা মোহাম্মদ বাকের (আঃ) তাঁর বাবা জায়নুল আবেদীন (আঃ) তাঁর বাবা ইমাম হুসায়ন (আঃ) তাঁর মাতা ফাতেমা (আঃ)। মাত্র চার পুরুষ পরেই রসুল (সাঃ) সাথে মিলে যায়। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় তিনি হিঃ ২য় শতকে জন্মেছেন। এখন বলুন হযরত আব্দুল কাদের (রহঃ) ও মুসা কাজেম (আঃ) এর মধ্যে রসুল

(সাঃ) এর কে সবচেয়ে নিকটতম"? আমি চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বললাম "মুসা কাজেম (আঃ)"। তাহলে আমরা কেন তাঁকে চিনি না তাঁর কথা শুনি না? বন্ধু বললেন- "আরে ভাই এতো অধ্যয়নের ব্যাপার, এজন্যেই ত বলছি, মাফ করবেন আমাকে, আবার সেই কথাই বলতে হচ্ছে- আসলকে ছেড়ে দিয়ে আপনারা প্রচলিত আবেগকে ধারণ করছেন -রাগ করবেন না, আমি এ কথা বলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী"।

আমরা উভয়েই কথা বলছিলাম আর রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম এবং আমি খুব গভীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা কিছু ছাত্র-শিক্ষকদের এক সভায় চলে আসলাম। তারা বসে বসে কিছু বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত বিশ্লেষণ করছিলেন। আমরাও যেয়ে তাদের সাথে বসলাম কিন্তু, দেখলাম আমার দোস্ত এদিক সেদিক কাকে যেন খুঁজছেন। মনে হয় কার সাথে যেন সাক্ষাতের কথা ছিল। এ সময় আগন্তুকদের মধ্যে একজন এসে সালাম দিলেন, আমি বুঝলাম লোকটি তার ইউনিভার্সিটির ক্লাস মেট। বন্ধুটি তার কাছে একজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তাতে বুঝতে পারলাম তিনি একজন ডক্টরেট কে খুঁজছেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত আসবেন। আমার দিকে ফিরে বললেন- "আমি এখানে তোমাকে এনেছি একজন ডক্টরেটের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব বলে, যিনি বড় ইতিহাসবেত্তা এবং বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রফেসার। আর তিনি এই আব্দুল কাদের জিলানীর উপর থিসিস করেই ডক্টরেট নিয়েছেন। তিনি তোমার জন্য খুব উপকারী হবেন কারণ আমি ত ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ নই"।

আমরা সেখানে ঠাণ্ডা পানীয় পান করছিলাম। এসময় সেই ডঃ সাহেবও চলে আসলেন। বন্ধু তার সম্মানে দাড়িয়ে পড়লেন। এবং তাকে সালাম করে আমাকে তার সামনে নিয়ে বললেন- ভদ্রলোককে হযরত আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) সম্পর্কে কিছু বলুন। বন্ধুটি বলেই

আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে কোথাও চলে গেলেন। ডঃ সাহেব আমার জন্য আরও ঠাণ্ডা পানীয় চাইলেন, আর আমার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে তিনি আমাকে বললেন- "তিউনিসিয়ায় জিলানীর ব্যাপারে কি সব প্রসিদ্ধ আছে তা আগে বলুন"।

এ ব্যাপারে আমি ডক্টর সাহেবকে, জিলানীর (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ সব ঘটনাই খুলে বললাম। উপরন্ত বললাম, শবে মেরাজে সপ্তমাকাশের পর জিব্রাইল (আঃ) এর পাখা পুড়ে যাবার ভয়ে যখন আর অগ্রসর হচ্ছিল না, তখন এই আব্দুল কাদের জিলানীই হুজুর (সাঃ)কে নিজের কাধে করে খোদার দরবারে পৌছিয়ে ছিলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন- "আমার পা তোমার কাধে, ফলে তোমার পা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র অলীদের কাধে হবে"।

ডঃ আমার কথা শুনে খুবই হাসলেন। আমি বুঝতে পারলাম না, সে এই সব ঘটনা শুনে হাসলেন, না আমার জন্যে হাসলেন। কিছুক্ষণ অলি আল্লাহদের উপর আলোচনার পর তিনি বললেন- "আমি সাত বৎসর পর্যন্ত চিন্তা গবেষনা করেছি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশও ঘুরে বেড়িয়েছি। যেমন পাকিস্তান, তুরস্ক, বৃটেন, মিশর আরও অনেক দেশ, যেখানেই আব্দুল কাদের জিলানী সম্পর্কে সামান্য কিছুর সন্ধান পেয়েছি- গিয়েছি। এত বাছ-বিচার, গবেষনা অধ্যয়ন করে তার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন অবস্থাতেই এটা প্রমানিত হয় না যে তিনি রাসুল (সাঃ) এর বংশধর ছিলেন"। খুব বেশী বললে, তার বংশের ব্যাপারে তার সন্তানদের একজন শুধু বলেছেন- "আমাদের দাদা আল্লাহর রাসুল ছিলেন।" আর- কথাটি রাসুলের সেই হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, হুজুর (সাঃ) বলেছেন- "আমি প্রত্যেক মুত্তাকীর দাদা" এটাই অনেক আলেমের ধারনা। আমার নিকট জিলানীর জন্ম পরিচয়ের যে প্রমাণ রয়েছে তাহলো - আব্দুল কাদের ইরানী বংশোদ্ভূত, আরবী ছিলেন না। ইরানের একটি

শহরের নাম জিলান (গিলান) যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এজন্যেই তাকে জিলানী বলা হয়। পরে তিনি বাগদাদে আসেন। এখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন ও মুদারেস হন।

জিলানী একজন সুফী সাধক শ্রেণীর লোক ছিলেন বিধায় মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতে থাকে। তার মৃত্যুর পর তার প্রতি আস্থাভাজন লোক জন তার নামানুসারে তরিকা-ই-কাদেরিয়া জন্ম দেয়। যেমন প্রত্যেক পীরের অনুসারীরা করে থাকে। অতঃপর তিনি আরও বলেন, এটা একটা ঘটনা যা, আরবদের জন্য খুবই আফসোসজনক।

এসব শুনে আমার শিরা-উপশিরা গরম হয়ে যায়। আমি ডঃ সাহেবকে বললাম- "এর অর্থ হলো আপনিও ওয়াহাবী ধারণা পোষণ করেন। কারণ তারাও তো এই বলে যা আপনি বললেন, যে কোন পীর দরবেশ অলী গাউস নাই"। ডঃ বললেন- "জি না আমি ওহাবী নই"। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দুঃর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, তারা ধর্মীয় ব্যাপারে এমন সব কিছু মেনে নেয় যার উপর না আছে কোন আসল দলিল-না আছে কোন নকলী দলিল অথবা এমন সব কথা তারা আবিষ্কার করে বসে যেটা নবী (সাঃ) এর মোজেজা ও হাদীসের বিপরীত হলেও মেনে নেয়"। যেমন- কিছু প্রাচ্যের অনুসারী, কিছু পাশ্চাত্যের সুফিগন বলেন আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) একই সময়ে বাগদাদ ও তিউনিসিয়া পৌছতে পারেন। এবং একই সময় তিউনিসের রোগাক্রান্তকেও সুস্থ করতে পারেন।

এটাই অতি বিশ্বাস, বেশত। ওহাবীরা সুফীদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা এসব কিছুকেই মিথ্যে মনে করে। মূল কথা হলো, যদি কেউ নবীকে উসিলা বানাতে চায়, সোজা তাকে মুশরেক বলা হয়। আসল কথা হলো এ দুই প্রান্তিকের কোনটাই সঠিক নয়। আল্লাহ বলেন- *"এবং এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যমপন্থী জাতি হিসাবে মানব জাতির জন্য মাধ্যম বানিয়েছি যাতে তুমি তাদের জন্য স্বাক্ষ্য প্রদানকারী হতে পার"।* বাকারা-১৪৩।

আমাদেরকে এমন হতে হবে।

ডঃ সাহেবের কথা আমার ভাল লাগলো। আমি এ জন্যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আর তিনি যা বললেন তার উপর নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম। তিনি ব্যাগ খুলে নিজের লেখা আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) এর একখানা বই আমাকে উপহার দিলেন এবং খাবারের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু যেতে পারলাম না। অতঃপর আমরা বসে কথাবার্তা বলছিলাম কখনও তিউনিসিয়ার ব্যাপারে আবার কখন দক্ষিন আফ্রিকার ব্যাপারে। এ সময় আমার বন্ধুটি এসে পড়লেন- আমরা রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। সারা দিন কথাবার্তা, জিয়ারত, ভ্রমণ ইত্যাদিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি তাই সবাই ফিরেই শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে নামাজ পড়ে আঃ কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কিত বইখানি পড়তে বসলাম। আমার বন্ধু যে সময় উঠলো যখন আমি প্রায় অর্ধেক গ্রন্থ পড়ে শেষ করে ফেলেছি। এবং মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পর পরই নাস্তার জন্য আসছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ আমার বইটি শেষ না হল- নাস্তার জন্য উঠলাম না, যেন আমি এক অজানা আকর্ষণে বাধা পড়েছি।

সন্দেহ ও প্রশ্নাবলী

আমি তিন দিন পর্যন্ত বন্ধুর ওখানে বিশ্রাম করি, কোথাও বের হইনি। আর সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি, যারা শিয়াদের ব্যপারে খারাপ মন্তব্য করে- তারা কি চাঁদের দেশের বাসিন্দা নাকি? (যদি না হয়ে থাকে) তবে যারা যা নয়, তাদের ব্যাপারে সেই মিথ্যা আজগুবি কথা কেমন করে বলা হলো? বা তাদের সম্পর্কে ভাল করে না জেনে বুঝে কি করে মন্তব্য করা হলো? অথচ এই সব প্রপাগান্ডার মূলে ছিল সেই আদি বিদ্বেষ যে, শিয়ারা ইসলামের ধারাবাহিকতার বিপরীতে আলীর ইবাদত করে এবং তাদের ইমামদেরকে নবীর মর্যাদা দান করে। বলা হয় খোদা তাদের ইমামদের পূনর্জন্ম দেন এবং তাকে না পেয়ে তারা পাথরকে সেজদা করে। তারা রাসুলের কবরে শুধু এ জন্যই আসে যে, যেমন- আমার পিতা হজ্জ থেকে এসে বলেছিলেন শিয়ারা হজুরের মাজারকে নাপাক ও অপবিত্র করার জন্য আসে। এ জন্যই সৌদিরা গ্রেফতার করে তাদের হত্যার আদেশ দেয়। আর এরাই সেই নিজেদের মনমত কোন হেকমতের তুয়াক্কা না করে বাঁধাহীনভাবে সব কিছু করে থাকে।

একটু ভাবুন, সুন্নি মুসলমানগণ এসব শুনে, শিয়াদের প্রতি কেন খারাপ ধারণা পোষন করবে না? তাদের সাথে কেন দুশমনী রাখবে না? কেন তাদের সাথে হত্যা যজ্ঞে মেতে উঠবে না?

কিন্তু আমি (বিশুদ্ধ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর) কিভাবে এই প্রপাগান্ডায় বিশ্বাসী হবো? আমি তো নিজ কানে শুনেছি নিজ চোখে দেখেছি- এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি, তাতে তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই তো জ্ঞান অনুযায়ী পেয়েছি। কি তাদের নামাজ, তাদের দোয়া- ইবাদত, চরিত্র, তাদের উলেমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি সব দেখে শুনে আমার মনে

হতে থাকে, আহ্ আমিও যদি তাদেরই মত হতে পারতাম। আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আসলেই কি এরা রসুল (সাঃ)কে অপছন্দ করে? আমি যখনই হুজুর (সাঃ) এর নাম, নিয়েছি অনেক সময় তাদের পরীক্ষার করার জন্যও নিয়েছি, তখন তারা চরম আন্তরিকতার সাথে সর্বশক্তি দিয়ে জোরে জোরে "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ ওয়াআলে মোহাম্মদ" বলেছে। প্রথম প্রথম আমার মনে এও হয়েছে যে, আমাকে দেখানোর জন্য এরা কি মুনাফেকী করছে, কিন্তু যখন আমি তাদের মৌলিক গ্রন্থগুলো পড়েছি তখন দেখেছি তারা রসুল (সাঃ)কে এতটাই সম্মান ও মর্যাদা দেয়, যার এক দশমাংশও আমাদের গ্রন্থে নেই। ফলে আমার সমস্ত খারাপ ধারণা দূর হয়ে যায়। তারা হুজুর (সাঃ)কে নবুওয়াতের পূর্বে থেকে পরে অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাসুম মনে করে। কিন্তু আমরা সুন্নাত ওয়াল জামাত শুধু কোরআন প্রচারের ধারাবাহিকতায় তাঁকে মাসুম বলি। এ ছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ)কে আমরা অন্যসবার মত মনে করি। আবার অনেক সময় আমরা সাহাবীদের সিদ্ধান্ত, নবীর সিদ্ধান্ত হতে নির্ভুল মনে করি। এ ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু শিয়ারা, যে কোন মূল্যে নবীর সিদ্ধান্ত ভূল ও সাহাবাদের সিদ্ধান্তই সঠিক, এটি কোন অবস্থাই স্বীকার করতে চায় না। এত সবের পর আমি কি করে মানবো, যে শিয়ারা রাসুল (সাঃ) এর অনুসারী নয় বা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী?

একদিন আমার বন্ধুকে নিজের প্রশান্তির জন্য আরও কিছু প্রশ্ন করি। আমি আরও বলি, আল্লাহ্র কসম, সত্যভাবে উত্তর দিও। প্রশ্নেগুলো নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন- "আপনারা যে কেউ আলী (রাঃ) নাম উচ্চারণ করেন তখন (আঃ) বলেন, আপনারা কি তাকে নবী মানেন"?

উত্তরঃ "না, কখনও না। আমরা যখন আমীরুল মোমেনীন ও কোন ইমামের নাম উচ্চারণ করি তখন (আঃ) বলি, কিন্তু কোন অবস্থাতেই এর অর্থ এই নয় যে তারা নবী। এটা মূলতঃ রাসুল (সাঃ) ও তাঁর বংশের সম্মান। যাঁদেরকে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সালাত ও সালাম বর্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই জন্যেই আমরা (আঃ) বলি"।

প্রশ্নঃ ভাই, আমরা শুধু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর পূর্বের নবীদেরকে আল্লাহেস্‌সালাম বলার পক্ষপাতি। কিন্তু হযরত আলী এবং অন্যান্য ইমাম (রাজি আল্লাহ) দের কে আলাহেস্‌সালাম বলার পক্ষপাতি নই।

উত্তরঃ বিষয়টি আরও বুঝিয়ে বল।

প্রশ্ন-বন্ধুকে বললাম- আমি কোন্ কোন্ কিতাব পড়বো এবং আপনি বলেছিলেন আহম্মদ আমিনের লিখনি কোন অবস্থাতেই শিয়াদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। তাই শিয়াদের কোন গ্রন্থ ও আমাদের জন্য প্রামান্য হতে পারে না। আমরা শিয়াগ্রন্থগুলোর উপর ভরসাও করতে পারি না। কেননা আপনিই বলেছিলেন যে, ঈসায়ীদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ যাতে স্বয়ং ঈশা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আমি খোদার পুত্র"। যেখানে কোরআনে বলা হয়েছে, "যা সর্ব বর্ণনার সত্যায়নকারী ছিলেন"। হযরত ঈশা (আঃ) বলেন যে- *"আমি তো শুধু এটাই বলেছিলাম, যা তুমি আমাকে করতে নির্দেশ দিয়েছিলে, যে সেই খোদার এবাদত কর, যিনি আমার ও তোমার রব"।* (আল কোরান ৫:১১৭)

বন্ধু বললেন- জি, হ্যা- বলেছিলাম এবং আমি তোমাকে যা বলতে চাই, তা এটাই যে। জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিবেককে তুমি প্রয়োগ কর আর কোরআন ও হাদীসের সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন কর যখন কোন মুসলমানের সাথে কথা বলবে। আর যখন কোন ইহুদীও নাসারার সাথে কথা বলবে তখন অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন কর।

আমিঃ আমি কার কিতাবের দলিল দেব, কারণ প্রত্যেক মাজহাবই বলে তাদের কিতাব ও মতই সঠিক।

বন্ধুঃ আমি খুবই যৌক্তিক ও অকাট্য প্রমান দিচ্ছি অথচ আপনি তা জানেন না, খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আপনি দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ আমার ইল্‌মকে বৃদ্ধি করেন। আচ্ছা বলুনতো নিম্নোক্ত আয়াতটি কি পড়েছেন?

"অবশ্যই আল্লাহ তার ফেরেস্তা গণকে নিয়ে নবীর উপর (আল এর উপর) দুরূদ পাঠ করেন।হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকো।' (আল কোরান- সূরা এহ্‌যাব ৫৬)

এটার তাফসির পড়েছেন? শিয়া সুন্নী সকলেই ঐক্যমত এ ব্যাপারে যে, এই আয়াত অবতীর্নের পর সাহাবা কেরাম হুজুর (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন, "আমরা আপনার উপর কি করে সালাম পাঠাতে হয়, তা জানি কিন্তু দরুদ পেশ করতে হয় কি করে তাতো জানি না- তখন হুজুর বললেন- "আল্লাহোমা সাল্লে আলা মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ" এবং দেখ আমার উপর যেন আবার লেজ কাটা দরুদ পড়ো না। সাহাবাগন প্রশ্ন করলেন- *"লেজকাটা কেমন হুজুর, বললেন – আল্লাহোমা সাল্লে আলা মোহাম্মদ বলে চুপ হয়ে যাওয়া।"* আল্লাহ পরিপূর্ণ তাই তিনি পূর্ণতাকেই পছন্দ করেন। এতসব কারণেই সাহাবারাও তাবেয়ীনগণ হুজুরের আদেশকে জানতে পারেন ফলে প্রত্যেকেই পূর্ণদরুদ পেশ করেন। ইমাম শাফেয়ীও একারণেই আহলে বায়ত সম্পর্কে বলে ছিলেন-

"হে রসুলের বংশধর, তোমাদের মহব্বত কোরআনে ওয়াজেব করা হয়েছে, কোরআন খোদা অবতীর্ণ করেছেন। তোমাদের সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যে নামাজে তোমাদের উপর দরুদ না পড়িবে তার নামাজ নামাজই না।"

আমার বন্ধুর কথাগুলো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, অন্তরে জোঁয়ার বয়ে দিয়েছিল, মন তা গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে গিয়েছিল। যাই হউক, কথাগুলো, কোন বইতে মনে হয় পড়েছিলাম। খুব চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। বললাম- "আমি এতটুকু মানতে পারি যে, দরুদ পড়ার সময় আমরা আহলে বায়েত ও সমস্ত সাহাবাই-কিরামের উপর দরুদ পড়ি কিন্তু শিয়াদের মত শুধু আলীর স্মরণে (আঃ) বলি না। আমার বন্ধু বললেন- "ইমাম বুখারী সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি কি শিয়া ছিলেন – না সুন্নি?" আমি বললাম, "তিনি তো বিরাট বড় ইমাম ছিলেন। আল্লাহর কিতাবের পরেই তার গ্রন্থের সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা প্রমাণিত। আমার এতটুকু বলাতেই তিনি উঠলেন এবং নিজ লাইব্রেরী থেকে "বুখারী শরিফ" নিয়ে আসলেন। খুলেই তালাশ করে একটা পৃষ্ঠা আমাকে দেখিয়ে বললেন- পড়, "আমি পড়তে শুরু করলাম- "আমার থেকে তিনি- তার থেকে তিনি, তার থেকে হযরত আলী (আঃ)" শেষ পর্যন্ত পড়ে

আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি এতটাই আশ্চর্য হয়ে পরেছিলাম যে এটা "বুখারী" কিনা সন্দেহ হতে থাকে। উল্টে পাল্টে বইখানি দেখছি, আমার বন্ধু বুঝলেন আমি সন্দেহাবর্তে নিমজ্জিত, তখন তিনি বইটি নিয়ে আরও একটি পৃষ্ঠা বের করে দিলেন- সেখানে ছিল স্পষ্টভাবে যে, আমার থেকে আলী বিন হুসাইন আঃ বর্ণনা করেছেন দেখেই।" চোখ চরকগাছ, মুখে বলে ফেললাম 'সুবহানাল্লাহ', আমার বন্ধু আমার এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একা রেখে চলে গেলেন। আমি চিন্তা করতে থাকলাম, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে দেখছি, আর এও তালাশ করছি যে, বইটি কোথাকার ছাপা, দেখলাম মিশরের।

হে খোদা আর কতটুকু বিরোধীতা করতে পারি আর কতটুকুই বা দুশমনি করতে পারি, তারাতো আমাদের "বুখারী" থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) অবশ্যই শিয়া ছিলেন না। তিনি সুন্নিদের ইমাম এবং বড় মুহাদ্দেস ছিলেন- তা হলে কি আমি এই সত্যটা গ্রহণ করবো অর্থাৎ "আঃ" বলতে শুরু করবো? কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয়ও হচ্ছে এই সত্যকে মানতে যেয়ে যদি আরো কোন সত্যেকে মানতে হয়, যা আমার মন মানতে চাবে না। এটা আমার কাছে ঠিক মনে হলো না যে দ্বিতীয়বার বন্ধুর কাছে হার মানবো। প্রথমতঃ আঃ কাদের জিলানীর (রহঃ) চেয়ে ইমাম মুসা কাজেম (আঃ) সম্মানের দিক দিয়ে উত্তম মানতে হয়। আর এটাও মেনে নিচ্ছি যে আলীর সাথে "(আঃ)" বলা যায়েজ। কিন্তু তাৎক্ষনিক পরাজিত না হতে চেয়ে ভাবলাম- আমি তো সেই যে কদিন আগেও মিশরে সর্বস্বীকৃত আলেম হিসেবে প্রশংসিত হয়ে এসেছি। নিজের ব্যাপারে গর্ববোধ করেছি। আল্ আজহারের আলেমরা আমার প্রশংসা কম করেননি। আর আজ নিজেকে খুব দুর্বল ও পরাজিত মনে হচ্ছে। সেও কি আবার তাদের নিকট যাদেরকে সর্বদাই ভুলের উপর নিমজ্জিত মনে করেছি এবং 'শিয়া' শব্দটাকে একটা গালি মনে করেছি।

আসলে এটা আত্মঅহমিকা, মূলতঃ নিজেকে নির্ভুল মনে করার আকাঙ্খার গতানুগতিক ঐতিহ্যধারণ, পরিবেশ ও লাগামহীন মনের চাহিদা পুরনের ইচ্ছা। হে খোদা, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, সত্যকে ধারণ করার ক্ষমতা দাও তা যতই কঠিনই হউক। হে খোদা! আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল চোখই খুলে দাও। সিরাতুল মুসতাকিমের দিকে হিদায়াত কর। আমাকে তাদের দলভূক্ত কর, যারা কথা শুনে এবং সঠিক কথারই অনুসরণ করেন। খোদা, আমাকে সত্য দেখাও, সত্যের অনুসরণের তাওফিক দাও যা মিথ্যে তাকে মিথ্যে বানাও, আমার দৃষ্টিকেও মিথ্যে থেকে বাঁচার ক্ষমতা দাও। আমার বন্ধু যখন ঘরে ঢুকেছে তখন আমি এই দোয়াই আবৃত্তি করছিলাম। তাতে তিনি মুচকী হেসে বললেন- খোদা, আমাকে, তোমাকে তথা উম্মতকে হিদায়াত দান করুন। আল্লাহ বলেছেন- *"যে ব্যক্তি আমার রাস্তায় চলার জন্যে সর্বাত্মক (জেহাদ) প্রচেষ্টা করে, তাকে আমি অবশ্যই পথ দেখাই"।* (আল কোরআন ২৯:৬৯) খোদা, দয়া করে আমাকে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত কর। এই আয়াতে জিহাদের অর্থ হলো, সত্যের পথে চলতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। যে সত্যের অনুসন্ধ্যানী হবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে সত্যপথ দেখাবেন।

নাজাফ সফর

এক রাতে আমার বন্ধু বললেন, "ইনশাল্লাহ! কাল আমরা নাজাফ যাব"। বললাম- "নাজাফ কি"? তিনি বললেন- "সেখানে হাওজা-ইল্‌মিয়া এবং ইমাম আলী (আঃ) বিন আবু তালেবের মাজার শরীফ"। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আলী (আঃ) এর মাজার এরা পেল কিভাবে? কারণ আমাদের মুরব্বীগণ বলেন যে আলীর (আঃ) মাজার কোথায় তা নির্দিষ্ট নয়।

আমরা একটা পাবলিক বাসে চড়ে কুফা গেলাম। প্রথমেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের নমুনা কুফার মসজিদ জিয়ারত করি। আমার বন্ধু সেখানের ঐতিহাসিক স্থাসমূহ দেখান- মুসলিম বিন আকীল, হানীবিন উরওয়ার মাজারও জিয়ারত করি। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁদের শাহাদাতের বর্ণনা দিলেন। আমাকে সেই মেহরাবের কাছেও নেওয়া হলো যেখানে আলী (আঃ) কে শহীদ করা হয়। অতঃপর আমাকে সেই হুজুরাতেও নেওয়া হলো, যেখানে হযরত আলী (আঃ) তার দুই সন্তান হাসান (আঃ) ও হুসেইন (আঃ)কে নিয়ে বাস করতেন। হুজরায় একটি কুপও আছে যার পানি তাঁরা পান করতেন ও অযু করতেন। আমি সেখানে গিয়ে এগুলো দেখে এতটাই আত্মবিমুখ হয়েছিলাম যে, কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে ভুলে গিয়েছিলাম। আর ইমাম আলী (আঃ) এর পরহেজগারীর নমুনা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, তিনি আমীরুল মোমেনিন ও চতুর্থ খলিফা হিসাবে এত সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

এটা দেখার মত যে, সেখানের লোকজন খুবই শিষ্টাচার সম্পন্ন, আমরা যেদিকেই গেছি জনতা সম্মানার্থে দাড়িয়ে আমাদের সালাম দিয়েছে। আমার বন্ধু তাদের অধিকাংশকেই চিন্‌তেন। কুফার বড় মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তার সেখানে আমাদের দাওয়াত করেন এবং রাতটা তাঁর পারিবারিক অবস্থানে আমাদের খুব আরামেই কেটেছে।

আমার তো মনে হয়েছে নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছি। তারা যখনই তাহাদের আলোচনায় সুন্নিদের উল্লেখ করতেন তখন বলতেন- তারা আমাদের সুন্নিভাই। তাঁর সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা যখন শেষ হয়, তখন পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁকে কিছু প্রশ্নও করি যে, আসলেই তারা সুন্নিদেরকে মুসলমান মনে করে কি না।

আমরা পরদিন নাজাফের দিকে যাত্রা করি। যা সেখান থেকে দশ কিলোমিটার। সেখানে পৌছতেই বাগদাদের মসজিদে কাজেমিয়ার কথা স্মরণ হয়, যার সর্বোচ্চ মিনার খাঁটি স্বর্ণের পাত দ্বারা মুড়ান। শিয়াদের নিয়মানুযায়ী প্রথমেই আমরা যথাযথভাবে প্রবেশানুমতির দোয়া পাঠ করে আলী (আঃ) এর হেরেম শরীফে প্রবেশ করলাম। এখানে আমি ইমাম মুসা কাজেম (আঃ) এর মাজারের চেয়েও বেশী আশ্চর্যজনিত হয়ে গেলাম। স্বভাবতঃ মাজারে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়লাম কিন্তু সন্দেহ রইল, যে আসলেই কি এই কবরে ইমাম আলী (আঃ) আছেন? আমি আমার মনকে প্রবোধ দিতে চাইলাম- কিন্তু কোথায় সেই কুফার সাদা সিদা ছোট একটি ঘর আর কোথায় এই নাজাফ। যেখানে সমগ্রবিশ্বের অসংখ্য নরনারী কত অবহেলিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে অথচ এই স্বর্ণ মন্ডিত মাজারে (যদি এখানে তিনি থেকে থাকেন) আলী (আঃ) সন্তুষ্ট আছেন? যেখানে অসংখ্য বনী আদম রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে ফিরছেন। হে শিয়া ভাইয়েরা, তোমরা অবশ্যই ভুলের মধ্যে আছো- অন্ততঃ এতটুকুন ভুল অবশ্য। যেখানে রসুল (সাঃ) সমগ্র সাহাবাদের কবরকে একি ধরণের করতে বলেছেন, সেখানে আলী (আঃ) এর কবরে স্বর্ণচান্দির এই জৌলুশ? এটা যদি শিরক না হয় তবুও অতি রঞ্জিতের দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয় যা ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ।

আমার বন্ধু শুষ্ক একটা মাটির টুকরা হাতে নিয়ে বললেন, তুমিও কি নামাজ পড়বে, "আমি খুব জোর দিয়ে বললাম আমরা কবরের চার পাশে নামাজ পড়ি না।" বন্ধু বললেন "ঠিক আছে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর আমি দু' রাকায়াত নামাজ পড়ে আসি।" আর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বড় পিলারের উপর টানান বোর্ডে যা

লিখিত আছে তা পড়ছি। আর ফাঁক দিয়ে ভিতরের অবস্থা দেখছিলাম। দেখলাম বিশ্বের নানা ধরনের মুদ্রার স্তুপ পড়ে রয়েছে। স্তুপে দেরহাম, রিয়্যাল, দিনার, ডলার সব পড়ে আছে। জিয়ারতকারীরা এগুলো রেখে গেছে যাতে মাজারের সংস্কার কার্যক্রমে এগুলোও ব্যায়িত হয়। টাকাপয়সার যে বড় স্তূপটি আমি দেখলাম তাতে মনে হলো অন্তত একমাস লেগেছে তাতে। কিন্তু বন্ধু বললেন- "এগুলো একদিনের কারণ প্রতিদিন এশার পর খাদেম দিনের সবগুলো এখান থেকে খালি করে নিয়ে যান।"

আমি আমার বন্ধুর পিছে পিছে মন্ত্রমুগ্ধের মত বের হলাম- আহ্ যদি এর সামান্য কিছু আমার হতো তা হলে ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করতাম। কারণ ফকীর মিসকীনের সংখ্যাও তো কম নয়। রওজার চার দিকে দেয়াল বেষ্টনী। রওজা থেকে বের হয়েই এদিক সেদিক খোজ নিচ্ছি নামাজ কোথায় হয়। পাশেই শুনতে পেলাম কোন খতিব ওয়াজ করছেন এবং মানুষ বসে বসে কথা শুনছেন আর খতিব সাহেব উচু স্থানে বসে। অন্যদিকে কিছু লোকের ক্রন্দনের আওয়াজ কানে আসলো, কেও আবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন, কেউ বা জোরে কাঁদছে এবং বুক চাপড়াচ্ছেন। এ সময় আমার বন্ধুকে বলতে চাইলাম, এদের কি হলো যে এরা বুক চাপড়ে মাথা কুটে ক্রন্দন করছে? তখন দেখতে পেলাম কিছুসংখ্যক লোক কবর খুড়ে লাশ দাফন করছে। তখন আমি বুঝলাম, প্রিয় জনের মৃত্যুর জন্যই এ লোকগুলো বুক চাপড়ে কাঁদছে।

উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ

আমার বন্ধু আমাকে হেরেমের পাশেই নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদে নিয়ে গেলেন। মসজিদের ভিতর পুরুটাই কার্পেট বিছানো এবং মেহরাবে খুবই সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত কোরআনের আয়াত। আমার দৃষ্টি কজন বাচ্চার উপর পড়লো, যারা মেহরাবের কাছে পাগড়ি মাথায় বসে আলোচনা করছে। তাদের প্রত্যেকেব হাতেই কিতাব। আমি এই সুন্দর পরিবেশটা দেখে খুশি হলাম। কোন উস্তাদকে দেখলাম না। বাচ্চাগুলোর বয়স তের/চৌদ্দ বৎসর হবে। পরিবেশটা আমার কাছে আধ্যাত্মিক মনে হলো। এই লেবাসে বাচ্চাগুলোকে চাঁদের টুকরার মত দেখায়। আমার বন্ধু তাদের কাছে মাওলা "আল সাইয়েদের" ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তারা উত্তর দিল, তিনি নামাজের জামাত পড়াতে গেছেন। আমি বুঝলাম না, বন্ধু কোন সাইয়্যেদের ব্যাপারে প্রশ্ন করছে। তবে এতটুকু ধারণা করলাম যে, অবশ্যই কোন দ্বীনি আলেম। পরে বুঝলাম তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা সাইয়্যেদ আয়াতুল্লাহ খুঁই। যিনি হাওজা-ই ইলমিয়ার প্রেন্সিপাল। শিয়ারা সাইয়্যেদ বলতে তাঁদেরই বুঝায় যারা নবী বংশের। আর সৈয়দরা শিক্ষকই হউক বা ছাত্রই হউক কাল পাগড়ি পরিধান করেন। আর অন্য উলামারা সাদা পাগড়ী পরে। সেখানে আরও কিছু উচ্চমানের লোক আছে যারা আলেম নয় তবে মর্যাদাসম্পন্ন বিধায় তারা সবুজ পাগড়ী পরেন।

বন্ধু আমাকে বললেন- "অনুগ্রহ করে আপনি এখানে একটু বসুন, আমি সাইয়্যেদের সাথে একটু দেখা করবো।" ছাত্ররা আমাকে মারহাবা বলে স্বাগত জানাল। তাদের সাথে অর্ধবৃত্তাকারে বসলাম, আমি তাদের চেহারাগুলো খুতে খুতে দেখছিলাম এবং এই অনুভব করছিলাম যে এরা গুনাহ থেকে পূর্ণ নিষ্পাপ, এদের শরীর মন সম্পূর্ণ পবিত্র। এ সময় হুজুর (সাঃ) এর একটি হাদীস মনে পড়লো- "প্রত্যেক মানুষই খোদায়ী স্বভাব নিয়ে জন্মে, পরে তার বাবা-মা, ইহুদী নাসারা অথবা অগ্নি উপাষক বানায়"। সাথে সাথে নিজের মনে যোগ করলাম বা শিয়া বানায়।

ছাত্ররা আমাকে জিজ্ঞাস করিল আমি কোথাকার বাসিন্দা। বললাম "তিউনিসিয়ার"। তারা বলল "আপনাদের সেখানেও কি হাওজা এ ইলমিয়া আছে"? বললাম, "মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটি আছে"। এরপরই চতুর্দিক থেকে প্রশ্নের বান আসতে থাকলো।

সব প্রশ্নই, শিক্ষা বিষয়ক জটিল প্রশ্ন। আমি তাদের প্রশ্নের কি উত্তর দেব। যাদের বিশ্বাস গোটা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র আছে, যেখানে ফেকাহ্–উসুল–শরীয়াহ্, তাফসির পড়ান হয়। কিন্তু তারা তো আর জানে না যে, ইসলামী দুনিয়ায় এবং আমাদের দেশে যে সব পরিবর্তন হয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটি যে, কোরআনী শিক্ষার পরিবর্তে, বাচ্চাদেরকে আধুনিকতার নামে বস্তুসর্বস্ব কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে এবং সে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান গণ ইহুদী নাসারা। আমি কি বলে দেব যে, আমাদের তুলনায় তোমরা অনেক উত্তম?

তাদের একজন জিজ্ঞেস করলেন "তিউনিসে কোন্ মাজহাব সবচেয়ে বেশী প্রচলিত? বললাম "মালেকী"। তখন দেখলাম, তাদের অনেকেই হাসছে কিন্তু সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলাম না। তাদের একজন আবার প্রশ্ন করলো– "আপনি কি মাজহাবে জাফরীকে জানেন"? বললাম "না – এটা আবার কোন মাজহাব। আমি শুধু হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এই চার মাজহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাব জানি না। আর এর বাইরে কোন মাজহাব থাকলেও তা ইসলামী নয়।"

সে মুচকী হেসে বলল– "মাফ করবেন, জাফরী মাজহাবই মূলতঃ ইসলামী। আপনি কি জানেন না যে আবু হানিফা ইমাম সাদিক (আঃ) এর ছাত্র ছিলেন? যে ব্যাপারে আবু হানিফা বলেছেন– "নোমান যদি দুই বৎসর ইমাম জাফর (আঃ) এর (সাদিকের সাহচার্য্যের) শিষ্যত্ব গ্রহণ না করতো তা হলে নোমান ধ্বংস হয়ে যেত। কথাগুলো শুনে কিছু না বলে আমি চুপ মেরে গেলাম। তারা এমন একটি কথা বললো যা আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি, তবুও আমি শুকরীয়া জ্ঞাপন করলাম যে তাদের ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) ইমাম মালিকের শিক্ষক ছিলেন না।"

তাই বললাম আমি মালেকী, হানফী নই। তখন শিশুরা বলল, তাতে কি হয়েছে, চার মাজহাবের সবাইতো পরস্পরের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। যেমন আহমদ বিন হাম্বল শাফেয়ী থেকে, শাফেয়ী ইমাম মালেক থেকে, ইমাম মালেক ইমাম আবু হানিফা থেকে, আর ইমাম আবু হানিফা ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) থেকে। এ ভাবেই সকলেই ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ (আঃ) এর ছাত্রে পরিণত হল।

জাফর সাদিক (আঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদে নববীতে সর্ব প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। চার হাজারের চেয়ে বেশী মুহাদ্দেস ও ফকীহ তাঁর চরণে সৌভাগ্যবান হন। বাচ্চাদের কাছে এসব শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আর সেই যে তারা এমন ভাবে বলছে যেন কোরানের আয়াত মুখস্ত বলছে, এতই তাদের স্মরণ ক্ষমতা। আমি ত আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম এসব কথার রেফারেন্স তারা ইতিহাসের শিরোনাম, অধ্যায়, খন্ডসহ উল্লেখ করেছে। তারা আমার সাথে এভাবে কথা বলছে যেন মনে হয় কোন শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছে। তাদের সামনে আমি আমার দুর্বলতা পুরোটাই অনুভব করলাম। মান সম্মানের প্রশ্নে মনে মনে আপসোস করতে লাগলাম যে, হায় আল্লাহ, আমি যদি তখন বন্ধুর সাথে চলে যেতাম কতই না ভাল হতো। আর এই বাচ্চাদের মাঝে না বসতাম। তাদের যে কেউই যখন আমাকে প্রশ্ন করতো ইতিহাস ও ফেকাহ বিষয়ে; তা এমনই যা আমি উত্তর দিতে পারতাম না। তখন একজন বললো, ইমামদের মধ্যে কার তাকলিদ করেন? "বললাম- ইমাম মালেক (রহঃ)"। আবার প্রশ্ন- "মৃতের অনুসরণ কি করে করেন, যার মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রায় চৌদ্দশত বৎসরের ব্যবধান? এখন যদি আপনি বর্তমানের কোন সমস্যা সর্ম্পকে তাকে প্রশ্ন করেন সে কি উত্তর দিতে পারবেন"? আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম "তোমাদের ইমামও তো মারা গেছেন প্রায় চৌদ্দশত বৎসর হলো"। তখন বাচ্চারা এক সাথে সবাই সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে দিল যে, "আমরা সাইয়্যেদ খুইয়ের অনুসরণ করি। তিনিই বর্তমানে আমাদের নেতা ও মার্জা"। তখন কথাটা বুঝলাম না, যে আল্লামা খুই অধিক জ্ঞানী না ইমাম জাফর সাদিক?

আসল কথা হলো মনে মনে আমি সেই বাচ্চাদের সাথে আলোচ্য বিষয় পরিবর্তনের সুযোগ খুঁজছি। আমি তাদের এমন প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যেন তারা এ প্রসঙ্গ ভুলে যায়। তাই আমি তাদেরকে নাজাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম "বাগদাদ এবং নাজাফের মধ্যে দূরত্ব কতটুকুন, তোমরা কি ইরাক ছাড়া অন্য কোন দেশে গেছ?" তারা যত তাড়াতাড়ি উত্তর দিত আমার প্রশ্নও ততই

তাড়াতাড়ি হতো। আসল কথা এভাবে আমি তাদেরকে ব্যস্ত রাখছি যাতে সেই বিদঘুটে আলোচনায় তারা যাওয়ার সুযোগ না পায় এবং প্রশ্ন না করতে পারে। কারণ আগেই বলেছি, আমি বাচ্চাদের কাছে যে দুর্বল তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। কিন্তু মুখেতো আর প্রকাশ করা যায় না। যদিও মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, মিশরে যে বুজুর্গী আমার অর্জিত হয়েছিল এখানে তা উবে গেছে। অতঃপর এই বাচ্চাদের সামনে সেই বিজ্ঞ কথাই আমার স্মরণ হলো যে-

"সেই ব্যক্তিকে বলে দাও যে দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানের দাবী করে। তুমি শুধু এক জিনিস জেনেছ এবং অনেক জিনিসই তোমার জানা নেই"। আমি এটা বুঝে ফেললাম যে, এই বাচ্চাদের জ্ঞান সেই আল-আজহারের বৃদ্ধদের চেয়েও বেশী, যাদের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে এবং তিউনিসিয়ার সেই বুজুর্গদের জ্ঞানের থেকেও বেশী যাদেরকে আমি চিনি।

এ সময় সাইয়্যেদ খুঁই আগমন করলেন এবং তাঁর সাথে আসলেন আলেমের এক দল, যাদের চেহারায় ব্যক্তিত্বের নূর ঝল্সে উঠছে। ছাত্ররা সবাই তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াল এবং তাদের সাথে সাথে আমিও দাঁড়ালাম। সবাই সামনে ঝুকে পড়ে সাইয়্যেদ খুইয়ের হাতে চুমা দিতে লাগলো। কিন্তু আমি নিজের স্থানে মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকলাম। সাইয়্যেদ বসার সাথে সাথে সকলেই বসলো। খুঁই সবার দিকে চেয়ে চেয়ে শুভ সন্ধ্যা বলতে লাগলেন। যাকে তিনি এটা বলেছেন- সেই আবার তদুত্তরে এটাই বলেছে। এমতাবস্থায় আমার সিরিয়াল আসলো এবং আমিও তাই বললাম, এর পর আমার বন্ধু খুঁইয়ের কানে কানে আমার দিকে চেয়ে কি যেন বলল। আর আমাকে বললেন- "আপনি সাইয়্যেদের কাছে এসে বসুন"। সাইয়্যেদ আমাকে তার ডানে বসালেন। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বন্ধু আমাকে বললেন- "সাইয়্যেদ কে বল তোমরা তিউনিসিয়ায় শিয়াদের ব্যাপারে কি শুনেছ?" আমি বললাম সেখানে আমরা যা শুনেছি তা উল্লেখ করে লাভ কি বরং এখন আমি সাইয়্যেদকে কিছু প্রশ্ন করবো, কিন্তু শর্তহলো উত্তর খুব সঠিক ও দলিলগত হতে হবে। কিন্তু আমার বন্ধু বললেন- "আগে সাইয়্যেদকে বল শিয়াদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি?"

বললাম- "আমাদের নিকট শিয়ারা ইসলামের জন্যে ইহুদী নাসারাদের চেয়ে আরও ভয়াবহ। কারণ ইহুদী-নাসারারা খোদার ইবাদাত করে, মুসা (আঃ) এর রেসালাতে বিশ্বাস করে কিন্তু শোনামতে শিয়ারা আলী (আঃ) এর ইবাদত করে, তারই গুণগান গায়। হ্যাঁ, শিয়াদের মধ্যে একটা দল আছে যারা আল্লাহর ইবাদাত করে কিন্তু তারাও আলীকে হুজুর (সাঃ) এর সমমানের মনে করে।" অতঃপর আমি জিব্রাইলের ঘটনা বললাম, যে তাকে দোষারোপ করা হয় আলীর (আঃ) রেসালাত, সেই নাকি ভুলে মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে নিয়ে গেছে।

সাইয়্যেদ খুঁই কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা নোয়ালেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন- আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল (সাঃ)। খোদা তার উপর এবং তার পবিত্র আলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আর হযরত আলী (আঃ) খোদার একজন বান্দা।" অতঃপর তিনি শ্রোতাদের দিকে ফিরে আমাকে দেখিয়ে বললেন- "দেখ ভুল ও মিথ্যা প্রপাগান্ডা মানুষকে কতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারে, তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আমি অন্যদের কাছ থেকে আরও জঘন্য কথাবার্তা শুনেছি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আজিম" অতঃপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন- "আপনি কি কোরান পড়েছেন"? উত্তরে আমি বললাম।- "আমি-দশ বৎসর বয়সেই অর্ধেক কোরআন হেফ্জ করেছি।"

সাইয়্যেদঃ "আপনি কি জানেন যে ইসলামী ফেরকাগুলো নিজেদের মাজহাবী ভিন্নতার মধ্যেও কোরআনের ব্যাপারে একমত। যে কোরআন আমাদের কাছে আছে সেই কোরানই তো আপনাদের কাছেও?"

আমি- "জি, হ্যা, এটাও জানি।"

সাইয়্যেদঃ "তাহলে কি আপনি খোদার সেই ঘোষণা পড়েন নি যে "মুহাম্মদ (সাঃ) শুধুই আল্লাহর রাসুল বই আর কিছু নন, তার আগেও অনেক রাসুল অতীত হয়েছেন।' (আলে-ইমরান, ১৪৪) আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

"মোহম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল এবং যারা তার সঙ্গে আছে তাঁহারা কাফেরদের উপর কঠোর।" (সূরা–ফাতাহঃ ২৯)

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী।" সূরা–আহ্‌জাবঃ ৪০।

বললাম "জি– হ্যা, আমি আয়াতগুলো ভাল করেই জানি।"

সাইয়্যেদ– "তাহলে এগুলোতে আলীর (আঃ) নবুওয়াতের কোথায় উল্লেখ আছে?" যখন আমাদের কোরান মোহাম্মদকে রাসুল বলে, সেখানে আমাদের উপর এই অভিযোগ কি করে আসতে পারে? কথাশুনে আমার কোন কথা না থাকায় আমি চুপ হয়ে গেলাম। তিনি আবারও বলতে লাগলেন– "হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর খিয়ানতের যে কথা বলা হয়েছে তা প্রথম অভিযোগের চেয়ে আরও জঘন্য। কেননা খোদা জিব্রাইলকে যখন মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অহী দিয়ে পাঠান, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর আর আলী (আঃ) ছিলেন বাচ্চা তাঁর বয়স ছিল ছয় বৎসর। তাহলে কি জিব্রাইল (আঃ) বড় এবং বাচ্চার মধ্যে পার্থক্যটুকুও অনুধাবন করতে পারেননি?" সাইয়্যেদ খুঁইয়ের এই প্রমানের পরে আমি বেশ কিছু সময় চুপ থাকলাম– এবং তার দলিলগুলোর উপর মাথা নিচু করে চিন্তা করতে লাগলাম। ভাবলাম এই অকাট্য বক্তব্যের পর অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে না। সাইয়্যেদ আরও বললেন–"আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি, সমস্ত ইসলামী দল, গ্রুপ ও মাজহাবগুলোর মধ্যে এক মাত্র শিয়া মাজহাবই নবী ও ইমাম (আঃ) গণের মাসুমিয়াতের (নিষ্পাপ) প্রবক্তা। ইমাম (আঃ)গণ যাঁরা আমাদের মতই মানুষ তাঁদেরই আমরা মাসুম বলি, তাহলে জিব্রাইল যিনি সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত, যাকে আল্লাহ্ 'রুহুল আমীন' উপাধী দিয়েছেন তিনি কি করে ভূল করতে পারেন– আর তা শিয়ারা বিশ্বাস করবে?"

আমি বললাম–"তাহলে এসব প্রপাগাণ্ডার কারণ কি"? সাইয়্যেদঃ এগুলো ইসলামের দুশমনদের বিস্তৃত জাল। যারা মুসলমানদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে রাখতে চায়। একে অপরের সাথে লাগিয়ে দিতে চায়। এগুলো তাদেরই কারসাজী অন্যথায় সব মুসলমানগণই পরস্পর ভাই ভাই। শিয়া হউক আর সুন্নি হউক।

প্রবক্তা। ইমাম (আঃ)গণ যাঁরা আমাদের মতই মানুষ তাঁদেরই আমরা মাসুম বলি, তাহলে জিব্রাইল যিনি সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত, যাকে আল্লাহ 'রুহুল আমীন' উপাধী দিয়েছেন তিনি কি করে এত বড় ভুল করতে পারেন আর তা শিয়ারা বিশ্বাস করবে?"

আমি বললাম "তাহলে এসব প্রপাগান্ডার কারণ কি"?

সাইয়্যেদ : এগুলো ইসলামের দুশমনদের বিস্তৃত জাল। যারা মুসলমানদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে রাখতে চায়। একে অপরের সাথে লাগিয়ে দিতে চায়। এগুলো তাদেরই কারসাজি অন্যথায় সব মুসলমানগণই পরস্পর ভাই ভাই। শিয়া হউক আর সুন্নি হউক। কেননা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করে। কেহই মুশরিক নয়। সবার কোরান এক, নবী এক, কেবলা এক, শিয়া সুন্নিদের মাঝে শুধু দেখার মধ্যে ভিন্নতা। এমন ভিন্নতা আসলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যেও আছে যেমন হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী ইত্যাদি।'

আমি বললাম "এক কথায় বলতে হয় আপনাদের বিরুদ্ধে যা প্রচলিত আছে মূলতঃ সবাই গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ।"

সাইয়্যেদ : "আল্লাহ শুকর, আপনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনি শিয়া শহরগুলো ঘুরেছেন, মধ্যবিত্তদের সাথে মিশেছেন। আপনি কি এ ধরনের কোন দোষণীয় তাদের মধ্যে পেয়েছেন? বা কোন শিয়ার কাছে শুনেছেন?"

আমি "জি, না। দেখিওনি, শুনিওনি। আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ যে তিনি জাহাজে আমাকে বন্ধু মুনয়েমের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছিলেন তিনি আমার ইরাক আসার কারণ হয়েছেন। ফলে আজ অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি।" এটা শুনে আমার বন্ধু মুনায়েম সহাস্যে বললেন "অজানার মধ্যে আলী (আঃ)-এর মাজারের বিষয়টিও ছিল।" আমি তাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম "আমি এখানে এসে অনেক কিছু শিখেছি, এমন কি বাচ্চাদেরও কাছেও। আফসোস যদি আমি এ ধরনের আলিমের ঘরে বসে শিখতে পারতাম"।

সাইয়্যেদ "আহলান ওয়া সাহলান" যদি আপনি চান তাহলে হাওজা আপনার শিক্ষার জিম্মা নিবে। আর আমি আপনার খাদেম হব। এই প্রস্তাব সবাই পছন্দ করলো, বন্ধু মুনয়েমের চেহারা খুশিতে খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি- "কিন্তু, আমি যে বিবাহিত, স্ত্রী ছাড়াও দুইজন সন্তান আছেন।"

সাইয়্যেদ- "আমি আপনার সমস্ত প্রয়োজনের জিম্মা হলাম ঘর, বেতন, আসবাবপত্র যা লাগে। বড় কথা হল আপনি শিক্ষা গ্রহণ করবেন। আমি কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে নিজের মনেই বললাম- "এটা কি করে সম্ভব পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করার পর আবার ছাত্র হবো তাই বিষয়টা এত তাড়াতাড়ি ফায়সালা করা ঠিক নয়।"

আমি ওস্তাদ খুঁইয়ের এই উদার মনোবৃত্তির জন্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। বললাম, ওমরা থেকে ফিরে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করবো। এখন আমার বই পুস্তকের খুব প্রয়োজন। তখন সাইয়েদ হুকুম দিলেন, তাঁকে কিছু বই দিয়ে দাও। নির্দেশ পেয়ে কিছু আলেম উঠে আলমিরা খুলে আমার সামনে ষাট/সত্তরটি বই জড় করলেন। প্রত্যেকেই একটা দুটা করে বই নিয়ে আসলেন- আর 'খুঁই' বললেন "আমার পক্ষ থেকে এগুলো হাদীয়া।" আমি দেখলাম এত কিতাব নিয়ে যাওয়া আমার জন্য খুবই কঠিন। বিশেষ করে আমি যেহেতু সউদি যাব, আর ওহাবীরা কোন ধরনের কিতাবপত্র নিতে দেয় না। কারণ কোনদিক দিয়ে আবার তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে কোন গ্রন্থ ঢুকে পড়ে। কিন্তু আমিত কিতাবগুলো হেলায় ফেলার অবস্থা করতে পারিনা। কারণ এত গ্রন্থ জীবনে দেখি নি।

তাই বন্ধু মুনয়েম ও উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম "আমার পথ অনেক দূর। দামেস্ক ও জর্ডান হয়ে সউদী যাব, ফিরতে আরও লম্বা পথ হবে, মিশর ও লিবিয়া হয়ে তিউনিসিয়া যাব। ওজন ছাড়াও অনেক দেশই আবার পুস্তক নিতে দেয় না। এমতাবস্থায় সাইয়্যেদ খুঁই বললেন "আপনার ঠিকানা আমাদেরকে দিয়ে যাবেন আমরা যথাসম্ভব দ্রুত আপনার বাসায় তা পৌছে দেব।"

সিদ্ধান্তটি আমার খুবই পছন্দ হলো। এবং আমার ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র তাকে দিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে যাওয়ার জন্য যখন দাঁড়ালাম তখন তারাও দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন "আমি আপনার শুভ কামনা করি। আপনি যখন আল্লাহর নবী, আমার প্রপিতা (সাঃ)-এর কবরে যাবেন তখন দয়া করে আমার সালাম দেবেন।" কথা শুনে সবাই প্রভাবিত হলো আমিও। দেখলাম খুঁইয়ের চোখ ভিজে গেছে। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, অসম্ভব এরা ভুলের মধ্যে থাকতে পারে না, মিথ্যে হতে পারে না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, ভদ্রতা-উচ্চমান দেখে মনে হলো তিনি সত্যই নবী বংশের সন্তান। অতঃপর আমি যাবার বেলায় তার সাথে মুসাফা না করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে চুমু দিলাম। তাঁর দাঁড়ানোর সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো আমাকে সালাম দিতে লাগলো, এবং আমার সাথে পত্রালাপের জন্য ঠিকানা চাইতে লাগলো যা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

সাইয়্যেদ খুঁইয়ের মজলিশে যারা বসে ছিলেন তাদের একজনের দাওয়াতে আমাদের আবার কুফায় যেতে হলো। তিনি হলেন মুনয়েম সাহেবের বন্ধু আবু শাব্বির। আমরা তার বাসায় গেলাম এবং চারজন যুবকের সাথে সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। যুবকদের কেউ আবার সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের ছাত্র ছিলেন। তারা বললো, আপনি সাইয়্যেদ বাকের সদরের সাথেও দেখা করুন। তারা স্থিরচিত্তে বলল, আগামীকাল সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। বন্ধু মুনয়েমও তা গ্রহণ করলেন। তবে আফসোস করে বললেন, আগামীকাল বাগদাদে কিছু প্রয়োজনীয় কাজের তাড়ায় তিনি আমাদের সাথে সৈয়দ বাকের এর সাক্ষাতে যেতে পারবেন না। শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে যতোদিন মুনয়েম বাগদাদ থেকে না ফিরবে ততদিন তিন/চার দিন আমরা আবু শাব্বিরের ঘরেই কাটাব। ফজরের পর মুনয়েম চলে গেলে আমরা বিশ্রাম নিতে গেলাম।

সেখানে যে যুবক ছাত্রদের সাথে আমরা সারারাত কথা বলে কাটিয়েছি, তাদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, এই ছাত্ররা ইসলামী স্কুল হতে ইসলামী জ্ঞান যেমন ফেকাহ শরীয়ত, তাওহিদ ছাড়াও অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা এতসব বিষয় কি করে অধ্যায়ন করলো।

আমি যাবার বেলায় তার সাথে মুসাফা না করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে চুমু দিলাম। তাঁর দাঁড়ানোর সাথে সাথে সবাই দাড়িয়ে পড়লো। আমাকে সালাম দিতে লাগলো, এবং আমার সাথে পত্রালাপের জন্য ঠিকানা চাইতে লাগলো যা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

সাইয়্যেদ খুইয়ের মজলিশে যারা বসে ছিলেন তাদের একজনের দাওয়াতে আমাদের আবার কুফায় যেতে হলো। তিনি হলেন মুনয়েম সাহেবের বন্ধু আবু শাব্বির। আমরা তার বাসায় গেলাম এবং চারজন যুবকের সাথে সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। যুবকদের কেউ আবার সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকের সদরের ছাত্র ছিলেন। তারা বললো, আপনি সাইয়্যেদ বাকের সদরের সাথেও দেখা করুন। তারা স্থিরচিত্তে বলল, আগামী কাল সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। বন্ধু মুনয়েমও তা গ্রহণ করলেন। তবে তিনি আফসোস করে বলছেন বাগদাদে কিছু প্রয়োজনীয় কাজের তাড়ায় তিনি আমাদের সাথে সৈয়দ বাকের এর সাক্ষাতে যেতে পারবেন না। শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে যতদিন মুনয়েম বাগদাদ থেকে না ফিরবে ততদিন তিন/চার দিন আমরা আবু শাব্বিরের ঘরেই কাটাব। ফজরের পর মুনয়েম চলে গেলে আমরা বিশ্রাম নিতে গেলাম।

সেখানে যে যুবক ছাত্রদের সাথে আমরা সারা রাত কথা বলে কাটিয়েছি, তাদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, এই ছাত্ররা ইসলামী স্কুল হতে ইসলামী জ্ঞান যেমন– ফেকাহ শরীয়ত, তাওহিদ ছাড়াও অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা এতসব বিষয় কি করে অধ্যায়ন করলো।

সৈয়দ বাকের সদরের আলোচনা বৈঠক

সাইয়্যেদ আবু শাব্বিরের সাথে আমরা সৈয়দ বাকের সদরের ঘরের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় তারা আমাকে প্রসিদ্ধ আলেম ও তাকলিদ সম্পর্কে অনেক কথা বলল। যখন সাইয়্যেদ বাকের সদরের ঘরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম সম্পূর্ণ ঘর ছাত্রে ভর্তি। তাদের অধিকাংশই পাগড়ি পরা। সাইয়্যেদ সদর আমাদের সম্মানে দাড়িয়ে পড়লেন এবং সাদর সম্ভাষন জানালেন, সকলেই আমাকে এগিয়ে

নিয়ে গেলেন। সাইয়্যেদ সদর আমাকে আদর যত্ন করে তাঁর পাশেই বসালেন। আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার প্রসিদ্ধ আলেম যেমন-আল-খিদর হুসাইন, আল তাহির বিন আশুর ও অন্যান্য সম্পর্কে আমার কাছে খোঁজ খবর নিলেন। তাঁর কথাগুলো আমার ভাল লাগছিল। এতবড় ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের খোলামেলা ব্যবহারের মাধ্যমে আমাকে এমনভাবে আপন করে নিল, যাতে প্রথম প্রথম অস্বস্তির পরিবর্তে আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন অনেক দিন ধরেই তাঁদের পরিচিত। এই বৈঠকও আমার জন্য অপ্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিল। ছাত্র-শিক্ষকের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুনায় আমি আমার ভিতরে জীবন্ত তাকলিদের কত প্রয়োজন তা উপলব্ধি করলাম। সাইয়্যেদ সদর সাহেব সুস্পষ্টভাবে সামনা সামনি সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান দিচ্ছেন। আমার বিশ্বাস হলো শিয়ারাও মুসলমান তারা শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করে না, রসুল (সাঃ) এর রেসালাতকেও অনুসরণ করে। শয়তানি ধোঁকার কারণে কখনও কখনও আমার মনে সন্দেহ জাগত হতো- হয়ত এরা আমার সাথে 'তাকাইয়া' করছে (বিশ্বাসের বিপরীত প্রকাশ)। আস্তে আস্তে আমার এই মানসিক দুর্বলতা ও সন্দেহ বিদূরিত হতে লাগলো। কারণ এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে যাদেরকেই আমি দেখেছি, কথা শুনেছি, তারা সবাই কি অভিনয় করতে পারে? আর এই অভিনয়ের প্রয়োজনই বা কি? আমি আবার এমন কি লোকটা হলাম? তাদের কাছে আমি এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে গেলাম, যে তারা আমার সামনে "তাকাইয়া" করবে? তাছাড়া তাদের হাজার বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ, মাস হয়নি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ সবটাতেই তৌহিদ-এ-খোদার (একাত্মবাদ) হামদ, রেসালাতে মোহাম্মদের (সাঃ) উপর নাত রয়েছে। এসব আমি নিজে চোখে দেখেছি, তার পরও তারা যে "তাকাইয়া" করছে আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে? আমি সাইয়্যেদ সদরের ঘরে দেখছি- যখনই মোহাম্মদের (সাঃ) নাম উচ্চারিত হয়েছে, তখন এক এক করে সকলেই উচ্চস্বরে নবীর উপর দরুদ পড়ছে।

যখন নামাজের সময় এসেছে তখন সবাই সাইয়্যেদের ঘরের নিকটে মসজিদে গেলেন। তখন সাইয়্যেদ সদর 'জুহরাইন' জামাতের সাথে পড়ালেন। আমার মনে হলো আমি সাহাবাদের সময়কাল

অতিবাহিত করছি। জহর এবং আসরের মাঝখানে একজন নামাজী এমন মধুর স্বরে দোয়া পড়ছেন যাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম- তারস্বরে যেন জাদু আছে। দোয়া শেষ হলে সকলেই পুর্বোক্ত দরুদ পাঠ করলেন। দোয়ার ভিতরেও হামদ ও নাতে পূর্ণ ছিল। দোয়া শেষে সাইয়্যেদ সদর মেহরাবের উপর উঠে বসলেন। মুসল্লিগণের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন চুপি চুপি ও জোরে জোরে, যে চুপিসারে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আস্তে, যিনি জোরে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর জোরে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নকারী উত্তর পেয়ে গেলেই সাইয়্যেদের হাতে চুমো দিয়ে বেরিয়ে যান। তাদের কি সৌভাগ্য যে তাদের কাছে এমন বড় আলেম আছেন যে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

শেষে আমরা সদর সাহেবের সংস্পর্শ থেকে চলে আসলাম। আর আজও তার কথা মনে পড়তেই একধরণের ব্যথা অনুভব হয়। সাইয়্যেদ সদর আমাদেরকে যে আদর আপ্যায়ন ও মেজবানী করেছিলেন তা আপনজনদের চেয়েও বেশী। তার সদাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উন্নততর লেনদেন দেখে, আমার মনে হয় আমি যদি একমাস তার সাথে থাকি তবে শিয়া হয়ে যাব। তিনি যখন আমাকে দেখতেন মুচকী হাসতেন এবং প্রথম সালাম দিতেন। আমাকে বলতেন কোন কিছু অসুবিধা নেইতো? সেই চার দিন শোয়া ছাড়া সব সময় তার সাথে ছিলাম। আমি তার কাছে সাক্ষাৎ প্রার্থী ও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত উলেমাদের ভীড় দেখেছি। সেখানে সৌদি আরবের আলেমও দেখেছি, আমি কল্পনাই করিনি সউদিতেও শিয়া আছে। যেমন বাহরাইন, কাতার, আমিরাত, লেবানন, সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুর্কিস্থান, আফ্রিকাসহ প্রত্যেক স্থান থেকেই তার কাছে আলেমগণ আসেতন। আর সাইয়্যেদ নিজোদ্যোগী হয়ে তাদের সাথে কথা বলতেন। তাদের সমস্যা সমাধান করে দিতেন, যখন তারা চলে যেতো তখন খুশি হয়ে যেত। এখানে একটা ঘটনা না বললেই নয়।

সাইয়্যেদ সদরের কাছে চার ব্যক্তি আসলেন, মনে হয় তারা সবাই ইরাকী। তাদের একজন তার দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে একটা বাড়ী পায়। অতঃপর বাড়িটা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। ক্রেতাও সেখানেই ছিল। বিক্রির এক বৎসর পর উনার ভাই প্রমান করেন যে

এই বাড়ীতে মৃতের উত্তরাধিকার হিসেবে তারও ওয়ারিশ আছে। চার জনই সাইয়্যেদের কাছে বসে গেলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাগজ পত্র দেখালেন, সাইয়্যেদ সদর সবগুলো কাগজ পড়লেন, কিছুক্ষণ তাদের সাথে আলাপ করলেন অতঃপর চার/পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফায়সালা দিলেন। ক্রেতার এই বাড়িতে বসবাসের অধিকার আছে এবং বর্তমানে বাড়ী তারই। বিক্রেতাকে বললেন তুমি যে দামে বাড়ী বিক্রি করেছো সেই টাকা হতে তাদের সমান অংশ সেই দুই ভাইকেও দিয়ে দাও। তখন সবাই সাইয়্যেদের হাতে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং পরস্পরকে কোলাকোলি করতে লাগলো। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে চাইলাম না। আবু শাব্বিরকে জিজ্ঞেস করলাম; "ঝগড়া মিমাংসা হয়ে গেল"। তিনি বললেন হাঁ। প্রত্যেকেই তাদের হক নিয়ে গেল? বললাম- "সুবহানআল্লাহ্" এত সহজে অল্প সময়ে ঝগড়াটা শেষ হয়ে গেল? আমাদের ওখানে তো কমসে কম দশ বৎসর লাগতো। বিচারের পূর্বে আবার অনেকে মারাও যায়। কিন্তু আদালতে বিচার চলতেই থাকতো। এবং উকিল-মুক্তার, পেশকারের পেছনে যে টাকা খরচ হতো, তাতে বেশী না হলেও এ ধরনের এক বাড়ী ক্রয়ের টাকা চলে যেত। এত কিছুর পর সমস্যার একটা সুরাহা হলেও আবার হাইকোর্ট হতো, আবার প্রথম থেকে বিচার। আবার খেটে আনা টাকা পয়সা বৎসরের পর বৎসর খরচ করে যাও। কিছু একটা ফয়সালা হয়ত হবে কিন্তু গোত্রে গোত্রে, 'বংশে বংশে', ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এর শত্রুতার জের থেকেই যেত। আবু শাব্বির বললেন, "আমাদের এখানেও একই অবস্থা। যে সরকারের কোর্টে কেইস করে তার পরিণতি আপনাদের দেশের মতই হয়, কিন্তু যারা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্বে বিশ্বাসী এবং ইসলামী আইনের বিচার মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা মার্জা-ই-কেরামের কাছে নিয়ে আসে। মকদ্দমা যথাসম্ভব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়াই শেষ হয়। যা এখন তুমি দেখলে আর জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশিত ফায়সালা ছাড়া আর কার ফায়সালা উত্তম? সাইয়্যেদ সাহেব এক পয়সাও নেন নি, কিন্তু কোর্টে গেলে টাকা নিতে নিতে পারলে কাপড় খুলে রেখে দিত"। আমি তার কথার ধরণে হাসতে হাসতে বললাম- "সুবহানআল্লাহ" এখনও আমি

এগুলোকে মিথ্যে মনে করেছিলাম- "যদি নিজের চোখে না দেখতাম তাহলে বিশ্বাসই করতাম না।" শাব্বির বলল- "না ভাই তাকে মিথ্যে বলবেন না- এটাও স্বাভাবিক ঘটনা, খুন-খারাবির মত ঘটনাও দুই এক ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়।" আশ্চর্য হয়ে বললাম- "তাহলে ইরাকে কি দুইটি সমান্তরাল প্রশাসন চলছে-একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আর একটা ধর্মীয় নেতাদের প্রশাসন।" তিনি বললেন- "আরে না প্রশাসন একটাই কিন্তু শিয়া যারা ইমামের তাকলিদ করে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কোন দরকার হয় না, কারণ সরকারের শাসন, ইসলামী নয়। তাই শিয়ারা শুধু দেশের বাসিন্দা হিসাবে, পৌর ও নাগরিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ট্যাক্স রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দিয়ে থাকে। কখনও যদি কোন অশিয়ার সাথে শিয়ার ঝগড়া হয় তবে বাধ্য হয়ে কোর্টে যায়। কেননা অশিয়া মুসলমানগণ দ্বীনি আলেমগণকে কাজী বানারোর পক্ষপাতি নয়। আমাদের এখানে দ্বীনি আলেম যে ফায়সালা দেন তা সমস্ত শিয়ারা মাথা পেতে মেনে নিবে- তাই আলেম যে ফায়সালা দেন তা সকলকেই মানতে হয়, তাৎক্ষণিকভাবে তা শেষ হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আদালতে বিচার বৎসরের পর বছর চলতে থাকে"।

এই কথা গুলো আমার অন্তরে গেঁথে গেছে কারণ তারাই খোদার হুকুমকে হুবহু পালন করছে।

"যে আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুমানুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না সে কাফের, জালেম, ফাসেক" ।। (মায়দা ৪৪. ৪৫. ৪৭)"

তখনই আমার ভিতর সেই সব জালেম শয়তানদের উপর ঘৃণা সৃষ্টি হয়। যারা খোদার ইনসাফী কানুনের বদলে নিজেদের স্বৈরাকানুন ও পদ্ধতি অবলম্বন করে চলছে। শুধু তাই নয়, খুবই লজ্জাস্কর ব্যাপার হল খোদায়ী বিধানের সাথে ঠাট্টা করে বলে- "এগুলো অমানবিক ও বর্বরতার নামান্তর"। যেমন কিছু নির্দিষ্ট শাস্তি- চুরি করলে হাতকাটা, ব্যভিচারীকে রজম করা (পাথর মেরে হত্যা), হত্যাকারীকে হত্যা করা। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে কোরআনী বিধানের ত্রুটি ধরার চেষ্টা করার এই হীনমন্যতা পশ্চিমা কারসাজি, যা ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র। কেননা এরা সবাই ব্যভিচারী, লুটেরা, জালেম, ঘাতক যদি তাদের উপর খোদায়ী নির্দেশ কার্যকর করা হয়, তা হলে তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি সাইয়্যেদ সদরের সাথে যে কয়দিন ছিলাম অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছি, অনেক কিছু প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছি। এমন কি আমার বন্ধুর নিকট যেগুলো জেনেছি সেগুলো আবার সদরের কাছে জেনেছি। যেমন সাহাবাদের ব্যাপারে তাদের কি অভিমত এবং তাদের ইমামদের সম্পর্কে কি ধারণা, আরও অনেক কিছু যেটাই আমার কাছে খটকা লেগেছে তাই সাইয়্যেদ সদরের কাছে প্রশ্ন করেছি।

আমি একদিন প্রশ্ন করলাম আজানের মধ্যে আপনারা হযরত আলীর (ওয়ালী আল্লাহ) (আঃ) বেলায়েতের ঘোষণা দেন কেন?

সাইয়্যেদ সদর বলেন- "আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) আল্লাহর একজন বাছাই করা বান্দা ছিলেন এবং শেষ নবীর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আল্লাহর পয়গামকে যথাযথ ভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব, আল্লাহ তাঁর উপর অর্পন করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। প্রত্যেক নবীরই একজন অসি (খাস প্রতিনিধি) থাকেন- রাসুল (সঃ)- এর অসি ছিলেন আলী। আল্লাহ ও রাসুলের বর্ণনানুযায়ী, আমরা আলীকে সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন মনে করি। সবার উপরের এই যে বিশেষ মর্যাদা তা কোরআন হাদীসের বর্ণিত দলিলের সাথে সাথে আকলী (জ্ঞান দ্বারা) দলিলের দ্বারা প্রমাণিত। এবং এসব প্রমানাদী সন্দেহাতীত। কারণ এগুলো আমাদের মতে যেমন সত্য ও নির্ভুল তেমনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ধারা মতেও বিশুদ্ধ। আমাদের আলেমগণ এই বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং যেহেতু উমাইয়া বংশের খলিফাগণ এই সত্য চাপা দিতে এবং আলী ও আলে আলী (আঃ) কে হত্যা করে শেষ করে দিতে চাইতো তাই শেষ মেশ হযরত আলীর উপর দোষ চাপিয়ে ও অভিসম্পাত করে মানুষের মন থেকে জোর জবরদস্তি করে তার নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চায় বিধায় নিরুপায় হয়ে তার অনুসারীরগণ আজানের সাথে ঘোষণা দিতে থাকে যে আলী আল্লাহর ওয়ালী। আর কোন আল্লাহর ওয়ালীকে কোন মুসলমানের দোষারোপ করা জায়েজ নয়। কাজটি তখন শুধু জালেম প্রশাসনের বিরুদ্ধে

নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছে যা আজ একটি উত্তম রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সম্মান যেহেতু আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাঃ)ও মোমেনীনদের জন্য সংরক্ষিত তাই এটা একটা ইতিহাসের অধ্যায়ের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে পড়ে যে আলীও তার দল সত্যপন্থী ছিলেন আর অন্যরা ছিলো বাতিল।

তিনি আরও বলেন– "আমাদের ফেকাহ্ এই তৃতীয় স্বাক্ষ্যকে "আলী উন ওয়ালী উল্লাহ" মুস্তাহাব বলেছে, ওয়াজেব বলেনি। আর এটা আজান একামতের অংশও নয়। যদি মুয়াজ্জেন সাহেব এটাকে আজান ও একামতের অংশ মনে করে, তাহলে তার আজান ও একামত বাতিল হয়ে যাবে। যদি কেও এটা করে, পূণ্য হবে; না করলে কোন গুনাহ নেই। যেমন এটা বলাও হয়েছে মুস্তাহাব"।

আমিঃ "আমাদের ওলেমা আমাদেরকে বলেছেন যে, উত্তরাধিকারের ক্রমানুসারে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক, তারপর হযতর ওমর, তারপর হযরত ওসমান তারপর হযরত আলী।"

সাইদঃ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, সবার কাছে মুখ আছে। যা ইচ্ছে বলতে পারে, আইনগত দলিল দিয়ে প্রমান করা কঠিন। ইহা ছাড়া আহলে সুন্নাতের গ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে এটা তার বিপরীত, কেননা তাদের গ্রন্থেই লেখা আছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর তারপর উসমান। সেই গ্রন্থতে হযরত আলীর নাম পর্যন্ত নাই। উনাকে তো সাধারণ লোকের অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা খোলাফায়ে রাশেদীনে থাকার জন্য হযরত আলীর নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়।"

অতঃপর আমি তাদের সেজদায় যে মাটির চাকার উপর কপাল রাখা হয় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

সদরঃ "প্রথমত এটা জানতে হবে যে আমরা মাটিতে সেজদাকরি, মাটিকে নয় যেমন অনেকে বলে যারা শিয়াদের বদনাম রটাতে চায়। সেজদা শুধু আল্লাহর জন্যে এটাতে শিয়া সুন্নি সকলেই একমত। আর এটাও ঐক্যমত যে সবচেয়ে ভাল হয় মাটিতে সেজদা করা বা যে জিনিস মাটি থেকে উত্থিত হয় এবং ভক্ষণযোগ্য নয় তার

উপর। এসব ছাড়া সেজদা করা বৈধ নয়। রসুল (সাঃ) মাটিতে নামাজ পড়তেন এবং তিনি মাটিও খড়ের মিশ্রিত টুকরা সঙ্গে রাখতেন এবং তার উপর সিজদা করতেন। সাহাবাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কাপড়ের টুকরার উপর সিজদা করতে বারন করেছেন। ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) তার বাবার কবরের অল্প মাটি উঠিয়ে রাখেন কেননা তা অবশ্যই উত্তম ও পবিত্র। তাই তাতে সেজদা করতেন। সে মাটিতে সাইয়েদশ্ শোহাদার রক্ত মিশে ছিল। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতিই শিয়াদের মাঝে আজও অব্যাহত আছে। আমরা কখনও বলি না যে সেই মাটি ছাড়া অন্য কোন মাটিতে সেজদা বৈধ নয়। বরং আমরা বলি প্রত্যেক পাক মাটি ও পাথর সেজদার জন্য উপযোগী। যেমন চাটাইয়ের উপর সেজদা বৈধ।"

আমি- "হযরত হোসেন (আঃ)-এর কথায় চলে আসায়, আমি বললাম- শিয়ারা মাতম করে কেন, কেন বুকে মাথায় হাত মারে? আর এত জোরে মারে যে রক্ত বের হতে থাকে। এটা ইসলামে হারাম। কেননা হুজুর বলেছেন- যে মৃতের জন্য বুকে মুখে হাত মেরে মাতম করে এবং জোরে জোরে কেঁদে জাহেলিয়াতের প্রার্দুভাব ঘটায় সে আমার দল ভূক্ত নয়।"

সাইয়্যেদ সদরঃ "হাদীস তো ঠিকই আছে, কিন্তু হোসেনের মাতমের উপর এটা বর্তায় না। কেননা যে হোসেনের প্রতিশোধের জন্য ডাক দেয় এবং নিজে সে পথের অনুসরণ করে তার মাতমের দ্বারা জাহেলিয়াতের প্রার্দুভাব হতে পারে না। তাছাড়া শিয়ারাও মানুষ, তাদের মধ্যে আলেমও আছে, জাহেলও আছে। আমাদের আবেগ আছে, অনুভূতি শক্তি আছে। যখন ইমাম হুসেন (আঃ) ও তাঁর বংশধরসহ সাথীদের নির্মম হত্যার কথা, তাঁর শাহাদৎ বার্ষিকীতে বর্ণনা করা হয় তখন তাদের জোশ বেড়ে যায়, যা আল্লাহর রাস্তায়ই হচ্ছে। আল্লাহ তার বান্দার নিয়তের উপরই বদলা দেন। আমি কদিন আগে মিশরের প্রশাসনের জামাল আবু নাসেরের মৃত্যুর উপর প্রচারিত প্রতিবেদন পড়েছি, তাতে বলা হয়েছে যে যখন আবু নাসেরের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হল তখন তা শুনে আটজনের মত আত্মহত্যা

করেছে, কয়জন ছাদের উপর থেকে পড়ে আবার কেউ রেলের নিচে পড়ে নিজেকে দ্বিখন্ডিত করেছে ইত্যাদি। আর আহত ও পাগল হয়েছে যে কত তা হিসেবের বাহিরে। এ ধরণের ঘটনা অনেক যা তাৎক্ষণিক আবেগে সৃষ্টি হয়। জামাল আব্দুল নাসেরের মৃত্যুতে যখন মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে দিতে পারে অথচ তার মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক। সুন্নিদের জন্য এটা ঠিক নয় যে তারা শিয়াদের মাতমের জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করে কেননা তারা শহীদদের সরদার ইমাম হুসেন (আঃ) এর আশুরায় মুসিবতের কথা শুনে জীবন কাটিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত সেই দুঃখের জীবনই বরণ করে নিচ্ছে। ইমাম হুসেন (আঃ) এর উপর স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কেঁদেছেন, তাঁর কান্নায় জিব্রাইল (আঃ) কেঁদেছেন। তাহলে কি হুজুর (সাঃ) এর কান্নাকে দোষ দেওয়া যাবে?

আমি বললাম- "শিয়ারা তাদের ইমামদের ও অলিদের কবর সোনা চান্দি দিয়ে মুড়িয়ে দেয় কেন? যেখানে ইসলামে তা হারাম।"

সাইয়্যেদঃ "এটাত শুধু শিয়াদের ব্যাপারে নয়, তাছাড়া বিষয়টি হারাম-ও না। আরে ভাই, আহলে সুন্নাতের মসজিদও সেটা ইরাকে হউক, বা মিশরে, তুর্কি অথবা অন্যকোন ইসলামী দেশে হউক প্রত্যেক স্থানে অনেক মসজিদ আছে যা স্বর্ণ চান্দি দ্বারা মুড়ান। মদীনায় মসজিদে নববী এমনকি স্বয়ং কাবার গায়ে প্রতি বৎসর কোরানের অক্ষরও খচিত যে গিলাপ পরান হয় তাও স্বর্ণের লিখিত।"

আমিঃ "সউদি আলেমরা বলে-কবর স্পর্শ করা, সালেহিনদের কাছে দোয়া করা, তাদের কাছ থেকে বরকত গ্রহণ, এ সবই শির্ক - এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?"

সাইয়্যেদঃ যদি কবরকে চুমা দেওয়া বা সালেহিনদেরকে এই নিয়তে দোয়া করা হয় যে, এটা ভাল মন্দের পাথেয়, তা হলে এটা শির্ক। এতে দ্বিমত নাই। মুসলমানগন তৌহিদবাদী, তাদের বিশ্বাস আল্লাহই সকল ভালমন্দের উৎস। মুসলমানগণ আউলিয়া ও ইমাম (আঃ)গণের মাজারে ঐ জন্যে দোয়ায়ে রেসানী করে যে ইমামগণ তাদের জন্য উসিলা হবে, তা অবশ্যই শিরক নয়। এ ব্যাপারে সকল

মুসলমান, হয় সে শিয়া বা সুন্নি সবাই একমত। একমাত্র ওয়াহাবী আলেম ছাড়া যাদের কথা কিছুক্ষণ হয় আপনি বললেন এবং তারা তাদের এই নতুন মাজহাব এই শতাব্দীতে তৈরি করেছে। তারাই মুসলমানদের ইজমার বিপরীত। তারাই নিজের মনগড়া বিশ্বাস দিয়ে সকল উম্মতের ভিতর ফাসাদ ঢুকিয়েছে অথবা তাদেরকে কাফের ফতুয়া দিচ্ছে। এরা মুসলমানদের রক্তকে হারাম করেছে। আর এই ওয়াহাবী শাসনই হাজীদেরকে বেধড়ক মেরেছে শুধুই এই অভিযোগে যে তারা ইমানের জোশে জোরে বলেছে।- "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুল আল্লাহ" এবং তারা হুজুর (সাঃ) এর রওজাকে স্পর্শ করতে দেয় না। তাদের সাথে আমাদের আলেমদের বেশ কবার বিতর্ক হয়েছে, কোন উত্তর দিতে পারেনি; কিন্তু তবু তাদের হটকারীতা শেষ হয়নি।

জনাব সাইয়্যেদ শরফ উদ্দিন- যিনি একজন শিয়া আলেম ছিলেন- যখন তিনি আঃ আজিজ আল সউদের সময়ে হজ্জ করেন তখন ইদুল আজহা উপলক্ষে রয়েল প্যালেসে রাষ্ট্রীয়ভাবে যতগুলো উলামাদের দাওয়াত করা হয় তার মধ্যে তিনিও ছিলেন। যখন তিনি বাদশার দাওয়াতে আসলেন এবং তার সাথে মুসাফা করলেন তখন সাইয়্যেদ বাদশাকে ছাগলের চামড়ায় মুড়ান একখানা সুন্দর কোরান উপহার দেন। বাদশা খুশি হয়ে তার সম্মানে কোরআনকে মাথায় নেন ও চুমু খেতে থাকেন।

তখন মাওলানা সোজা বাদশাহকে প্রশ্ন করেন "কি বাদশাহ হুজুর, একে কেন সম্মান দিচ্ছেন, চুমা খাচ্ছেন, এটাতো ছাগলের চামড়া।" বাদশা বললেন- "আমার নিয়ত হলো পবিত্র কোরআনকে চুমু খাওয়া, চামড়াকে নয়।" তখন সাইয়্যেদ শরফুউদ্দিন বললেন- "সাবাস খুব ভালো বলেছেন, আমরাও যখন নবী (সাঃ) এর হুজরার দরজা জানালাকে চুমু দেই, তখন আমাদের উদ্দেশ্য দরজা, জানালা নয়, কারণ আমরা জানি এটা লোহা এর ভালমন্দের কোন ক্ষমতা নেই এবং আমরা সেই লোহা বা কাঠের আড়ালে যিনি ঘুমিয়ে আছেন অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)কে সম্মান দেই। যেমন আপনারা গিলাপে চুম দেন

কোরআনকে সম্মান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন উপস্থিত সবাই একবাক্যে নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে বলে উঠে "তুমি ঠিক বলেছ।" বাদশা তখন নিরুপায় হয়ে পড়েন এবং হুকুম দেন, "সকল হাজী রাসুল খোদা (সাঃ) এর নিদর্শনাবলী বরকতের নিয়্যতে চাহিলে চুমা দিতে পারে।" পরে অন্য বাদশা এসে সেই সাবেকী নিয়ম চালু করে।

আসল কথা তাদের, মানুষের মুশরেক হওয়ার জন্য নয়, বরং তা রাজনৈতিক। যার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুসলমানদের বিরোধিতা করা, তাদের হত্যা করা, যাতে করে তাদের বাদশাহী মজবুতভাবে টিকে থাকে। এজন্য তারা মুসলমানদের উপর যা কিছু করেছে সব ইতিহাসই সাক্ষী।

অতঃপর আমি সুফিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন- পীরদের কিছু ভাল আছে কিছু খারাপ দিক আছে। ভালোর দিক হল যেমন, নাফসের বিশুদ্ধ করার ট্রেনিং, দুনিয়ার লালসা থেকে আত্মাকে কঠিনভাবে মুক্ত রাখা, রুহের উন্নতি সাধন ইত্যাদি। খারাপ দিক হল- সুফিগিরীর নামে বৈরাগ্য, প্রকৃত জীবন থেকে পালিয়ে থাকা, কয়টা নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে খোদার জিকিরকে নির্ধারিত করে দেওয়া, ইত্যাদি।

আর ইসলাম ভালকেই অনুমোদন করে, বাড়াবাড়ি ও খারাপকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদেরকে বলে দিন যে ইসলামের সকল শিক্ষাই স্বভাবসুলভ, ইতিবাচক। নেতিবাচক, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও নিঃশেষ করে দেয়া নয়।

সন্দেহ প্রবণতা ও অস্থিরতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সাইয়্যেদ বাকের সদরের উত্তর খুবই স্পষ্ট ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কিন্তু আমি এমন ব্যক্তি যার পঁচিশ বৎসর সাহাবা-ই-কেরামের পবিত্রতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে, বিশেষতঃ যার শিরা উপশিরাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহব্বত, শ্রেষ্ঠত্ব সীল হয়ে আছে, যাদের সাথে চলতে হুজুর (সাঃ) নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর এই খলিফাদের মাথার মুকুট হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক। আমি তাদেরই আদর্শের একজন অনুসারী। আমার ভিতরে কি বাকের সদরের বক্তব্য বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় রেখাপাত করতে পারে? আমি যখন থেকে ইরাকের জমিনে অবতরণ করেছি তখন থেকেই আবু বকর, ওমরের নাম শুনার জন্য কানকে সব সময় প্রস্তুত রেখেছি। মূলতঃ তাদের পরিবর্তে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম শুনেছি যা পুরাপুরি জানতামই না। যেমন- বার ইমামের নাম একমাত্র এই দাবীতে যে মৃত্যুর পূর্বে হুজুর (সাঃ) ইমাম আলী (আঃ)কে উত্তরাধিকার উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এখন এমনিতেই কি মানতে পারি যে সাহাবাগণ, মানুষের মধ্যে উত্তমের মানদন্ড, তারা সকলেই নবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন? অথচ দোলনা থেকে আমাদের এটাই শিখান হয়েছে যে সকল সাহাবা ইমাম আলী (আঃ)কে সম্মান করতেন তাঁর অধিকারের মর্যাদা দিতেন। কারন তিনি ফাতেমাতুজ জাহরা (আঃ) এর স্বামী, ইমাম হাসান হুসেনের পিতা, জ্ঞান শহরের দরজা ছিলেন। যেভাবে আলী (আঃ) হযরত আবু বকরের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন, যিনি সর্বাগ্রে মুসলমান হয়েছেন, রাসুল (সাঃ) এর হিজরতের সময় গুহায় তাঁর সাথী ছিলেন কোরআনেই তা বিবৃত রয়েছে। রাসুল (সাঃ) তার অসুস্থতায় নামাজের ইমামতিও আবু বকরকেই দিয়েছেন এবং বলেন- আমি যদি কাউকে বন্ধু বানাতাম সে হতো আবু বকর সিদ্দিক আর এসব কারণেই হুজুরের তিরোধানের পর গোটা মুসলিম উম্মাহ তাকেই খলিফা বানিয়েছেন।

এরকম আলী (আঃ) হযরত ওমরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হুজুর (সাঃ) তার নাম সত্য-মিথ্যা পৃথককারী 'ফারুক' রেখেছেন। এভাবে আলী (আঃ) ওসমানের হককেও মান্য করতেন যাকে ফেরেস্তারা পর্যন্ত সম্মান করতো, দেখে লজ্জিত হতো, যিনি বড় বড় যুদ্ধে সৈনিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করেছেন। যার উপাধী হুজুর (সাঃ) যিননুরাইন রেখেছেন। মোট কথা আমাদের শিয়া ভাইয়েরা কিভাবে এগুলোকে ভুলে যায়?

অথচ তারাই তাদেরকে সাধারণের মতই মনে করে, যারা প্রবৃত্তির বশে ভাল ও সত্য থেকে বিরত থাকে। আর তারাই নাকি রাসুলে খোদা (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর নাফরমানি করেছে। অথচ তারা সেই সব সাহাবী যারা রাসুলে-ই-খোদার নির্দেশ পালনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। ইসলামের ইজ্জত, সত্যের সহযোগিতায় নিজের বাপ, সন্তান স্ববংশীয়দের হত্যা পর্যন্ত করেছেন। তাদের মধ্যে এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করেছেন। এটা কি করে সম্ভব তারা দুনিয়ার বাদশাহির লোভে অন্ধ হতে পারে? রাসুলের অবর্তমানে নীতিচ্যুত হন? এটা কি করে হতে পারে? কি করে তা সম্ভব? না না, এ অসম্ভব।

এসব চিন্তা করে আমি শিয়াদের সব কথাই মানতে পারছিলাম না। যদিও তাদের অনেক কথাতেই আমি বিশ্বাসী ছিলাম। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতায় নিক্ষিপ্ত হই। সে জন্যেই যা শিয়া আলেমরা আমার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়, কারণ তাদের বক্তব্য খুবই যৌক্তিক ও তর্কাতীত। আর যে অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছিল, তাহলো আসলেই কি এই সব বড় বড় সাহাবাগণ চরিত্রের এত নিচে নামতে পেরেছিলেন যে জন্য তারা আমাদের মত সাধারণ লোভাতুর হতে পরেন? না কি রেসালাতের নূর তাদের থেকে উঠে গিয়েছিল, না কি মোহাম্মদ (সাঃ) এর হিদায়াতের বানী তাদের শেষ মেশ পাগল বানিয়ে দিয়েছিল? হে প্রভু, এ কি করে হতে পারে? সাহাবারা কি

এতটা অদূরদর্শি হতে পারেন যতটা শিয়ারা বলে থাকে। মোট কথা এই সন্দেহ ও অস্থিরতাই আমার দুর্বলতার সুচনাপর্ব, সেই জন্যই জানার আগ্রহ যে 'ডালে কিছু কালো আছে' যার মূল উদঘাটন খুবই জরুরী।

আমার বন্ধু মোনায়েম এসে পড়েছেন। আমরা কারবালায় গেলাম। সেখানে শিয়াদের মতই আমরাও ইমাম হুসেন (আঃ) এর স্মৃতি চারণে মাতম করলাম। তখন বুঝলাম ইমাম (আঃ) মরেন নি। তাঁর মাজারের চার দিকের ভীড়, পাগলের মত পড়ে যাওয়া, আহাজারী করে, চিল্লাচিল্লি করে কাঁদা, সব মিলিয়ে অবস্থাটা এমন যে, আমি এগুলো কখনও দেখি নি। বিষয়টা এমনই যে হযরত ইমাম হুসেন (আঃ) যেন এই মাত্র হয়ত শহীদ হয়েছেন। আমি খতিবকে দেখেছি, তিনি মিম্বরে বসে শ্রোতার উদ্দেশ্যে কারবালার ঘটনাকে এতটাই হৃদয়স্পর্শী করে বর্ণনা করছেন, উপস্থিত জনতা শুনে কোন মতেই ঠিক থাকতে পারছে না। উদভ্রান্তের মত– কান্নায় ঢলে পড়ছে। তখন আমি কাঁদতে থাকলাম, ব্যাকুল হয়ে কাঁদি। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, নিজেকে স্বাধীন করে দিলাম যে, কাঁদ মন ভরে কাঁদ। যখন চুপ হলাম তখন ভিতরে এতটাই রুহানীয়াত অনুভব করলাম যা আগে কখনও করিনি। মনে হলো, যে আগে আমি ইমাম হুসেন (আঃ) এর শত্রুদের কাতারে ছিলাম, এই প্রথম আজ আমি তার সঙ্গী সাথীদের কাতারবন্দী হলাম। খতিব, হুর (রহঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনিও প্রথম সেই সৈনিকদের কমান্ডার ছিলেন যারা ইমাম (আঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু আশুরার দিন তিনি যুদ্ধের ময়দানে খেজুরের শুষ্ক ডালের মত থর থর করে কাঁপছিলেন। সাথী জিজ্ঞেস করলো "কি ব্যাপার, তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছ"? তখন হুর (রহঃ) বলেছিলেন "আল্লাহর কসম তা নয় বরং আমি আমাকে বেহেস্ত ও দোজখের মাঝামাঝি স্থানে অনুভব করছি"। এটা বলেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন এবং ইমামের কাছে এসে বললেন "হে রাসুলের সন্তান আমার তওবা কি কবুল হতে

পারে"? খতিবের একথা গুলো শুনেই আমি মাটিতে ঢলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম- আমি যেন সেই হুরের মত, ইমামের কাছে মিনতি করছি, "হে নবীর সন্তান! আমার তওবা কি কবুল হতে পারে? রসুলের সন্তান আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"। খতিবের বক্তৃতা খুবই দাগ কাটার মত। মানুষ বুকে করাঘাত মেরে মেরে কাঁদছে, এ সময় আমার কাঁদার চিৎকার শুনে আমার বন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বুকের মাঝে আমাকে মিশিয়ে এমনভাবে কাঁদছেন যেন- অনেক পাওয়ার ধন, মাতা সন্তানকে বুকে চেপে ধরেছে। এবং বার বার কাদছে "হায় হুসেন" "হায় হুসেন।" আর আমি অনুভব করছি, আমার কান্না, আমার ভিতর বাহির সব ধুয়ে দিয়েছে। আর সেই রাসুলের হাদীসটা অনুধাবন হলো- "আমি যা জানি তোমরা যদি তাই জানতে তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী"।

সারাটা দিন আমি খারাপ মন নিয়ে অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছি। তখন বন্ধু কতকিছু বলে শান্তনা ও প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছে, কত কি খাবার সামনে এনেছে, সবই নিঃষ্ফল প্রয়াস। আমি স্বাভাবিক হতে পারিনি। আমার ক্ষুধা চলে গিয়েছিল। বন্ধুকে বললাম হুসেনের আর শাহাদাত এর ঘটনা আমাকে শুনাও। কেননা কারবালার ঘটনা সম্পর্কে কম বেশী কিছুই আমার জানা ছিল না। শুধু এতটুকুই জানতাম, যখন মুরুব্বীরা বর্ণনা করতো, তখন বলতেন- যে সব মুনাফেক ও ইসলামের শত্রুরা হযরত উমর, হযরত উসমান ও আলীকে হত্যা করেছে তারাই আবার ইমাম হুসেনকে কারবালার প্রান্তরে শহীদ করে। এর বেশী কিছু জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বরং আমরা আশুরার দিনকে এক ঈদের মত পালন করি। সে দিন জাকাত দেই, বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি করি, রুচীশীল মিষ্টি তৈয়ার করি, ছোটরা বড়দের কাছে বায়না ধরে যাতে ঈদের খুশিতে ঈদের সালামী দিয়ে তারা আমোদ স্ফুর্তি করে খাবার ক্রয় করতে পারে।

এটাও ঠিক কিছু কিছু বস্তি ও গোত্রে বিভিন্ন ধরণের নিয়ম কানুন মান্য করা হয় যেমন- আশুরার পর দিনে আগুন জ্বালান হয়, সেদিন কেও কোন কাজ করে না, বিবাহ শাদী করে না দেয় না, কোন খুশির অনুষ্ঠানাদি তারা করে না কিন্তু আমরা তাদের এগুলোকে তাদের ঐতিহ্য ও অভ্যাস হিসাবে উড়িয়ে দেই। আমাদের আলেমগণ এই দিনের রহমত, বরকত ও ফজিলতের উপর হাদীস বর্ণনা করেন- এটাও এক ধরণের আশ্চর্য হওয়ার মত।

ইমাম হুসেনের মাজার থেকে আমরা ইমামের ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ) এর মাজারে গেলাম। আমি জানতাম না এ আবার কে? কিন্তু বন্ধু তাঁর বীরত্বের অনেক ঘটনাও পরিচিতি তুলে ধরে ছিলেন। অনেক আলেম-ফাজেলের সাথে দেখা করি, কথা বলি কিন্তু দুঃখের বিষয় কারও নাম মনে নেই। তবে অনেকের উপাধি মনে আছে যেমন- বাহরুল উলুম, সাইয়্যেদুল হাকীম, কাশেফুল গিতা, আল-ইয়াসিন, তাবাতাবাই, ফায়রুজ আবাদী, আসাদ হায়দার আরও অনেক যারা তাদের সাহচর্য্য দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছে।।

মূল কথা হল তাঁরা খুবই পরহেজগার আলেম তাঁদের চেহারা নূরে নূরানী। শিয়ারা তাদের বহু সম্মান করেন। শিয়ারা তাদের সম্পদের পঞ্চমাংশ তাঁদের দিয়ে আসে। আর তা দিয়ে এই আলেমগণ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন, মাদ্রাসা বানান, ছাপাখানা দেন, ইসলামী দেশ থেকে আগত ছাত্রদের খরচ চালান, নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রশাসনের কমবেশী কোন ধরণের মুখাপেক্ষী তারা নন।

তারা আমাদের আলেমদের মত নয়, যে কোন কিছু করা দূরে থাক, কথাবার্তা পর্যন্ত প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া বলতে পারে না। কারন তারা বেতনভুক্ত আলেম, যখন ইচ্ছা তাদের বক্তা বা খতিব করা হয় যখন ইচ্ছা পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

আমার জন্য এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা, কলম্বাসের মত এগুলো আমি খুঁজে পেয়েছি বা আল্লাহ্ আমাকে তার রহমতে দিয়েছেন। এই দুনিয়ার বিরাগী হয়েও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলাম। দুশমনির পর আবার তাঁকে ভালবাসতে শুরু করলাম। এই জগৎ আমাকে নতুন নতুন চিন্তার খোরাক দেয়। আমার মনে সচেতনতা যুগিয়ে তর্ক অনুসন্ধান, বিচার বিশ্লেষণের ঝোক সৃষ্টি করে, যাতে করে আমি এই গুপ্ত সত্যকে খুঁজে পাই, যা আমার ধারণায় এই সময় ঘুরপাক খাচ্ছিল। যখন আমি এই হাদীস পাই যে বনি ইস্রাইল ৭১ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, নাসারারা ৭২ ফেরকায় আর আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। অথচ একটি ছাড়া আর সবাই দোজখী।

অন্যসব ধর্মের ব্যাপারে এটা অসম্ভব নয় যে তাদের এক দল নিজেদের সঠিক বলে অন্যদলকে বাতিল মনে করবে, কিন্তু এই হাদীস পড়ে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার এই টেনশনের কারণ শুধু হাদীস নয় বরং সেই মুসলমানদের জন্যও, যারা এই হাদীসকে পড়ে পড়ায়, কিন্তু এর উপর গবেষণা করে না, পর্যালোচনা করে না বের করে না বিভিন্নতার কারণসমূহ এবং কোন্ সেই দল যেটি মুক্তির আস্বাদ পাবে।

মজার ব্যাপার হল প্রত্যেক গ্রুপই দাবী করে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত। হাদীসটির শেষাংশে এও আছে যে– সাহাবাগণ প্রশ্ন করেছিলেন "তারা কারা, হে রাসুল্লাহ"! তিনি বললেন–"এরাই তারা যারা আমি এবং আমার সাহাবাদের পথে থাকবে। এখন আপনিই বলুন, এমন কি কোন দল আছে, যারা কিতাব ও সুন্নাতের উদ্ধৃতি দেয় না?– বা এমন কোন ইসলামী দল আছে, যারা এই দুটা ছাড়া অন্যকিছুর দাবী জানায়? যদি ইমাম মালেক, আবুহানিফা, শাফি আহাম্মদ বিন

হাম্বল- তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা কি কোরান ও সুন্নাতে সাহাবার অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন? এতো গেল সুন্নি বিশ্বাসের বেলায় এখন যদি শিয়াদের পর্যালোচনা করি- যাদেরকে আমি সর্বদাই ফাসেক মনে করে এসেছি- তারাও বলে যে আমরাই কোরান এবং সঠিক সুন্নাতের অনুসারী যা আহ্‌লে বাইত থেকে উদ্ধৃত। তাদের কথা,-ঘরের মালিকই অন্যের চেয়ে ঘর সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত থাকে, এখন বলুন এমতাবস্থায় এরা সবাই কি সত্য পথানুসারী? কোন কালেই নয়, কারণ হাদীস মাত্র একটি দলকে সঠিক বলেছে। তবে সবাইকে সঠিক পথানুসারী তখনই বলা যাবে, যদি কোন মতে হাদীস কে মিথ্যা বানান যায়। এটাও এজন্য সম্ভব নয়, কারণ হাদীসটি শিয়া সুন্নি সকল দলই 'মুতাওয়াতের' (বিশুদ্ধ) ভাবে উদ্ধৃত অথবা যদি এটা মানা হয় যে হাদীসটির কোন তাৎপর্য নেই বা এর সামান্যতা নেই? আসতাগফেরুল্লাহ তাও সম্ভব নয় কারণ-যে রাসুল (সাঃ) নিজের থেকে কিছু বলতেনই না আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া, যাঁর সকল কথাই হেকমত ও তাৎপর্যপূর্ণ, তিনি কি করে এমন কথা বলতে পারেন যার কোন প্রয়োজন বা অর্থ নেই? তাই আমাদের সামনে একটি পথ বেছে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই যে শুধু একটি দলই সত্যাশ্রয়ী, জান্নাতি, আর সব বাতিল, জাহান্নামী। এই হাদীসটি যেমন টেনশনের মুখোমুখী করে তেমন মুক্তি প্রত্যাশি প্রত্যেক বিবেককে তার পথ খুঁজে বের করতে বাধ্য করে।

এ কারণেই শিয়াদের সাথে সাক্ষাতের পর অস্থিরতা আমাকে ঘিরে ধরে, ভিতরে ভিতরে আমি দ্বন্দ্বে পড়ে যাই, যে হতেও পারে যে শিয়ারাই হয়ত সঠিক পথের অনুসারী। তাই আমি কেন গবেষণা করে বের করবো না যাতে দুধ দুধের স্থানে, পানি পানির স্থানে চলে যায় (সংমিশ্রণ না হয়)। স্বয়ং ইসলাম, কোরআন-সুন্নাতের দ্বারা হুকুম দিয়েছে যে, বিচার বিশ্লেষণ করে গবেষণার মাধ্যমে কাজ কর, কোরআনের ঘোষণা এবং *"যারা আমাদের রাস্তায় কঠোর চেষ্টা সাধনা করে- তাদের অবশ্যই আমাদের পথে পরিচালিত করব"*।(সূরা- আন্‌কাবুত ৬৯)

"যারা মন দিয়ে কথা শুনে, ভালগুলোর অনুসরণ করে, এরাই তাঁরা যাঁদের আল্লাহ হিদায়াত করেছেন– তারাই বুদ্ধিজীবী (জ্ঞানী)" (কোরআন–সূরা জুমুর–১৮) রাসুল (সাঃ) বলেন– "তোমরা দ্বীন সম্পর্কে এত ব্যাপক অধ্যয়ন করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তোমাকে পাগল বলতে থাকে তাই দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য করা শরিয়াতের দৃষ্টিতে অবশ্য কর্তব্য।

এই ওয়াদা, প্রতিজ্ঞা ও বিশুদ্ধ ইচ্ছা নিয়ে শিয়া ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তাদের সাথে মুসাফা করে বিদায়ের বেলায় হু হু করে আমার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। কারণ এই এক দিনে তাদের সাথে আমার খুবই ভাব হয়ে গিয়েছিল। আর তারা মনে প্রাণে আমাকে বরণ করে নিয়েছিল। আমি এখন কতিপয় বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছি যারা আমার সাথে খুবই সদাচরণ করেছে, তাদের সময় নষ্ট করে আমাকে সময় দিয়েছে। আর এত ত্যাগ তারা বিনা স্বার্থেই করেছে, কোন পার্থীব লোভে নয়। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। হাদীসে আছে– *"যদি খোদা তোমার উসিলায় কাউকে হিদায়াত দেন, তা দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়েও উত্তম।"*

শিয়াদের স্থান ও তাদের ইমাম (আঃ) দের পূণ্য ভূমিতে মোটামুটি বিশ দিন অবস্থানের পর তা থেকে বিদায় হই। এই বিশ দিন এমনভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো যেন কোন রোমাঞ্চকর স্বপ্ন– যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জাগতেই ইচ্ছে করছে না। তাই এত সংক্ষেপে বিদায় নিতে খুবই মন কাঁদছিল। ইরাকে এমন কিছু আমি রেখে যাচ্ছি যারা আহলে বায়তের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেখান থেকে আল্লাহর ঘর ও হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মুবারক জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে হেজাজের দিকে রওনা হচ্ছি।

হেজাজের সফর

জেদ্দা পৌঁছে প্রথম আমার বন্ধু বশিরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, সে আমাকে পেয়ে খুবই খুশী হলো। সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে খাতির যত্ন করলো। ছুটির সময় সে আমাকে তার গাড়িতে করে দূর দূরান্তের গ্রামে, শহরে বেড়াতে নিয়ে যেত। উভয়ে মিলে উমরা করতে গেলাম। আর কয়েক দিন দুনিয়ার সব কিছু ভুলে ইবাদাতে মশগুল রইলাম। ইরাকে চলে যাওয়ার কারণে বন্ধুর সাথে মিলতে দেরী হওয়ায় ক্ষমা চেয়ে সেখানের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলাম। সে খোলা মন নিয়ে সব শুনলো, কিছু বিষয়ে তারও ধারণা ছিল। তাই সে আমাকে বললো- "আমিও শুনেছি আজ কাল সেখানে কিছু বড় বড় আলেম আছে যারা কথাবার্তা বলছে, সেখানে অনেক ফেরকা আছে যারা কাফের ও বিভ্রান্ত। তারা প্রত্যেক বৎসর হজ্জে এসে আমাদের জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে"। আমি বললাম "সেটা আবার কি ধরণের সমস্যা যা তারা সৃষ্টি করে"? সে বললো- "কবরের চার পাশে নামাজ পড়ে, জান্নাতুল বাকীতে দলে দলে ঢুকে পড়ে। মাতম করতে থাকে, তাদের পকেটে পাথর রাখে, সেটায় সিজদা করে। আর যখন হামজা (রাঃ) কবরের পাশে যায় তখন মাথাকুটে বুকে হাত মেরে মাতম করতে থাকে। এমন একটা সোরগোল শুরু করে, যেন তাদের কেও মরে গেছে। এ সব কারণে ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি বাদশা তাদেরকে সে সব মাজারে ঢুকার ব্যাপারে রিজার্ভেশন সৃষ্টি করেছে"।

আমি মুচকী হেসে বললাম- "এ জন্যেই কি শুধু আপনারা তাদের কে ইসলাম বিচ্যুত বলবেন"? সে আরো বলল, "এ ছাড়াও আরও অনেক আছে যেমন, তারাও আসে রাসুলের কবর জিয়ারাত করতে কিন্তু হুজুরের কবর জিয়ারাত বাদ দিয়ে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে ওমর, আবু বকরকে গালি দেয়, তাদের অভিশম্পাত করতে থাকে। অনেকে, এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে ওমর, আবু বকরের কবরের উপর অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করেন"। এ কথা শুনে আমার পিতার

কথা মনে পড়লো- বরং তিনি আরও বাড়িয়ে বলেছিলেন- যে- নবীর কবরের উপর তারা নাপাকী ঢেলে দেয়। তাই বুঝা গেল বাবা নিজের চোখে দেখেননি, শুনেছিলেন। কারণ তার কথা ছিল- আমি সউদি সিপাইদের দেখেছি যে তারা কতিপয় হাজীদের মেরে তাড়াচ্ছিলেন, দেখে আমরা যখন প্রতিবাদ করেছিলাম যে, হাজীরা আল্লাহর ঘরের মেহমান, তখন তারা বলেছিলেন, "আরে ভাই এরা মুসলমানই না। এরা শিয়া যারা অপবিত্র জিনিস নিয়ে এসেছিলেন হুজুর (সাঃ) এর কবরে ফেলে দিতে। তখন আমরাও তাদের প্রতি ঘৃণা ও অভিসম্পাত করলাম।"

আর আজ যখন আমার এই বন্ধু যিনি সউদির অধিবাসী, তার কাছে এগুলো শুনছি যে তারা রাসুলের কবর জিয়ারাতের জন্য আসে আর অপবিত্র জিনিস আবু বকর ও উমরের কবরে নিক্ষেপ করে তখন আমার উভয় বক্তব্যের মধ্যেই সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ আমি নিজেই হজ্জ করেছি, তখন দেখেছি সেই রওজা মুবারক যেখানে, হুজুর (সাঃ) উমর ও আবু বকরের মাজার তালাবদ্ধ থাকে। কারও পক্ষেই সম্ভব না যে সেই হুজরার নিকটের দরজায় গিয়ে বা জানালাকেও চুমু দেয়। তাই, এই কথায় কিছুটা 'কিন্তু', মনে হয়। প্রথমতঃ এ জন্যেই সম্ভব নয় যে সেই হুজরায় কোন ফাঁক বা রাস্তা নেই যা দ্বারা কোন কিছু নিক্ষেপ করা যায়। এত কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর দরজায় দরজায় বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিকদ্বারা সুরক্ষিত, যাদের হাতে লাঠি যা দ্বারা তারা যাদেরকে জানালা বা দরজায় কাছে যেতে দেখে বেধড়ক পিটায়, কেউ উকি-চুকী দিতেও সাহসী হয় না। আমার মনে হয় সউদি সৈনিকদের মধ্যে যারা শিয়াদের কাফের মনে করে এটা তাদেরই রটানো। যাতে করে শিয়াদেরকে পিটানোর একটা বৈধ গ্রাউন্ড তৈয়ার হয় বা কমপক্ষে সুন্নি মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়। অথবা এতটুকুত হবেই যে, যখন শিয়াদের কে মারা হচ্ছে তখন মানুষ তামাশা দেখার মত নির্বাক হয়ে শুধু দেখছে, কোন প্রতিবাদ করছে না। আর এরা নিজ নিজ দেশে গিয়ে শিয়াদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা প্রচার করবে। বলবে শিয়ারা রাসুল (সাঃ) এর সঙ্গে শত্রুতা করে, হুজুরের কবরে নাপাকী ফেলে, এভাবেই এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হচ্ছে।

তার একটা উদাহরণ হলো- আমাকে একজন বড় খাঁটি বিশ্বস্ত লোক বলেছে যে, আমরা যখন কাবায় তাওয়াফ করছিলাম, ভীড়ের ঠেলায় এক যুবকের খুব গরম লেগে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে বমি করে দেয়। বাস আর যায় কোথায়, কাবার রক্ষিরা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, এবং এতই মারলো যে সে মৃত প্রায়। অতঃপর তাকে বের করে নেওয়া হলো আর রটনা করা হলো- সে নাপাকী কাবায় ফেলতে এসেছে। আর কজন স্বাক্ষীও দেওয়া হলো। সে দিনই তাকে হত্যা করা হয়।

আমার মাথায় এই ধারণাগুলো চরমভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠছিল। সউদি বন্ধুর ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম যে আসলে শিয়াদের ব্যাপারে তার কি ধারণা?

বার বার তাই এই কথাগুলো যে, তারা মাতম করে, বুকে মুখে হাত মারে, পাথরের উপর সেজদা করে, কবরের চার পাশে নামাজ পড়ে ইত্যাদি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর আমার নিজেকেই আমি প্রশ্ন করলাম, এতটুকুর জন্যেই কি একজন কালেমা বিশ্বাসীকে কাফের বানায়? শিয়ারা দুই কালেমার স্বাক্ষী দেওয়ার সাথে সাথে নামাজও পড়ে, যাকাত দেয়, রোজা রাখে, হজ্জ করে, ভালোর নির্দেশ, মন্দের নিষেধ করে; এত কিছুর পরও কি এরা কাফের হতে পারে?

আমি আমার বন্ধুরসাথে সম্পর্কের অবনতি চাচ্ছিলাম না। না চাচ্ছিলাম তার সাথে কোন তর্ক করতে- আর তর্ক করলে সম্পর্কের অবনতি ছাড়া কোন লাভ হতো না- তাই বললাম- আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং সেই সব মুনাফেক, দ্বীনের দুশমনের উপর গজব পড়ুক যারা ইসলাম ও মুসলমানদের মুলোৎপাটনের জন্য সদাব্যাস্ত- বলেই চুপ করে গেলাম। তার পর সেই উমরার সময় বা যখনই খোদার ঘরের তাওয়াফে গিয়েছি তখন কেঁদে কেঁদে শুধু আল্লাহর কাছে সব শক্তি দিয়ে মিনতি করেছি, হে আল্লাহ! আমার চোখ খুলে দাও, সত্য ও সঠিকের প্রতি আমাকে হেদায়াত কর, মাকামে ইব্রাহীমে দাড়িয়ে আমি "কোরআনের এই

আয়াত পড়েছি"। এবং *জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দীনের আহকামের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন রকম কঠোরতা আরোপ করেননি, তোমাদের প্রপিতা ইব্রাহীমের মাযহাবকে তোমাদের মাযহাব বানিয়ে ছিলেন তোমাদেরকে প্রথম থেকেই মুসলমান (বাধ্যগত বান্দা) নাম রাখলেন আর রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরা জগগণের জন্য সাক্ষী হও, এবং তোমরা নামাজ পড়তে থাক, জাকাত দিতে থাক, আর খোদাকেই শক্তভাবে ধর, তিনি তোমাদের কতই না উত্তম পথপ্রদর্শক এবং উত্তম সাহায্যকারী।*– হাজ–আয়াত–৭৮)।"

আর আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে মোনাজাত করতে লাগলাম, "হে আমাদের পিতা, হে সেই মহান ব্যক্তি যে আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে নামকরণ করেছেন, দেখ, তোমার অবর্তমানে তোমার সন্তানদের মধ্যে কত ফেরকা হয়ে গেছে? কেও ইহুদী, কেও নাসারা, কেউ মুসলমান, আবার ইহুদীদের ৭১ ফেরকা– নাসারীদের ৭২ ফেরকা আর মুসলমানরা ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তোমার সন্তান মুহাম্মদের (সাঃ) মতে সবই বাতিল শুধু একদল তোমার সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত তারা কারা......?

এই বিভক্তি কি খোদায়ী নিয়ম, যা খোদা তার বান্দাদের মধ্যে অব্যাহত রেখেছেন? যেমন কাদেরীয়ারা বলে, খোদাই তার বান্দার জন্য নির্ধারণ করে দেয় যে কে মুসলমান হবে, বা অগ্নিপুজক হবে, না মুশরেক হবে, না ইহুদী হবে ,না নাসারা হবে। এই বিভক্তি দুনিয়ার প্রতিপত্তি ও লোভের পরিনতি। তারা খোদাকে যখন ভুলে যায় তখন খোদাও তার বান্দাকে ভুলে যায়। আমার জ্ঞান, চিন্তা শক্তি এটা কোনভাবেই মানতে চায়না যে আল্লাহ্ নিজে এই ফের্কা বাজি তৈরী করার সুযোগ দিয়েছেন। বরং আমার বিশ্বাস বলে, খোদা তাঁর বান্দাকে সৃষ্টি করে, হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন, ভালমন্দের পার্থক্য বুঝিয়েছেন, অতঃপর নবী রাসুল পাঠিয়ে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন এবং যে সব আমাদের জন্য কঠিন ছিল বুঝায়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সত্য মিথ্যের পৃথকীকরণ বলে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে এই দুনিয়ার জীবন ও তার প্রতি লোভ, তার দম্ভ ও বেপরোয়া, তাদের মুর্খতা, অসততা তাদের সীমালংঘন ও অবাধ্যতা,

জুলুম ও অন্যায় লালসায় সত্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, শয়তান তাদের অনুসারী করে রহমত থেকে দূরে নিয়ে গেছে। তাদের কে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, এ কথাগুলোই আল্লাহ খুবই প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন-

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর জুলম করেন না, মানুষ নিজেরই নিজের সত্তার উপর জুলুম করছে (সুরা ইউনুস .৪৪।"

হে পিতা ইব্রাহিম, ইহুদী নাসারারা যারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতার কারণে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সত্যের বিরোধীতা করেছে, তারা বেশী শাস্তির যোগ্য নয়, তাদের চেয়ে যে উম্মতে মুসলেমাকে তোমার পুত্র মোহাম্মদ (সাঃ) অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন, যাদেরকে সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, অথচ এই উম্মতরাই শক্ত মতপার্থক্যে নিমজ্জিত। একে অপরকে কাফের বলছে। অথচ রাসুল (সাঃ) প্রথমেই এই আশংঙ্কায় হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন- "কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তিন দিনের বেশী তার অপর মুসলমান ভাইকে পরিত্যাগ করবে।" আর এখন এই উম্মতের কি হলো যে যাদের ভিতর ফাটল ধরে গেল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল দলের গাথুনি। যারা ছোট ছোট প্রশাসনে বিভক্ত হয়ে একে অপরের শত্রু হয়ে একজন অন্যের মাথা চায়, একজন অন্যকে কাফের বলে। অবস্থা এমন যে একজন আরেক জনের খোঁজও নেয় না। আজীবন পৃথক থেকে যায়। হে পিতা ইব্রাহিম- এই উম্মতের কি হয়ে গেল, যে তারা ছিল উম্মতদের মধ্যে সর্বোত্তম, পূর্ব পশ্চিম তাদের করতলে ছিল, যারা সারা বিশ্বকে আলোদান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি কালচারে অলংকৃত করেছে আর আজ তারাই সবচেয়ে অধঃপতিত, নিগৃহিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের স্বভূমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে, নিজের স্বাধীন দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মসজিদে আকসা ইহুদীদের দখলে, তারা তা স্বাধীনও করতে পারছে না। আজ আপনি মুসলমানদের আবাস শহরগুলোকে যদি দেখেন, দেখবেন সব জায়গাই ভূখানাঙ্গাদের ভীড়, দরিদ্রতার সর্বগ্রাসী ছোবল, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ, রোগ ব্যধিতে জীর্ণ শীর্ন মানবতার কঙ্কাল, অধপতিত নৈতিকতা, নির্যাতন, নিপিড়ন, পুতিগন্ধময় পরিবেশ। ইউরোপ, আমেরিকা ও আমাদের মধ্যে কত পার্থক্য। ইউরোপের সামান্য একটা

টয়লেটের ভিতরটা যে ধরণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুশবুদার- আমাদের সমাজের সর্বোত্তম মানুষটিও সেরকম না। আমরা সেই জাতি ইসলাম যাদের বলেছে-পবিত্রতা ঈমানের অংশ, পুতিগন্ধময়তা, শয়তানির অংশ। তাহলে ঈমান কি ইউরোপে আর শয়তান আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে গেছে? শেষ কথা- মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস প্রকাশে কেন ভয় পায়? কারণ হলো নিজ দেশেই তারা তা প্রকাশ করতে পারে না, নিজেদের উপরই মুসলমানদের অধিকার নাই, চেহারার উপর অধিকার নাই, তারা দাঁড়ি পর্যন্ত রাখতে চায় না। ইসলামী পোষাক পরতে পারে না। কিন্তু মদ খেতে পারে, ব্যাভিচার করতে পারে, উলঙ্গতাকে প্রগতিশীল মনে করে ইজ্জত দেয়- তা প্রতিরোধ করতে পারে না। ভাল কাজের আদেশ, মন্দের নিষেধ করতে পারে না। আমাকে অনেকে এমন পর্যন্ত বলেছে কতিপয় ইসলামী দেশে যেমন মিশর ও পশ্চিমের কিছু দেশে দরিদ্রতার কারণে বাপ নিজের মেয়েকে দিয়ে ব্যাভিচারী করতে বাধ্য করে। লাহাওলা ওয়ালাকুয়াতা!

হে খোদা, তুমি এই উম্মত থেকে কেন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছো? কেন তুমি এই উম্মতকে আঘাত দিতে দিতে অন্ধকারের দিকে ছুড়েছ? কিছুতেই হতে পারে না আমি তোমার সত্তার ক্ষমা প্রার্থী, তোমার দরবারে তওবা করছি। তুমি নও, তুমার উম্মতই তোমার থেকে দূরে সরে গেছে শয়তানের পথ অবলম্বন করেছে। তুমিত তোমার কিতাবে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছো এবং *"যে ব্যক্তি খোদার স্মরণে বিমুখ হয়ে যায় আমি স্বয়ং নিজেই তার জন্য একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেই এবং সেই তার প্রতি কাজেরই সঙ্গী হয়।* সূরা-আরাফ-৩৬।

এতে কোন সন্দেহ নেই, উম্মতে মুসলেমার দুঃখ, কষ্ট, অপদস্ততা, দরিদ্রতা চরমে পৌঁছে গেছে। এটা সেই কথারই প্রমাণ করে, যে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, মাত্র কিছু সংখ্যক লোক বা একটি মাত্র দল গোটা উম্মতের ভাগ্য ফিরাতে পারে না। রাসুলে খোদা (সাঃ) প্রথমেই বলেছেন, তোমরা ভালোর আদেশ মন্দের নিষেধ করতে থাকো তা না হলে খোদা দুষ্ট লোকদের তোমাদের নেতা বানিয়ে দিবেন। ভাললোকদের ডাকে কেউ সাড়া দিবে না।

বন্ধু বশিরের চিঠি এবং তার আত্মীয়ের ঠিকানা নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে বেরুলাম, যাতে যতক্ষণ মদীনায় থাকবো বশিরের আত্মীয়ের বাসায়ই থাকবো। রওনা হওয়ার পূর্বে বশির টেলিফোনে কথাও বলে দিয়েছে। মদীনা পৌঁছতেই আমার মেজবান সর্ম্বধণা জানিয়ে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন– লাগেজ পত্র রাখার পর সর্ব প্রথম হুজুর (সাঃ) এর দরবারে হাজিরা দিলাম।

রওজা মোবারকে যাওয়ার আগে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম, খুশবো লাগালাম। অতঃপর গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিলাম তবে হজ্জের মওসুমের তুলনায় তখন লোকের ভীড় কম ছিল। যে জন্যে খুবই আরামের সাথে রসুলাল্লাহ (সাঃ), আবু বকর, ওমরের মাজারের সামনে দাড়াতে পারলাম। হজ্জের সময় ভিড়ের কারণে তা পারতাম না। এমনি এমনি আমি শুধু বরকতের জন্য দেয়ালে চুমা দিতে চাইলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত সিপাইরা আমাকে জোরে ধমক দিল। আর দোয়া ও সালাম দানের জন্য কবরের পাশে আমার যখন একটু দেরী হল, সিপাইরা বললো "তাড়াতাড়ি স্থান ছেড়ে দাও"। তখন আমি চাইলাম তাদের কারুরও সাথে কথা বলবো কিন্তু নিস্ফল প্রচেষ্টা।

আমি সেখান থেকে ফিরে পবিত্র রওযার সেই স্থানে এসে বসলাম, যেখানে কোরআন পড়া হতো, আর খুব মধুর স্বরে কোরআন পড়ছি। আমি বার বার পড়ছিলাম, মনে হচ্ছিল যে হুজুরকে কোরআন পাঠ শুনাচ্ছি। পড়তে পড়তে ভাবলাম অন্য সবার মতও কি হুজুর (সাঃ) মরে গেছেন? যদি তাই হয় তাহলে নামাজে কেন সম্বোধন করি– "হে নবী আপনার উপর খোদার সালাম এবং তাহার রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক"।

তাছাড়া আমরা যখন সমস্ত মুসলমানরা মনে করি খিযির (আঃ) জীবিত, এবং সালামকারীদের সালামের উত্তর দেন। সুফি বিদ্যায় বিশ্বাসী আমাদের সাইয়্যেদ তিজানী, আঃ কাদের জিলানী তারাও সময় সময় হাজির হন (অনেকের ধারণা) তাহলে নবী (সাঃ) কেন এ ধরণের মোজেজার অধিকারী হবেন না? পরে অবশ্য আমি সান্তনা পাই এ ভেবে যে, হুজুর (সাঃ) অন্য সবের মতই মারা গেছেন এ আকিদা শুধু ওয়াহাবীদের, সমগ্র মুসলিম জাতির নয়।

একবার আমি জান্নাতুল বাকীর জিয়ারাতে গেলাম সেখানে দাড়িয়ে আছলে বায়তগণের রুহের উপর দোয়া-ই-রেসানী করছি। আমার পাশেই একজন বৃদ্ধ লোক খুবই লাচার হয়ে কাঁদছিলেন। আমি বুঝলাম সে শিয়া, পরে লোকটি দুই রাকাত নামাজে দাঁড়াল। যেই সে সেজদায় গেছে দেখলাম একজন সিপাই দৌড়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে লোকটির গতিবিধি লক্ষ্য করছে। অতঃপর এত জোরে লাথি দিয়েছে যে বৃদ্ধ উল্টে গেছে। এবং কয়েক মিনিট অজ্ঞানের মত পড়ে রইল। আর সিপাই তাকে কিল, গুষি, লাথি মারতে মারতে এক কোনায় নিয়ে গেল এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগলো। এটা দেখে আমি ঠিক থাকতে পারিনি, আমার মনে হলো, বৃদ্ধ হয়ত মরেই গেছে, তাই- সৈনিকটিকে বললাম-"আরে তাকে মারছো কেন সেতো নামাজ পড়ছিল। তুমি তাকে মেরে হারামী কাজ কেন করছো?" তখন সৈনিকটি আমার দিকে চোখ উল্টে ধমক দিয়ে বলল "ভাগ- তা না হলে তোমার অবস্থাও তার মতই হবে"। আমি দূরে সরে গেলাম, তবে মন খুব খারাপ লাগছিল, লোকটিকে একটু সহযোগিতাও করতে পারলাম না। কেউ বলছে- আহা ! কি ভাবেই না মারলো আবার কেউ বলছে ঠিক করেছে, কবরের কাছে নামাজ পড়তে গেল কেন? যেখানে নামাজ পড়া হারাম? তখন আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। বললাম কে বলেছে কবরের কাছে নামাজ পড়া বৈধ নয়। বললো হুজুর (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তখন গর্জে বললাম "তোমরা শেষ পর্যন্ত রাসুলকেও কোন যাচাই বাছাই না করে এলজাম লাগাচ্ছ"? কিন্তু কথাগুলো বলে আমি ভয়ও পেলাম, কারণ আমার এই কথাবার্তা শুনে পাশের সিপাই না চলে আসে বা কেউ তাকে ডাক দেয়, তাই আস্তে করে বললাম-যদি হুজুর (সাঃ) নিষেধই করতেন তাহলে লক্ষ কোটি জনতা এটা করে কেন? কেন হাজী ও যিয়ারতকারীগণ এই হারাম কার্যটিই করতে চায়? কেন রসুল (সাঃ), আবু বকর, ওমরের কবরের পাশে মসজিদে নব্বীতে নামাজ পড়া হয়? যদিও মেনে নেয়া হয় যে বিষয়টি হারাম তাহলেও কি এত শক্ত করে মেরে তাকে নিষেধ করতে হবে? ভাল করে বুঝাইলেই হতো। একটা ঘটনা মনে পড়লো- "একদা মসজিদে নববীতে কিছু সাহাবী নিয়ে হুজুর (সাঃ) বসে ছিলেন, সাহাবী ও হুজুর (সাঃ) এর উপস্থিতিতেই লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এক গেয়ো নবীর সম্মুখে পেশাব করে দেয়। সাহাবাগণ কোষ মুক্ত তরবারী নিয়ে

দাড়িয়ে গেল তাকে মারার জন্য"। হুজুর নিষেধ করে বললেন- "বুঝেনি তাই তাকে ছেড়ে দাও আর একবালতি পানি ঢেলে যায়গাটি পরিষ্কার করে দাও। আর জেনে রাখ তোমাদেরকে রুঢ়তার জন্য নয় বরং আসানীর জন্য তৈয়ার করা হয়েছে। যাতে মানুষ তোমাদের উপর খুশী থাকে- শত্রুতা সৃষ্টি না হয়"।

সাহাবহীগণ হুজুরের নির্দেশ পালন করলেন। আর আল্লাহর রাসুল সেই বৃদ্ধকে ডেকে কাছে বসালেন, খুব আদর যত্নসহকারে তার সাথে কথা বললেন-তাকে বুঝালেন যে এটা আল্লাহর ঘর, এটা অপবিত্র করা যায় না। হুজুর (সাঃ) এর এই মহানুভবতায় আরবী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং মসজিদে সে পাক পবিত্র পোষাক পরে আসতে থাকে। আল্লাহ তার রাসুলকে বলেন *"যদি তুমি কঠোর ও কঠিন হৃদয় হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে যেত"* - সূরা আলে ইমরান ১৫৯।

ঘটনা শুনে দর্শক অনেকেই খুব প্রভাবিত হলো এবং একজন আমাকে আড়ালে নিয়ে প্রশ্ন করলো- "ভাই আপনি কোথাকার বাসিন্দা?" বললাম- "তিউনিসিয়ার।" সে আমাকে সালাম দিয়ে বললো ভাই নিজের জীবন বাঁচাও।, এখানে এ ধরণের কথাবার্তা কখনই বলো না। তুমি এসব বলে তোমার সম্পর্কে তাদের মনে শত্রুতার সৃষ্টি করে ফেলেছ। এরা হারামাইনের খাদেম বলে আজ হাজীদের উপর এধরণের অমানবিক অত্যাচার করে।"

আমি আমার নতুন বন্ধুর ঘরে আসলাম। যার নামটিও এখন পর্যন্ত জানা হয়নি। রাতের খাবার একসাথে খাচ্ছি তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো- "কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?" আমি সব ঘটনা তার কাছে বললাম, আর বললাম, "আজকের এই ঘটনায় আমি ওয়াহাবীদের প্রতি বিরূপ হয়ে শিয়াদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছি।" একথা শুনে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং আমাকে বললেন- "খবরদার এ ধরণের কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না।" কথা বলেই সে আমাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আমি অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত শুয়ে পড়লাম। মসজিদে নববীর ফজরের আজানে জাগ্রত হয়ে দেখলাম খাবার সেই সন্ধের বেলার মতই পড়ে আছে। তাতে বুঝলাম আমার মেজবানও আর ফিরে আসেনি। আমার ভিতরে সন্দেহ ও ভয় ঢুকে গেল যে সে আবার সি, আই, ডি, এর লোক না হয়। আমি ঝটপট উঠে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাসা ছেড়ে বাইরে আসলাম। সারা দিন মসজিদে নববীর

কাছেই কাটালাম। যেয়ারত করলাম, নামাজ পড়লাম শুধু প্রশ্রাব-পায়খানা আর অজুর জন্য বাইরে আসতাম। আসরের পর শুনলাম, একজন খতিব নামাজিদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করছেন।

আমিও সেখানে গেলাম। উপস্থিত অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম- সে মদীনার প্রধান বিচারপতি, আমি খুব মনযোগ সহকারে শুনলাম, সে বিভিন্ন আয়াতের তাফসির করছেন। দরস শেষ করে সে যখন যেতে উদ্বত হলো, পথ আগলে আমি প্রশ্ন করলাম- "হুজুর আয়াতে-তাতহীর ৩৩ঃ৩৩ দ্বারা কাদের বুঝান হয়েছে? কোরআনের এই আয়াতে আহলে বায়েত বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে"? সে সোজা বলল 'আজওয়াজে মুতাহ্হারাত' যাদের উল্লেখ আয়াতের প্রথমেই আছে। আমি বললাম শিয়ারাতো এ দ্বারা পাক পাঞ্জাতন বুঝায়। মূলতঃ আমি তার কথার প্রতিবাদ করলাম, বললাম আয়াতের শুরুটা নবী (সাঃ) এর বিবিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের উদ্দেশ্য আজওয়াজ ছিল ততক্ষণ স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে, আর যখনই স্ত্রীদের প্রসঙ্গ শেষ হয় তখনই লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে পুংলিঙ্গ হয় এবং আহ্লে বায়াতের বর্ণনা শুরু হয়। আমার কথা শুনে তিনি চশমাটা নাড়াচাড়া দিয়ে বললেন-"সাবধান, বিষাক্ত চিন্তাভাবনা থেকে হুশিয়ার হয়ে যাও। শিয়ারা আল্লাহর কালামকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে। হযরত আলী (রাঃ) ও তার আহলে বায়তের ব্যাপারে এমন সব অলীক আয়াত ও ব্যাখ্যা তাদের কাছে আছে যা আমরা জানি না। তাদের কাছে কোরআনের বিশেষ সংকলন আছে, যাকে তারা 'মসহাফে ফাতেমী' বলে অতএব তাদের ছোবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে।

আমি বললাম - "মুহতারাম- সে ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন না। তাদের অনেক কিছু আমার জানা আছে, কিন্তু আমিতো প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই"। বিচারপতি বললেন- "তুমি কোথাকার বাসিন্দা হে"? বললাম- "তিউনিসিয়ার"। "তোমার নাম কি"? বললাম- "আল্ তিজানী"। কাজী গর্বের হাসি হেসে বললেন- "তুমি কি জান, আহমদ তিজানী কে ছিলেন"? বললাম "তিনি একজন পীর ছিলেন"। তিনি বললেন- "সে একজন ফরাসী সরকারের এজেন্ট ছিল। তিউনিস এবং আলজিরিয়ায় তার জন্যই শুধু ফরাসীদের অবস্থা সুদৃঢ় হয়। যদি কখনও তুমি প্যারিস যাও এবং সেখানে ধর্মীয় লাইব্রেরীতে যাও তাহলে সেখানে কামুস ফ্রান্সিকে তুমি নিজে পড়বে। সেখানে নিজে দেখতে পারবে যে লিজিওন ডি অর্ডার' পুরস্কার আহমদ তিজানীকে দেওয়া হয়েছিল যা ফরাসীদের খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ"।

আর সেই সেবাটা এমনি ছিল, যা কল্পনা করতেও খারাপ লাগে। আমি বিচারপতির কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সে যাই হউক শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তার কাছ থেকে চলে আসলাম।

মদীনায় এক সপ্তাহ ছিলাম যাতে চল্লিশ রাকাত নামাজ মসজিদে নববীতে পড়তে পারি ও যিয়ারাতগুলো শেষ করতে পারি। সেখানে খুবই সাবধানে কাজ করতে হয়েছে। ফলাফল এই হলো যে ওয়াহাবীদের উপর বিরাগ বেড়ে গেল।

মদীনার কাজ শেষে জর্ডানে পৌছলাম। আমার সেই বন্ধুর সাথে দেখা করলাম যার জন্য হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

তাদের সেখানে তিনদিন ছিলাম। তারাও আমাদের চেয়ে বেশী শত্রুতা রাখে শিয়াদের সাথে। সেই একি কথা একই প্রপাগান্ডা যা তিউনিসিয়ায় শুনেছিলাম। সবাই শুনে শুনে বলেছে, বললো-প্রামান্য দলিল উপস্থাপন কেও করতে পারলো না। যখন তাদের প্রশ্ন করলাম "শিয়াদের প্রতি তোমাদের এই দুশমনির কারণ কি"? অথচ তাঁরা শিয়াদের কোন গ্রন্থও পড়ে নি কোন শিয়ার সাথে তাদের না দেখা হয়েছে জীবনে?

জর্ডান থেকে সিরিয়া পৌছলাম। দামেস্কে উমাইয়া মসজিদ দেখলাম যার পাশেই ইমাম হুসাইন (আঃ) এর মাজার, তা যিয়ারত করলাম। সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী ও জয়নাব (আঃ) এর মাজার যিয়ারাতের সৌভাগ্যও হলো। অতঃপর সেখান থেকে বৈরুত হয়ে সোজা রওয়ানা দিলাম ত্রিপলীর দিকে। সামুদ্রিক সফর তিন/চার দিন, একাধারে সমুদ্রে থেকে মন মানসিকতা কিছুটা বিশ্রাম নিল। সামুদ্রিক পথে চলছি আর মনের আয়নায় পুরা সফরের কল্পনার ছবি আসছে যাচ্ছে। যতই চিন্তা করছি ততই শিয়াদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর বিদ্বেষপূর্ণ ওয়াহাবীদের প্রতি ক্ষোভ মনের দূরত্ব বাড়ছে। খোদার প্রতি লাখো শুকরিয়া যে তিনি সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের তৌফিক আমাকে দিয়েছেন।

দেশে আসলাম, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে, পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেশার একটা প্রেরণা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ঘরে পৌছেই বুঝলাম- আমার অনুপস্থিতিতে ঘরে অনেক কিতাব এসে গেছে, বুঝলাম কোত্থেকে এসেছে, বান্ডেলগুলো খুললাম পুরা ঘর কিতাবে ভরে গেল। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম, যারা ওয়াদা খেলাপ না করে যথার্থভবে কিতাবগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

গবেষণার সূচনা

আমার খুশির শেষ নেই- আমার ঘরের একটা কামরাকে কুতুবখানা নাম দিলাম। আর নিয়ুমানুসারে সকল কিতাবগুলো সাজিয়ে রাখলাম।

কয়েক দিন ভাল করে বিশ্রাম নিয়ে লেখাপড়ার জন্য পুরা বৎসরের রুটিং ঠিক করলাম। সপ্তাহে তিন দিন একনাগারে পড়া আর চার দিন আরাম করার জন্য রাখলাম।

অতঃপর কিতাবগুলো অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলাম। তাই "আকাইদে ইমামীয়া' শিয়ার উৎপত্তি ও মূলনীতি পড়ার পর আমার অন্তরাত্মা প্রশান্তি পেল, কেন না আমার ভিতরটা সেই বিশ্বাসগুলোই পছন্দ করেছিল যা শিয়াদের বিশ্বাস ছিল। তার পর সাইয়্যেদ শরফুদ্দিন আল মুসাবীর গ্রন্থ 'আলমুরাজেয়াত' পড়লাম, সবে মাত্র কিছুটা পড়েছি তখন অবস্থাটা এমন হলো যে খুব অসুবিধা ছাড়া বই ছেড়ে উঠতে পারতাম না। মাঝে মাঝে কলেজেও বই সাথে করে নিয়ে যেতাম। আর সুন্নি আলেমদের প্রতিটি কথা শিয়া আলেমরা এমনভাবে সুন্দর যুক্তি দিয়ে খন্ডন করতেন যাহা আমাকে আশ্চর্য করে দিত। এই বই আমার মনের আকাঙ্খানুযায়ী পেয়ে গেলাম কারণ 'মুরাজায়াত' কোন সাধারণ গ্রন্থ নয় বরং তা খুবই উচ্চাঙ্গের এবং দুজন বড় শিয়া-সুন্নি আলেমের কথোপকথন নিয়ে লেখা। চিঠি পত্রের আকারে লিখিত। এতে উভয়ের খুব ছোট থেকে বড় সব বিষয়েরই অবতারনা করেছেন। আর তর্কের পুরা বিষয়বস্তু ছিল দুটি মাজহাবের মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ গোটা কোরান ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে এই আলোচনা চলে এসেছে। এ বইটা (মানজিল মাকসুদে) গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গ্রন্থটি খুবই উপকারী, আমার জন্য তা বড় ধরনের অনুগ্রহ।

এই কিতাব পড়তে পড়তে যখন সেই পর্যন্ত গেলাম যেখানে কতিপয় সাহাবা নবী (সাঃ) এর অনেক হুকুম পালন করতে অস্বীকার করেছেন, তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। লেখক উদাহরণ টেনে বলেন-তার একটিতো বৃহস্পতিবার দিনের ঘটনা যাকে 'কেরতাসের' ঘটনা বলে। কারণ আমার তো বুঝেই আসে না যে হযরত উমর ফারুক রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশের উপর আপত্তি তুলতে পারেন। এবং হুজুরকে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রলাপ উক্তি করার মত কথা বলতে পারেন। প্রথমেত আমার মনে হয়েছে এটা শিয়াদের বর্ণনা, যখন দেখলাম যে এটা "সহীহ মুসলিম"- "সহী বুখারীর" রাওয়ায়েত তখন আমার আশ্চর্যের শেষ রইল না। মনে মনে বললাম রাওয়ায়েত যদি সত্যিই "বুখারির" হয়ে থাকে তাহলে আমার সিদ্ধান্তে আসার মত উপকরণ হলো।

আমি সোজা তিউনিস শহরে গেলাম, সেখান থেকে বুখারী, মুসলীম, মসনাদে আহমদ, মুয়াত্তা মালিক, তিরমিজী সহ অনেক বড় বড় গ্রন্থ কিনে আনলাম।

আমি ঘরে আসারও অপেক্ষা করি নাই, পথেই লেগে গেলাম বই দেখতে, তিউনিস থেকে আমার নিজ শহর "কাফসা' পর্যন্ত পুরা রাস্তাটাই "বুখারী" উল্টে পাল্টে 'হাদীসে-ই-কিরতাস' খুঁজেছি। যদিও মনে মনে চাচ্ছিলাম হাদীসটা যেন না পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় পেয়ে গেলাম। হাদীসটা কয়েকবার পড়লাম শরফুদ্দিন সাহেব যে ভাবে লিখেছেন সে ভাবেই আছে। একবার আমার মনে হলো, গোটা বিষয়টাই বানান, হয়রত উমর ফারুক কি করে এমন কথা বলতে পারেন কিন্তু আমি নিরুপায়, 'বুখারী-মুসলীম' এর রাওয়ায়েতকে অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বুখারীর' হাদীসকে মিথ্যে মনে করার অর্থ গোটা সত্যায়িত বিশ্বাসকেই অস্বীকার করা।

যদি হাদীসটি শুধু শিয়া গ্রন্থে সংকলিত থাকতো, তা হলে উমরের ব্যাপারে এই হাদীসটি আমি কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এটা আহলে সুন্নাতের সিহা সিত্তা থেকে

সংগৃহীত। যা অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। কারণ আমাদের কাছে এটা সর্বসম্মত বিশ্বাস যে কিতাবুল্লাহের পর, এক মাত্র 'বুখারী' সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ। এটাকে কিছু মান্‌ব কিছু মান্‌ব না, তা কি করে হয়। সিহা সিত্তার হাদীসগুলো সব মুসলমানকে মানতে হবে। কেননা কোরানের হুকুমগুলো সামগ্রীকভাবে সংক্ষিপ্ত, এর যথাযথ ব্যাখ্যা হাদীসে আর হাদীস হল 'বোখারী'।

'বোখারী'কে অস্বীকার না করার আরেকটি কারণ হলো- আমরা রেসালাতের যুগের অনেক পরে এসেছি। দ্বীনি হুকুম আহকাম বাপ-দাদা থেকে যা আমাদের কাছে এসেছে সবই এই শিক্ষা ও সত্তার বদৌলতে। তাই এই কিতাবগুলো ছাড়াও যায় না আবার মিথ্যা মনে করাও যায় না। এই স্পর্শকাতর অধ্যায়ের গবেষণার পূর্বেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এত জটিল বিষয়ে আমি শিয়াদের একক কোন রাওয়ায়েত গ্রহণ করবো না, বরং শিয়া সুন্নী বিশেষ করে সিহা সিত্তার কথাগুলোকেই গুরুত্ব দেব। এবং যৌক্তিক বিষয়গুলোকে অনুসরণ করে- আবেগ সম্পৃক্ত উদ্বৃতিগুলো উপেক্ষা করবো। গোত্রীয়, বংশীয়, জাতীয় ও মাজহাবী দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে দূরে থাকবো। ঠিক তেমনি সন্দেহমূলক কোন কিছুর ধারে কাছে যাব না যাতে সঠিক পথ আমি পেতে পারি।

বিশদ অধ্যয়নের সূচনা, নবীর সাহাবীদেরকে শিয়ারা ও সুন্নীরা যে যেভাবে দেখেছে

আমার মতে সকল বিষয়ের মধ্যে সবচে' মূল বিষয় হচ্ছে সাহাবাদের জীবনী, বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ের উপর যাহা মানুষকে সত্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। কেননা ধর্মের প্রতিটি বিষয়ের এনারাই (সাহাবাগন) স্তম্ভ। এঁদের কাছ থেকেই আমরা ধর্মের দীক্ষা নিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে আমরা দ্বীনের মূলনীতি পেয়েছি, বিভ্রান্তি ও অন্ধকারের অতলান্ত থেকে আমরা খোদা প্রদত্ত নূরের আলোকচ্ছটা তাদের কাছ থেকেই পেতে পারি যা দিয়ে আল্লাহর বিধি বিধান স্বচ্ছভাবে দেখি। বড় বড় আলেমগণ তাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। এরই উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু গ্রন্থ তারা রচনা করেছেন। যেমন- "উস্‌দ আল গাবা ফি তামিজ আল্ সাহাবা" এবং "মিজান আল্ ইতিদাল" এবং এ রকম আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যে গুলোতে সাহাবাদের বিশ্বাস, জীবন চরিত্র ও কর্ম পদ্ধতিকে কতই না সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এ সব আহলে সুন্নাতের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে লিখিত।

তাই এগুলোতে এই প্রশ্ন করা যায় যে, প্রাথমিক যুগের আলেমগণ আহলে বায়তের সাথে শত্রুতাপোষণ কারী আব্বাসী ও উমাইয়া বংশের খলিফাদের নেক নজরের ভিত্তিতে শুধু ইতিহাসই লেখেননি, অন্যান্য গ্রন্থও লিখেছে। তাই তাদের লিখনিগুলোকে বিনা বাছ বিচারে গ্রহণ কতটুকু বাঞ্চনীয়? আবার আহলে বায়েতের সপক্ষে যে লেখনী রয়েছে তাকেও অগ্রাহ্য করা যায় কোন বিচারে যাদের আহলে বায়তের সাথে সম্পর্কের কারণে হত্যা করা হয়, দেশান্তরিত করা হয়, নির্যাতনের ষ্টীমরুলার চালিয়ে দেওয়া হয়, তাদের জীবনকে ধ্বংস করা হয়- তাই এই জালেম ও স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের হোতা এই সব আলেমগণই ছিলেন।

এসব কিছুর গোড়ায় হল 'সাহাবা'। কারণ তারাই, হুজুর (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত বিভ্রান্তি থেকে উম্মতকে বাচাতে যে অসিয়াৎ লিখতে চেয়েছিলেন, এর প্রতিবাদ করেন। তারাই উম্মতে ইসলামকে ফজিলত থেকে বঞ্চিত করে গুমারাহীর দিকে নিয়ে যায়, সে জন্যে আজ উম্মত শতদা বিভক্ত। মত পার্থক্যের গহবরে নিমজ্জিত। উম্মতগণের ঐক্যের ভিত দুর্বল হয়ে গেছে। ইসলামের উজ্জ্বলতা পার্থক্যের চোরা বালিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারাই খিলাফতের ব্যাপারে অদুরদর্শী ফায়সালা করতে গিয়ে কিছু লোককে হুকুমত পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগীতা করেন। ফলে কিছু লোক পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। ফলে একদল হযরত আলীর অনুসারী অন্য দল মায়াবিয়ার অনুসারী হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরাই তারা, যারা আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে রাসুলের তাফসিরে এখতেলাফ সৃষ্টি করে দেয়, ফলে উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, বিভিন্ন চিন্তার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হয়। যার সবগুলোই রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতা আগলে রাখার মানসিকতায় হয়।

যদি তারা সাহাবী না হতেন তাহলে তাদের কৃত অবস্থার ফল উম্মতভোগ করতো না, বিভক্ত হতো না। কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না। অথচ সকলের খোদা একজন, কোরআন একটি, রাসুল এক, কেবলা সবই ঠিক ঠিক মিল আছে কিন্তু হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যুর পর সর্ব প্রথম-বিভক্তিটা শুরু হয় 'সকিফা-ই-বনি সায়দায়'। যা আজও অব্যাহত আছে। হয়ত অব্যহত থাকবে। আমি শিয়া আলেমদের সাথে আলোচনা করে যা পেলাম তাহলো তাঁরা সাহাবাদেরকে তিন গ্রুপে বিভক্ত করেছে।

এক। সেই সব বুজুর্গ সাহাবী, যাঁরা আল্লাহ ও রাসুলকে সত্য ও সঠিকভাবে জেনেছেন, আনুগত্য নিষ্ঠার সহিত করেছেন, তাদেরকে চিনে নেন, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীর প্রতি ভালবাসাকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। কথায় ও কাজে রাসুল (সাঃ) এর প্রকৃত সাহাবী ছিলেন। রাসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁরা পরিবর্তিত হননি। বরং তাঁদের প্রতিজ্ঞায় তাঁরা অটল ছিলেন। আর তাঁরাই সেই সব সাহাবী যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরানে প্রশংসা করেছেন, সম্মানিত

করেছেন। রাসুল (সাঃ)ও বভিন্ন স্থানে তাঁদের উক্ত মর্যাদার কথা বলেছেন। শিয়ারা তাঁদের কথা খুবই সম্মান ও ইজ্জতের সাথে বলে থাকে। যেমন আহলে সুন্নাত ওয়ালারাও তাঁদের সম্মান করে (রাঃ) বলে থাকে। শিয়ারাও তাই বলে।

দুই। সেই সব সাহাবী যারা ইসলাম গ্রহণ করে, রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্যও করে, কোথাও ভয়ের আবার কখনও আবেগে। তারা হুজুর (সাঃ) এর সাথে মুসাহেবী করে বলতো- "আমরা ঈমান এনেছি", আবার কখনও তাঁকে কষ্টও দিত। হুজুর (সাঃ) এর আদেশ নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করতো না। বরং সুস্পষ্টও অকাট্য প্রমান থাকা সত্ত্বেও নিজের মতকে গুরুত্ব দিতেন। কখনো কোরআন তাদের এহেন কর্মের ব্যাপারে হুশিয়ারীও ধমকীও দিয়েছে। হুজুর (সাঃ) অনেক সময় তাদেরকে শাসিয়েছেন। এই প্রকার সাহাবীদের নাম শিয়ারা শুধু মাত্র তাদের হাদীস ও কর্মের বর্ণনার সময় নেয় কিন্তু সম্মানের সাথে নেয় না।

তিন। সেই সব মুনাফেক যারা হুজুরের (সাঃ) সাথে শুধু অনিষ্ট করার জন্যই থাকতো। প্রকাশ্যে মুসলমান ছিল কিন্তু আসলে ছিল কাফের। ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই শুধু তারা রাসুলের সঙ্গে থাকতো গোটা সুরা 'মুনাফেকুন' তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। কোরআনের অনেক জায়গায় তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহতম স্থানে রাখা হবে। হুজুর (সাঃ) তাদেরকে বহু নসিহত করেছেন। রাসুল (সাঃ) ও সেই মুনাফেকদের থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। অনেক সাহাবাকে এই মুনাফেকদের নাম, আচরণ ও তাদের আলামতও বলে দিয়েছেন। শিয়া সুন্নি উভয় গ্রুপই এই প্রকার সাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, অভিসম্পাত করে।

এই তিন প্রকার ছাড়াও আরও এক প্রকার আছে। যদিও তাঁরা সাহাবী কিন্তু তাঁরা রাসুল (সাঃ) এর নিকটতম, মানসিক ও চারিত্রিক উভয় দিক দিয়ে আত্মীয়। আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর দেয়া বিশেষত্বের কারণে তাঁরা সকলের উর্দ্ধে। তাঁদের সমকক্ষ কেউ নয়। তাঁদের স্তরে কারও পৌঁছা সম্ভব নয় এবং তাঁরাই আহলে বায়েত। আহলে বায়তকেই আল্লাহ অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখেছেন যা সুরা আহযাব তেত্রিশ নং আয়াতে বলা হয়েছে। তাঁদের উপর দরুদ পড়া

এতটুকু ওয়াজিব যতটুকু ওয়াজিব হুজুর (সাঃ) এর দরূদ পড়া। মুসলমানদের আয়ের এক পঞ্চমাংশ তাঁদেরকে দেওয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। – (১) সুরা আনফাল ৪১। রেসালাতের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রত্যেক মুসলমানদের উপর তাদের কে ভালবাসা ওয়াজিব করা হয়েছে। (সূরা, শোরা ২৩) উঁনারাই উলীল আমর যাঁদের আনুগত্য ওয়াজিব করা হয়েছে। সূরা–নেছা ৫৯, তাঁরাই রাসেখোনা ফ়িল্ ইল্ম যাঁরা কোরআন মুহকাম ও মুতাসাবে আয়াতের সঠিক ব্যাখা করতে পারে। সূরা আলে ইমরান –৭ তাঁরাই আহলে জিকির, যাঁদেরকে হুজুর হাদীসে সাকালাইন, কোরআনের সাথী ঘোষণা দিয়েছেন এবং উভয়কে (কোরআন ও আহলে বায়েত) একই সঙ্গে থাকার কথা বলেছেন। *কানজোল আমাল প্রথম খন্ড পৃষ্ঠাঃ ৪৪, মাসনাদে হাম্বল পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠাঃ ১৮৮)* তাঁদেরকে নূহের নৌকা বলা হয়েছে যারা তাতে উঠলো বেঁচে গেল যারা উঠলো না তারা ডুবে মরলো। *মোসতাদারাক (হাকীম) খন্ড তৃতীয়, পৃষ্ঠা–১৫১ শোয়ায়েকে মোহারেকা ইবনে হাজার মাক্কী পৃষ্ঠা–১৮৪, ২৩৪।*

সাহাবাগণ আহলে বায়তের মর্যাদা জানতেন। তাদের সম্মান করতেন, মান্য করতেন। শিয়াগণ এই আহলে বায়েতগণেরই অনুসরণ করে। তাঁদেরকে সমস্ত সাহাবীদের চেয়ে উন্নত মনে করেন। তাঁদের কথা–কাজকেই সুস্পষ্ট প্রামান্য দলীল হিসেবে মান্য করেন।

কিন্তু আহলে সুন্নাৎ ওয়াল জামায়াত, আহলে বায়তের মর্যাদা, ফজিলত ও সম্মান দেওয়া সত্বেও সাহাবাদের এই প্রকার ভেদ সঠিক মনে করে না। এবং সাহাবাদের মধ্যে কাউকে মুনাফেকও মনে করে না বরং সকল সাহাবাকে উত্তম মানুষ মনে করেন। যদি কখনও তারা প্রকারভেদকে মানেনও তাহলেও তাদের বয়োজেষ্ঠ্যতা, ইসলামের খেদমত ও সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে, যেহেতু সবচেয়ে উত্তম তাদের কাছে খোলাফায়ে–ই রাশেদীন, অতঃপর আশারা–ই–মুবাশ্বেরার বাকী ছয় জন, তাই যখন তারা নবী (সাঃ) ও আলে নবীর উপর দরুদ পাঠ করে তখন এর সাথে সাথে কোন বাদ বিচার ছাড়াই সকল সাহাবাগণের উপরও দরুদ পাঠ করেন। আমি উপরে সাহাবাদের প্রকার ভেদ সম্পর্কে যে কথা বললাম তা শিয়া ও সুন্নি আলেমদের কাছ থেকে শুনা এখন আমি এ বিষয়েই আলোচনা করবো।

আল্লাহর কাছে তৌফিক চাচ্ছি, আমি যেন আবেগ ও মোহ মুক্ত মন নিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ইনসাফের সাথে কাজ করতে ও ফায়সালা করতে পারি। তাই বিষয়টির আলোচনায় আমি দুটি জিনিসকে মানদন্ড হিসাবে নিয়েছি।

এক। বিলকুল সোজা ও অকাট্য সূত্র অর্থাৎ আমি কোরআনের এমন সব ব্যাখ্যা ও এমনসব হাদীসকে নেব যার ব্যাপারে উভয় দলই ঐক্যমত।

দুই। কিয়াস বা বিচারবুদ্ধি ঃ খোদা মানুষকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞানের জন্যই আল্লাহ তার সকল দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে উত্তম ঘোষণা দিয়েছেন। আপনি নিজেই দেখবেন, খোদা যখন তার বান্দার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, তখন জ্ঞান দিয়ে ভাবতে বলেন যেমন– তোমাকে কি জ্ঞান দেওয়া হয়নি, কেন জ্ঞান ব্যবহার কর না, কেন জ্ঞানের গভীরতায় প্রবেশ কর না, কেন দৃষ্টি গভীরে নিবদ্ধ কর না, । .... ইত্যাদি, ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

আমার ইসলাম সেটাই যে আমি আল্লাহ, ফেরেস্তা, কিতাবসমূহ; নবী রাসুলগণের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এবং উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং আল্লাহর মনোণিত দ্বীন শুধু মাত্র ইসলাম। এই পর্য্যায়ে আমি কোন সাহাবার উপর নির্ভর করতে চাই না। তারা রাসুল (সাঃ) এর যতই নিকটাত্মীয় হউন না কেন এবং তাদের মর্যাদা যতই উঁচু হোক না কেন। আমি উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতেমী, সুন্নী, শিয়া কোনটাই নই। না আমি আবুবকর, উমর, উসমান, আলীর সাথে শত্রুতা রাখি। মোট কথা, ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত হামযার (রাঃ) হত্যাকারী সেই কৃষ্ণাঙ্গ গোলামটির সাথেও আমার কোন শত্রুতা নেই। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর অতীত ত্রুটিগুলি মুছে যায়। তাছাড়া হুজুর (সাঃ) মুসলমান হওয়ায় সেই কৃষ্ণাঙ্গকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আমি শুধু সত্যের অনুসন্ধানে অতীতের সমস্ত চিন্তা বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, একমাত্র খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে, সাহাবাদের অবস্থান অধ্যায়টি শুরু করতে যাচ্ছি।

হুদায়বিয়ার শান্তি সন্ধিতে সাহাবাদের আচরণ

সামগ্রীককভাবে ঘটনাটি হল এই, হিজরী ষষ্ঠ সালে রসুল (সাঃ) চৌদ্দশত সাহাবীকে সাথে নিয়ে, ওমরাহ করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু সবাইকে- হুকুম দিলেন তরবারীগুলো খাঁপের মধ্যে রাখতে। জুলহুলাইফ, যা মক্কার নিকট একটি স্থান, সেখানে যেতেই হুজুর (সাঃ) সাহাবাদেরকে নিয়ে ওমরার এহরাম বাঁধলেন এবং কোরবানীর জন্তুগুলির গলায় চামড়ার বেল্ট ও কাঁধে দাগ দিয়ে দিলেন যাতে কোরাইশদের বিশ্বাস হয় যে, মোহাম্মদ কোন যুদ্ধের জন্য নয় বরং মক্কায় ওমরাহর জন্যই আসছেন। কিন্তু আরবদের মাঝে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, জোরপূর্বক মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় ঢুকে কোরাইশদের মান সম্মান ধুলোই মিশে দিবে। এই ভয় থেকেই কোরাইশগণ সোহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং তারা বলে "আপনি এ বৎসর ওমরাহ না করে ফিরে যান, আগামীতে তিনদিনের জন্য মক্কা খুলে দিব, তখন ওমরাহ করবেন"। উভয় পক্ষের অনেক কথাবার্তার পরে কয়েকটি শর্তের উপরে খোদার অহি পেয়ে আল্লাহর রসুল (সাঃ) তাদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

কিন্তু হুজুরের এই পদক্ষেপ কতিপয় সাহাবীর মনঃপুত হলো না তারা শক্তভাবে এর বিরোধীতা করল। হযরত ওমর ফারুক রাসুলে খোদার খুব কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনি কি সত্য নবী নন?" হুজুর (সাঃ) বললেন "অবশ্যই", ওমর আবার বললেন- "আমরা কি সত্যের উপর এবং দুশমনরা কি মিথ্যের উপর নয়?" হুজুর বললেন "অবশ্যই" ওমর বললেন- "তাহলে কেন আমরা এত অপমানজনক শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করব?" আল্লাহর রসুল (সাঃ) বললেন "শোন, আমি আল্লাহর রসুল, আমি খোদার কোন ক্ষতিকর কিছু করতে পারি না, যেহেতু তিনিই আমার

সাহায্যকারী, তখন ওমর বললেন, "আপনি কি আমাদের বলেন নি অচিরেই আমরা কাবা ঘর তাওয়াফ করতে যাব?" আল্লাহর রসুল বললেন "ঠিকই বলেছি, কিন্তু, আমি কি তোমাদের এই বছর করব বলেছিলাম", ওমর বললেন "না তা বলেননি"। তখন আল্লাহর রসুল বললেন "(শান্ত হও) অবশ্যই তোমরা আসবে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে।"

অতঃপর হযরত ওমর হযরত আবু বকরের কাছে গেলেন- বললেন "হে আবু বকর-এই ব্যক্তি কি আল্লাহর রাসুল নন?" তিনি বললেন- "হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল।" অতঃপর ওমর সেই সব প্রশ্নগুলো করলেন ইতিপূর্বে যা রাসুলকে (সাঃ) কে করেছিলেন। আর আবু বকরও সেই উত্তরই দিলেন যা রসুল (সাঃ) দিয়েছিলেন। এবং বললেন- "হে মানুষ ইনি আল্লাহর রসুল, আর রাসুল (সাঃ) খোদার নাফরমানী করতে পারেন না কারণ খোদাই তাঁর সাহায্যকারী। তাই তোমরা শক্ত করে তাঁর আচল ধর।" যখন রাসুল (সাঃ) সন্ধি বৈঠক থেকে উঠে আসলেন তখন সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন- "তোমরা যেয়ে কুরবানী কর এবং মাথা মুন্ডাও।" (বর্ণনাকারী বলেছেন) আল্লাহর কসম, কথা শুনে কেউ উঠেননি- এমতাবস্থায় তিনি তিনবার নির্দেশ দিলেন। তারপরও যখন কেউ তার কথামত উঠেনি তখন নিজেই উঠে হুজরায় চলে গেলেন। আবার হুজরা থেকে বেরিয়ে কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের হাতে উট জবেহ করলেন। আর নাপিত কে বলে নিজের মাথা কামালেন। তখন সাহাবাগণ দেখলেন এবং উঠে নিজ নিজ জন্তু কোরবানী করলেন- একে অন্যের মাথা কামালেন।

এই হলো হুদাইবিয়ার সন্ধির সংক্ষিপ্ত ঘটনা। যার উপর শিয়া সুন্নি উভয়ের ঐক্যমত। আর ঘটনাটি ঐতিহাসিক যেমন তাবারী, ইবনে আসীর, ইবনে সাইদসহ অনেকেই এবং 'বোখারী', 'মুসলেম'ও লিখেছেন। এখানেই আমি থমকে পড়লাম। কেননা আমার জন্য এটা কি করে সম্ভব যে এমন ঘটনা পড়ার পরও আমার ভিতরে প্রতিক্রিয়া হবে না। আর না আমি আশ্চর্য হবো যে, তারা কেমন সাহাবী ছিলেন যে,

নিজেরাই নবীর সামনে এভাবে তর্ক করতে পারেন? এই ঘটনার পরও কি দুনিয়ার এমন কোন জ্ঞানি লোক আছেন যারা মানতে রাজী হবে যে, রসুলে (সাঃ) এর সাহাবীগণ সত্যিই কি মন থেকে রসুলের সমস্ত কাজ বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন! এই ঘটনা তার প্রমান দেয় না। আর এ ঘটনায় তাদের এই মিথ্যে মুখোশ খুলে পড়ে। কোন সচেতন লোক কি এটা মানতে পারে যে, নবী (সাঃ) এর সামনেই এমনতর আপত্তি উথাপন করা কি কোন সাধারণ বিষয়? অথবা সত্যই এমন আপত্তি উথাপনকারী অসহায় অথবা তার কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত থাকতে পারে? আল্লাহর ঘোষণাঃ *কিন্তু না, তোমার পারওয়ারদিগারের কসম! তাহারা মোমীন হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে তোমাকে হাকিম না বানায়। শুধু এই নয় বরং যাহা আপনি ফায়সালা করেন তাতে মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয় (সুরা নেসা– ৬৫।*

এই আয়াতানুযায়ী হযরত ওমর কি খুশিতে এগুলো মানতে পেরেছিলেন? রসুলের সিদ্ধান্তের পর নিজে তিনি সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? রসুলের কাজের ব্যাপারে তিনি কি নিজে সন্ধিহান হননি? বিশেষ করে এটা বলা যে, "আপনি কি খোদার সত্য নবী নন? আপনি কি আমাদের এটা বলেন নি?" ইত্যাদি। অতঃপর হুজুর প্রশ্নগুলোর সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়ার পরও কি তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন? উত্তর শুনে তিনি সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? কখনই না, যদি তাই হত, তাহলে তা আবার আবু বকরকে গিয়ে প্রশ্ন করতেন না। আর আবু বকরের উত্তরেও কি তিনি তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? আসতাগফেরুল্লাহ, আল্লাহই জানেন, তিনি আবু বকর ও রাসুল (সাঃ) এর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন কিনা। ওমরকে বাদ দিলাম অন্য সাহাবীগণ রসুল (সাঃ) এর আদেশ মানতে চাইল না কেন? যদি চাইতোই তাহলে তিনি তিন বার বলার পরও কেন তাদের ভিতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না?

সুবহানাল্লাহ! আমার কোন ভাবেই বিশ্বাস হতে চায় না যে, সাহাবাগণ হুজুরের সিদ্ধান্তের উপর এভাবে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। ঘটনাটি যদি শিয়া গ্রন্থে লিখিত হতো তা হলে মাথা কাটলেও আমি তা মানতাম না বরং মনে করতাম একগুয়েমীবশতঃ তারা সাহাবাদের ব্যাপারে এগুলো বলছে। অথচ ঘটনা কি শিয়া সুন্নি উভয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। ফলে এ হাদীসে তারা উভয়েই ঐক্যমত। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাটি বিশ্বাস না করে আমার কোন উপায় নেই। তাছাড়া আমি কি করে বলবো- হুজুরের এই নির্দেশ না মানার সপক্ষে সাহাবাগণের কোন ধরণের অক্ষমতাকে উপস্থাপন করবো? যারা রেসালাত প্রাপ্তী থেকে সুলেহ হুদায়বীয়া, প্রায় বিশ বছর ধরে হুজুরের সাথে ছিলেন, যারা অলৌকিক ঘটনাগুলো সচক্ষে দেখেছেন। কোরআন দিন রাত তাদেরকে নবীর সাথে আচরণের পদ্ধতি শিখিয়েছেন- কি ভাবে নবীর সাথে কথা বলতে হবে, চলতে হবে, পরামর্শ করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে, অবশেষে আল্লাহ্ ধমক দিয়ে বলেছেন- *"তোমাদের কারও কণ্ঠ যেন নবী কণ্ঠের চেয়ে উচ্চে না উঠে, তোমাদের কণ্ঠস্বর যদি উচ্চে উঠে, সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে"* ।আমার তো বার বার মনে হচ্ছিল যে, তিনি ওমর বিন খাত্তাবই ছিলেন যিনি সমস্ত লোককে উত্তেজিত করেছিলেন, তা না হলে তিনি এভাবে আপত্তিও করাতেন না।

বৃস্পতিবারের দূর্ঘটনা ও সাহাবী

সংক্ষিপ্তাকারে ঘটনার সারমর্ম হলো রসুল (সাঃ) এর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে সমস্ত সাবাহা-ই-কেরাম হুজুরের ঘরে একত্রিত হন। হুজুর (সাঃ) তখন তাদের বললেন "একটা হাড় ও দোয়াত কলম নিয়ে আস। তাতে তোমাদের জন্য এমন অসিয়াৎ লিখে যাব যাতে তোমরা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পার"। কিন্তু সাহাবাগণ নীরব রইলেন। অনেকে তো প্রকাশ্যে অস্বীকার করে বললো, হুজুরের অবস্থা খুব খারাপ তাই লেখার সরঞ্জাম এনে দেওয়া যাবে না। কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট বলে নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এতে রাসুলে খোদা (সাঃ) মনক্ষুণ্ণ হলেন। রাগে কিছু না লিখে সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন- বৃস্পতিবার যেদিন হুজুরের কষ্ট বেড়ে গিয়ে ছিল। তিনি বললেন- "আন- আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে যাব যাতে আমার পরও তোমরা বিভ্রান্ত না হও।" তখন ওমর বললেন- "হুজুরের অসুস্থতা খুব বেড়ে গেছে- আমাদের কাছেতো কোরআন আছেই, কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। (কোন কিছু লিখে যাবার প্রয়োজন নেই)"। এ কথা বলায় উপস্থিত সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তারা ঝগড়া শুরু করে। অনেকে বলছিল "দোয়াৎ কলম দাও, যেন বিভ্রান্ত না হওয়ার পথটা হুজুর লিখে যেতে পারেন"। আবার অনেকেই ওমর যা বলেছিল তাই বলছিল। এমতাবস্থায় হুজুরের ঘরে যখন চেচামেচী বেড়ে যায় তখন তিনি বললেন- "আমার কাছ থেকে তোমরা চলে যাও"। ইবনে আব্বাস বলেন- "সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্য যে তাদের প্রতিবাদও চেচামেচিতে হুজুর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লিখে যেতে পারলেন না।"

সহি বুখারী ২য় খন্ড, সহি মুসলিম ৫ খন্ড, মাসনাদ ইমাম হাম্বল ১ম খন্ড, তারাবী ইবনে আসিব।

হাদীসটি সহী এতে কোন সন্দেহ নেই। শিয়া আলেম ও মহাদ্দেসগণ হাদীসটি যে ভাবে বর্ণনা করেছে, হুবহু আহলে সুন্নাতরা সেভাবে নকল করেছে তাই আমরাও মানতে বাধ্য। এখানে হযরত ওমর, রসুল (সাঃ) এর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। আপনিও চিন্তা করুন, উম্মতকে গুমরাহী থেকে বাচানোর বিষয়, যাতে হযরত (সাঃ) এমন কিছু লিখতেন যাতে নতুন কিছু থাকতো, যাতে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যেত।

শিয়াদের ধারণা যে রাসুলে খোদা (সাঃ) খেলাফতের জন্য আলীর নাম লিখে যেতেন। ওমর এটা টের পেয়ে আগে ভাগেই কিছু লিখতে দেয়নি, যাতে শিয়ারা তাদের দাবী আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না করতে পারে। আর আমরাও পূর্ব থেকেই এটাকে মানতে পারছিলাম না। কিন্তু দুঃখজনক হলো, এহেন অবস্থা হুজুর (সাঃ)কে খুবই রাগান্বিত করে তুলে, এমন কি রাগে তিনি সবাইকে ঘর থেকে বের করে দেন। এ কথা স্মরণ করে হযরত ইবনে আব্বাস এতই কেঁদেছেন যে মাটি, পাথর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আহলে সুন্নাতগণ কি এ ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখা দিতে পেরেছে। আহলে সুন্নাতদের সেই খোড়া ব্যাখা কি কোন নির্বোধ ব্যক্তিও গ্রহণ করবে ও মৃত্যু কষ্টের কথা অনুভব করে এটা করেছেন? তাই হুজুর (সাঃ) এর উপর তার দরদ হয়। আর নিষেধ করার অর্থ হলো যাতে হুজুর (সাঃ) আরাম পান?

আলেমদের তো প্রশ্নই আসে না বরং আমি নিজেও বার বার চেষ্টা করেছি যে ওমরের জন্য কোন কারণ উপস্থাপন করবো। কিন্তু ব্যাপারটা এতই নাজুক যে, কোন ব্যাখা বিশ্লেষণের এখানে অবকাশ নাই। যদি আমরা আজ "প্রলাপ" বাদ দিয়ে কষ্টের কথা তা কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যেহেতু তিনি আগ বাড়িয়ে বলেছেন- আমাদের নিকট কোরআন আছে............" তাহলে কি ওমর আল্লাহর রাসুলের চেয়ে বেশী জানতেন? রাসুল (সাঃ) তো কোরআন থাকা সত্ত্বেও কিছু লিখে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেছেন কিন্তু ওমরের কাছে লিখার প্রয়োজন হলো না। তা হলে কি রাসুল (সাঃ) এর স্মরণশক্তি ওমরের চেয়ে কম ছিল? এর পরও ওমর উপস্থিত জনতার মাঝে একথা বলে মতপার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস পান- আস্তাগফেরুল্লাহ।

তাছাড়া আমরা যদি আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা মেনেও নেই তাহলেও কি বিষয়টা মিটে যায়? এখানে রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্য কি ভাবে হলো? কেন তিনি বললেন রাসুল (সাঃ) প্রলাপ বকেছেন? তাই পরিষ্কার হুজুর (সাঃ)কে লিখাতে না দিয়ে হৈ চৈ করে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে, তাই এখন রাসুল (সাঃ) এর ঘরে অবস্থানের আর যৌক্তিকতা নেই। কেননা হৈ চৈ করে, মতবিরোধ তৈরী করে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছিল হুজুর (সাঃ)কে লিখতে দাও, আবার কেও বলছিল না ওমরের কথাই ঠিক। (নাউযুবিল্লাহ)।

যখন নবী (সাঃ) এর ঘরে খুব হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যায়, নবী (সাঃ) তাদেরকে বের হয়ে যেতে বলেন। তখন সবাই বের হয়ে যায়। তখন ওমর কেন বলেননি এটাও নবীর প্রলাপ। আমরা বের হবো না। কিন্তু ওমর তাহার অজান্তে বের হয়ে সাব্যস্ত করে দিলেন যে নবীর আগের কথাও ঠিক ছিল, প্রলাপ ছিল না।

অবস্থা এতটা সিদাসাদা ছিল না যে শুধু ওমরের ব্যাপার, যদি তাই হতো তা হলে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ওমরকে চুপ করিয়ে দিতেনএবং নিশ্চিন্ত করতেন যে, আমি অহী ছাড়া কোন কথা বলি না। আর উম্মতের পথ নির্দেশনার ব্যাপারে প্রলাপের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। বিষয়টা আরও গভীর ছিল। কিছু লোক এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই তৈরী ছিল, আর তাই জেনে বুঝে হুজুর (সাঃ) এর ঘরে এই হাংগামা তৈরী করে, আর আল্লার কালামকে ভুলে যায়, ভুলার ভান করে। *হে ঈমানদারগণ, (কথার বলার সময়) তুমি নিজের কণ্ঠস্বর পয়গম্বরের কণ্ঠস্বরের উপরে তুলিও না এবং যেভাবে তোমরা একে অপরের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বল উনার সম্মুখে সেভাবে কথা বলিও না, (এমন যেন না হয়) যাতে তোমার কৃতকর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং তুমি তা জানতেও পারবে না।* সুরা-হুজরাত-২

কলম কাগজ আনার এই ঘটনা ও তার প্রতিবাদ মুখ্য নয়? বরং এটার সাথে সাথে এখানে হুজুরের উপর পাগলামীর অভিযোগ আনা হয়েছে। এবং হৈ চৈয়ের মাধ্যমে ঝগড়া ফাসাদের উপক্রম করা হয়।

আমার বিশ্বাস সেখানের অধিকাংশই ওমরের সাথে ছিল, হুজুর (সাঃ) বুঝলেন– তাই আর লিখার কোন ফায়দা নেই। তিনি জানতেন এরা না আমার লিখার মর্যাদা দেবে, না সে অনুযায়ী কাজ করবে, যেহেতু তারা চেচামেচী করে খোদার নাফরমানী করছে তাহলে আমার নির্দেশ কি ভাবে পালন করবে;

হুজুরের এটাই হেকমত যে এখন তাদের জন্য কোন লিখন নয় যেহেতু তাঁর জীবদ্দশায় তারা ঝগড়া করছে, মরলে কি করবে? এবং আপত্তি উত্থাপনকারীরা যদি বলে যে প্রলাপ অবস্থায় হুজুর (সাঃ) কি নাকি লিখেছেন তাই এর গুরুত্ব কতটুকু? মৃত্যুর সময় হুজুর (সাঃ) যে নির্দেশ দিতেন, তাতে মানুষ সন্দেহ পোষণ করবে তাই আর কিছু না লেখাই ভাল। আমি আল্লাহর কছে ক্ষমা চাই এবং মহান নবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে যা বলা হয়েছে তা মেনে নিতে অস্বীকার কচ্ছি।

আমি বুঝেই পাই না যে আমি মনকে কি করে বুঝাবো কি করে নিজেকে প্রবোধ দেব যে, হযরত ওমর স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন কাজ করতে পারেন যেখানে উপস্থিত অনেক সাহাবী এই কথা মনে করে এমনভাবে কেঁদেছেন যে, পাথর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল আর সেই দিনকে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যের দিন আক্ষায়িত করেছেন।

এ জন্য অধ্যায়ন না করে বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবলাম, আবার মনে করলাম পুরা ঘটনাটাই অস্বীকার করি, সম্পূর্ণ ঘটনাকে মিথ্যা বলে দেই। কিন্তু আমি নিরুপায় যেহেতু সিয়াসিত্তাতে শুধু এটা বর্ণনাই করেন নাই বরং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলেও আখ্যা দিয়েছে। তাই আমি এখন কি করতে পারি?

আমার মনে হয় এ ঘটনার ব্যাপারে শিয়াদের ব্যাখ্যাই গ্রহনযোগ্য। কারণ তাদের প্রমাণ ও যুক্তি অকাট্য। এটার অনেক কারণ আমার এখনও মনে আছে, এ ব্যাপারে আমি যখন সাইয়্যেদ বাকের সদরকে প্রশ্ন করেছিলাম, "যে হুজুর (সাঃ) এর অন্তিম আসিয়াৎ যে আলীর খিলাফতের ব্যাপারেই ছিল তা কি করে হয়, তিনি তো আরও অনেক বিষয়ে লিখতে পারতেন? তা ছাড়া বিষয়টি যদি আলী (আঃ) সর্ম্পকিতই হয় তাহলে এটা কেউ বুঝলো না, ওমর কি করে বুঝলেন- যদি তাই হয় তাহলে এটা কি প্রমানিত হয় না যে তিনি একজন চালাক লোক ছিলেন"?

তখন সদর বলেছিলেন- তাছাড়া বিষয়টি যে এই হবে তা শুধু ওমরই বুঝেননি আরও অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। কারণ আগেও হুজুর বলেছিলেন- "আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ভারী জিনিষ রেখে যাচ্ছিঃ-এক কিতাবুল্লাহ দুই আমার আহলে বায়েত। তোমরা যদি এই দুইকে শক্ত করে ধর তাহলে কখনই বিভ্রান্ত হবে না"। স্বভাবতঃই বুঝা যায় মৃত্যুপথযাত্রী মুহাম্মদ (সাঃ) কাগজে কলমে তাই লিখতে চেয়েছিলেন- কারণ বলেছিলেন, "আন, কিছু লিখবো যাতে আমার মরার পর তোমরা বিভ্রান্ত না হও"। তাই উপস্থিত সকলের মত ওমর বুঝতে পারছিলেন যে হুজুর (সাঃ) গাদীরের খুমে মৌখিকভাবে আলী (আঃ) এর ব্যাপারে যা বলেছিলেন- কাগজ-কলমে তাই লিখতে চান, যে "তোমরা আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বায়তের সমানও অনুসরণ করবে তাহলে কখনই বিভ্রান্ত হবে না"। আহলে বায়েত বলতে আলী (আঃ)কেই বুঝায়। অন্যখানে আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন "তোমরা কোরআন ও আলীকে অনুসরণ করবে"। এ ধরণের কথা তিনি আরও অনেকবার বলেছেন। কিন্তু যেহেতু কুরাইশদের অধিকাংশ আলীকে অপছন্দ করতো কারণ তিনি বয়সে ছোট ছিলেন, তিনি তাদের দর্পকে চূর্ণ করেছেন এবং তাদের

অনেক বীরকে হত্যা করেছেন কিন্তু তারা নবী (সঃ) এর বিরুদ্ধে যেতে এত সাহস করেনি। যে রকম বিরোধীতা তারা করেছিল হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় এবং মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাবিন উবাইর জানাযার ব্যাপারে। এ ছাড়াও আরও অনেক ঘটনা আছে যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা তাদের মধ্যে একটি কিন্তু এটা যে কত অপরিণামদর্শী ও আত্মঘাতি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ওমরের সাথে সাথে উপস্থিত অনেকে হুজুর (সাঃ) এর অসুখের কারণে দলীল লিখার ব্যাপারে প্রতিবাদী হয়ে যাওয়ায়, ঔদ্ধত্ব ও বিশৃংখলা চরমভাবে দেখা দিল।

ওমরের কথা হাদীসের পরিপন্থি। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে কোরআন আছে, আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট"। প্রকাশ্যই এটা হাদীসের বিপরীত কথা। যেহেতু কিতাবে ও রাসুল (সাঃ) এর আলের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আর ওমরের উদ্দেশ্য ছিল "আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট"। (আমাদের আলের কোন প্রয়োজন নেই) ওমরের কথাবার্তা ও বারবার প্রতিবাদে এই ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কেউ যদি এমন মনে করে যে শুধু আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করব, রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণের কথা বাদ দিয়ে কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ কোরআন হাদীসের পরিপন্থী।

আমি যদি আমার পূর্ববর্তী সংস্কার ও আমার আবেগকে সরিয়ে রেখে স্বচ্ছ জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তাকে আমার রায়ের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা এটাই খুব সরল ব্যাখ্যা। না হলে বলতে হয় ওমর ঐ প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কিতাবকে ধারণ করে সুন্নতে রাসুল (সাঃ)কে ছেড়ে দিতে বলেছিলেনঃ হাসবুনা কিতাবুল্লাহ্‌।

যদি কোন কোন শাসক সুন্নাতে রাসুল (সাঃ)কে এই বলে ছেড়ে দেয় যে এতে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে তাহলে তাদেরকে অপরাধী বলা যাবে না কারণ তারাতো মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের একটা প্রাথমিক উদাহরণের অনুসরণ করেছে। এ ছাড়াও এই ঘটনায় যা মুসলিম উম্মাকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেছে তার দায় দায়িত্ব শুধু ওমরেরই নয় বরং তার অনুগত সকল সাহাবীর- বলা হয়ে কি

ভুল বলা হবে? আমি তাদের উপর আশ্চর্য হয়ে যাই যে এত বড় একটা ঘটনার পরেও তারা কি করে স্বাভাবিক থাকতে পারে? কোন প্রতিক্রিয়াই তাদের ভিতর নাই। অথচ ইবনে আব্বাসের কথা অনুযায়ী "উম্মতের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে বিপর্যয়কর ঘটনা"। এ ছাড়া তাদের উপর আরো বেশী আশ্চর্য হতে হয় যখন তারা ইসলামের বুনিয়াদ ও রাসুল (সাঃ) এর মর্যাদার উপর আঘাত করে হলেও একজন সাহাবীর সম্মান রক্ষা ও তার ভুলের সংশোধনের জন্য এত শক্ত চেষ্টা করেছেন দেখা যায়। সত্য যদি আমাদের মন মত না হয়, তাহলে তা থেকে সরে যেতে হবে বা তাকে বিলোপ করতে হবে কেন? সব শেষে, আমরা কেন এ সত্যটা মানতে চাচ্ছি না যে সাহাবীরা আমাদের মতই মানুষ, তাদের ঝোঁকপ্রবণতা, কুসংস্কার, নিজস্ব স্বার্থ ছিল। তারা ভুল ও শুদ্ধ দুই করতে পারতো।

আমাদের বিস্ময় তখনই দূর হয়ে যায় যখন আমরা আল-কোরআনে অতীত নবী (আঃ) দের ঘটনাবলী পড়ি এবং তাতে দেখি উনাদের অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখাসত্ত্বেও তাঁদের বংশ গোত্রের লোকেরা তাদের অবাধ্যতা হতে বিরত হয়নি।

এখন যদি আমি শিয়াদের মত বুঝতে চাই যে, এই কাগজ-কলম আনার ঘটনার পর মুসলমানদের জীবনে পদে পদে যে বিপর্যয় ও দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দ্বিতীয় খলিফা দায়ী কেননা তার জন্য মুসলিম উম্মা হেদায়েতের এই মূল্যবান অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যে হিদায়াতের পথ- নির্দেশনা রাসুল (সাঃ) ইন্তেকালের আগমুহূর্তে লিখে যেতে চেয়েছিলেন। আমার এটা বলা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নাই যে যারা বৈজ্ঞানিক সত্যের মানদণ্ডে মানুষকে যাচাই করে সত্যের অন্বেষণ না করে বরং মানুষের কাছে শুনে সত্যকে চিনে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

উসামার সৈন্যবাহিনী ও সাহাবী

সারসংক্ষেপ হলো, হুজুর (সাঃ) এর ইন্তিকালের দুইদিন পূর্বে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটা সৈন্যবাহিনী তৈরী করেন এবং এর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয় উসামা বিন জায়েদ বিন হারেসাকে। উসামার বয়স তখন আঠার বৎসর আর এই অল্প বয়স্ক সাহাবীর নেতৃত্বে বড় বড় আনসার মোহাজেরদেরকে থাকতে বলা হয় যেমন, আবু বকর, ওমর- আবু উবাইদাসহ অনেকেই। প্রকাশ থাকে যে, তখন অনেক সাহাবা এই যুবকের নেতৃত্বে যুদ্ধের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। বলেন, যার এখনও গোঁফই উঠেনি, কি করে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা সম্ভব? এই আপত্তি উথাপনকারী সাহাবীগন তারাই যারা- উসামার পিতা জায়েদের নেতৃত্ব নিয়েও একদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। উসামার ব্যাপারে তারা মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে, যে জন্য হুজুর (সাঃ) খুবই রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং দুইজন লোকের সাহায্য নিয়ে এমনভাবে বাহির হয়ে আসেন যে, উনার পা দুটি মাটিতে রেখা টেনে যাচ্ছিল। হুজুর (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি অসুস্থতায় খুবই দুর্বল ছিলেন, সোজা মিম্বারে বসে আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন "হে মানব সকল! এটা কেমন কথাবার্তা যা আমি উসামার ব্যাপারে শুনতে পাচ্ছি? তোমরা উসামাকে নেতা বানাবার কারণে আমার নির্দেশের অবমাননা করছ, অথচ এই তোমরাই একদিন তাঁর পিতা জায়েদকে কমান্ডার বানানোর জন্য আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম! জায়েদ নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন- আর তার পুত্র উসামাও নেতৃত্বের হকদার ও যোগ্য"

অতঃপর তিনি সাহাবীদের তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে বলেছিলেন "উসামার সৈন্যদলকে তৈয়ার কর" এবং যাও আবার বলছিলেন-" "উসামার সাথে মানুষকে তাড়াতাড়ি পাঠাও।" এসব বাক্য বার বার তিনি উচ্চারন করছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রত্যেক বারই তারা দ্বিধাদন্দ্বে ভুগছিল। শেষে যাও রওয়ানা দিল- মদীনার প্রান্তে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল। আসলে তারা যাওয়ার জন্য তৈরী নয়।

এসব ঘটনা জানার পর আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই- "রাসুলে খোদা (সাঃ) এর সাথে এত বড় বেয়াদবীর সাহস তাদের কি করে হলো? রসুল (সাঃ) যিনি মুমেনের জন্য একমাত্র পাথেয়, তাঁর সাথে এটা কত বড় নাফরমানি?" আমি কেন, কোন বিবেকবান লোকই এ সব অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্বের কান গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

এসব ঘটনা অধ্যায়নকালে যে বর্ণনাগুলো সাহাবাদের মর্যাদার পরিপন্থি আমি তা যথাসম্ভব মিথ্যা মনে করতে বা উপেক্ষা করতে চাই। কিন্তু যে ঘটনাগুলোকে শিয়া, সুন্নি ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগন ঐক্যমতের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছে, তাকে কি করে অস্বিকার বা উপেক্ষা করি?

আমি খোদার কাছে ওয়াদাবদ্ধ- ইনসাফের সাথে কাজ করবো। কোন মাজহাবের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করব না। অন্যায়ভাবে কোন কিছু বলব না, যাতে করে বলা না যায় যে, আমি এখানে সত্যকে গোপন করেছি এবং রসুল (সাঃ) বলেছেন "সত্য কথা বল তা তোমাদের বিরুদ্ধে গেলেও, সত্য কথা বল তা যত কটুই শুনাক না কেন।" আর এই ঘটনার সত্য কথা হলো যে, সাহাবাগণ উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে হুজুর (সাঃ) এর কথায় আপত্তি করেছিলেন- তা এতটাই সুস্পষ্ট যে এখানে কোন ব্যাখ্যা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর কোন ওজর আপত্তিও উত্থাপন করা যায় না। এমন কি আহলে সুন্নাতগণ এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা দেয় তাও কোন বিবেকবান মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। তবে, হ্যাঁ যারা হাদীসকে বুঝতে পারেনি বা জ্ঞানকে বন্ধক রেখেছেন অথবা মাজহাবী আনুগত্যে সীমাহীন অন্ধত্বে ভুগছেন এবং কোনটা করা ফরজ, আর কোনটা না করা ফরজ বুঝতে পারছেন না- তাদের কথা আলাদা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কোন গ্রহনযোগ্য কারণ সেই সব সাহাবাদের জন্য খুঁজে বের করতে পারিনি কিম্বা আমার মাথায় এমনকিছু আসলো না। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যে কারণগুলো উপস্থাপন করেছে তাহলো- তারা কোরাইশদের মধ্যে সব চেয়ে বুজুর্গ ছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে প্রবীন ছিলেন, উসামা সে তুলনায় যুবক ছিলেন, ইসলামের মর্যাদা রক্ষাকারী কোন যুদ্ধেও তিনি যাননি, যেমন বদর ওহুদ, খন্দক

ইত্যাদি। তাছাড়া কোন দিক দিয়েই তিনি প্রাধান্য পাওয়ার মত ছিলেন না। অথচ হুজুর তাঁকেই কমান্ডিং অফিসার বানান– তিনি খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন। মানবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যেখানে মুরুব্বী ও জ্ঞানীরা থাকেন সেখানে তরুনের আনুগত্য কেও করতে চান না। এজন্যেই সাহাবাগন হুজুর (সাঃ) এর কাছে আপত্তি জানিয়ে ছিলেন, যাতে উসামার যায়গায় কোন সুদক্ষ প্রবীন সাহাবীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়– কিন্তু এই যে কারণ, তার না আছে কোন যৌক্তিক ভিত্তি, না আছে শরীয়াতি কোন ভিত্তি। আর কোন মুসলমান এই কথা মানতেই পারে না, যিনি কোরআন পড়েন, বুঝেন তিনি অবশ্যই জানেন– কেননা কোরআনে এই ঘটনা আছে।

"রাসুল যে নির্দেশ দেন সেটা মেনে নাও, আর যা থেকে বিরত করেন তা থেকে বিরত থাকো" সূরা হাসর–৭।

অন্য এক জায়গায় বলা হচ্ছে, "কোন মোমেন বা মোমেনার এই অধিকার নাই যে, খোদা বা তাঁর রাসুল (সাঃ) যখন কোন কাজের হুকুম দেয় সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"– আহ্জাব–৩৬।

এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর পর আর কোন ধরণের ওজর দেখানোর অবকাশ থাকে কি না, যাকে সচেতন ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা আমার বুঝে আসে না। আমি তাদেরকে কি বলবো, যারা হুজুর (সাঃ) কে রাগান্বিত করেছেন। আর তারা ভাল করেই জানেন যে, হুজুর (সাঃ) এর অসন্তুষ্টি অর্থ খোদার অসন্তুষ্টি। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হুজুর (সাঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে চেঁচামেচি করা, বিরোধীতা প্রদর্শন করা, অতঃপর ঘর থেকে বের করে দেওয়া, তার নির্দেশিত নেতৃত্বকে গ্রহণ না করার প্রবণতা, এসব কি সাধারণ কথা? এর পরও যদি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হতো, হিদায়াতের দিকে ফিরে এসে তওবা করে কোরানের শিক্ষানুযায়ী হুজুর (সাঃ) এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত, তা না হয় কথা ছিল। এসব না করে আরও তাঁরা সমালোচনা করেছে, বেশী ঔদ্ধাত্ব প্রদর্শন করেছে, যে তাদের একমাত্র অবলম্বন তাঁর সাথে। তাঁর নির্দেশের সম্মান না দিয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছে। এই আঘাতের জঘন্য বেদনা শেষ না হতেই ঠিক দুদিন পর আবার উসামার নেতৃত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি? হুজুর (সাঃ)কে দু'জনের সহযোগীতা নিয়ে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে, অসুস্থতার

জন্য পা উঠাতে পারছিলেন না, তার পরও সোজা মিম্বরে বসে, তিনি খোদার কসম খেয়ে বললেন- "উসামার নেতৃত্ব বৈধ এবং উপযুক্ত," তার পর তিনি এও বললেন-"যে তারাই উসামার বিরোধিতা করছে যারা, তার পিতা যায়েদের নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করেছিল"। তাহলে বিষয়টিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবো।

তাদের প্রকাশ্য বিরোধীতার বড় নমুনা হলো, তাঁরা রসুল (সাঃ) এর রাগান্বিত চেহারা দেখেছে এবং এও দেখেছে উসামার নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য তিনি নিজ হাতে পতাকা বেঁধে দিয়েছেন এবং সকলকে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এতদসত্বে ও কতিপয় সাহাবা যাবে কি যাবে না দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন এবং না যাওয়ার সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন। এই অবস্থায় হুজুর (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি মনে এই ব্যাথা নিয়ে যান যে, তাঁর উম্মত নাফরমান হয়ে গেছে এবং এই আশংকায়ই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তাঁর হতভাগা উম্মত আবার সেই সাবেকী জায়গায় ফিরে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়ে শেষ হবে যা থেকে সামান্য কিছু রক্ষা পাবে। আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন তাদের সংখ্যা হবে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র।

আমরা যদি এই ঘটনার গভীরে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখবো, এই সব কিছুর পিছনে মূল ব্যক্তি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর। তিনিই রসুলে খোদা (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর এর কাছে এসে উসামার পরিবর্তে অন্য কাউকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে বলেছিলেন।

উত্তরে আবুবকর বলেছিলেন "হে খাত্তাব এর পুত্র! তুমি কি আমাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছ যাকে রসুল (সাঃ) নেতা বানিয়ে গেছেন তাকে আমি পদচ্যুত করবো"? *(তাবকাতে আকবার ইবনে সাইদ ২য় খন্ড পৃঃ ১৯০. তাবারী-৩য় খন্ড পৃঃ ২২৬)।* সে যাহা হোক হযরত আবুবকর যে কথাটা বুঝলেন হযরত ওমর তা বুঝতে পারলেন না কেন? নাকি এর ভেতরে অন্য কোন কিছু আছে, যা ঐতিহাসিকদের কাছে গোপন রয়ে গেছে? নাকি ঐতিহাসিকগণ হযরত ওমরের মান সম্মানকে বাঁচাতে গিয়ে কিছুটা গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা, সেই ঐতিহাসিকদের অভ্যেস ছিল এবং যেমন তাহারা রাসুল (সাঃ) এর অসুস্থতার সময় "প্রলাপ বকছেন" কথাটির উপর প্রধান্য দিয়েছিলেন।

আমি সেই সব সাহাবীদের ব্যাপারে আশ্চর্য হই, যারা সেই

বৃহস্পতিবারের দিনে হুজুর (সঃ)কে রাগান্বিত করেছিল এবং অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি "প্রলাপ বকেছেন" বলে অভিযোগ করেছে। এখানে আমার নতুন কিছু লিখার প্রয়োজন নেই কারণ, "আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট" বলে তারা হুজুর (সাঃ) এর নির্দেশকে অমান্য করেছে অথচ কোরআন ঘোষণা দিচ্ছে *"হেঁ মোহাম্মদ আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল বাস, তাহলে হুবহু আমার অনুগত্য স্বীকার কর তা হলেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।* ৩. ৩১

এই সব সাহাবা কি তাঁর চেয়ে আল্লাহর কোরআন বেশী বুঝেন, যাঁর উপরে এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে? কাগজ-কলম আনতে বলার ঘটনার দুই দিন পর এবং ইন্তেকালের দুই দিন আগে এই সাহাবাগণ হুজুর (সাঃ) কে আবার রাগান্বিত করে তোলে উসামার নেতৃত্বের প্রশ্নে হুজুরের আনুগত্য না করে। যদিও প্রথম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং বিছানায় শায়িত ছিলেন। তবে দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি বাধ্য হলেন মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে, অসুস্থতায় পা তুলতে পারছিলেন না, তবুও দুই জনার কাঁদে ভর দিয়ে মসজিদের মিম্বারে এসে খুতবা দিলেন এবং তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে প্রলাপ বকার মত তাঁর কিছুই হয়নি। এও বুঝিয়ে দিলেন যে "তোমাদের আপত্তির ব্যাপারটাও আমি জানি", এই সঙ্গে সেই ঘটনাও মনে করিয়ে দিলেন ,যা চার বছর আগে ঘটেছিল। এই সব আলোচনার পরেও কি, কারও বিশ্বাস হবে যে তিনি 'প্রলাপ বকতে' পারেন অথবা অসুস্থতা তাঁর উপর প্রাধান্য পেয়েছিল, যে জন্য তিনি অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ছিলেন?

আল্লাহর সমস্ত প্রশংসাও তারিফ, তোমার পয়গম্বরের বিরোধীতা করার দুঃসাহস তারা কিভাবে পেল?- কখনও রসুলের এর কৃত সন্ধির প্রচন্ড বিরোধীতা করেছিল, কখনও রসুল (সাঃ) এর কুরবানী এবং মাথা কামানোর হুকুম কে অমান্য করেছিল। এটা এক বার নয়, তিন তিন বার হুকুম করার পরও কেউ সাড়া দেয়নি, কখনও হুজুর (সাঃ) এর জামা টেনে ধরে- যেন তিনি আবদুল্লা ইবনে উবায়ের এর জানাযায় না যান এবং রসুল (সঃ)কে বলা হয়- "আল্লাহ আপনাকে মুনাফেকদের নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন"। কি আশ্চর্য! এইসব সাহাবাগণ, রাসুলে খোদা (সাঃ)ক সেই জিনিস শিক্ষা দিতে চান যা

রাসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ, কোরান ঘোষণা দিচ্ছে যে, *আমরা তোমার কাছে স্মারক অবতীর্ণ করেছি তা মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তুমি আরও বলেছঃ আমরা তোমার কছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্য সহকারে এইজন্যে যে, যেভাবে খোদা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই তুমি তাদে' ভিতর ফায়সালা কর।* (নিসা ১০৫ নং আয়াত) *"যেমন আমরা তোমাদে· ...ই রাসুল পাঠিয়েছি যেন তিনি নিদর্শনসমূহ তোমাদের পড়ে শোনান এবং তোমাদের অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দেন সেই সব বিষয় যাহা তোমরা ·ান না"।*(আল বাকারা ১৫১ নং আয়াত)" আমরা ঐ সব লোকদের ব্যপারে আশ্চর্যান্বিত যে, তারা নিজেদের কে রাসুল (সাঃ) এর চাইতে বড় মনে করে অথচ রাসুল (সাঃ) এর হুকুমকে অনুধাবন করতে পারে না। কখনও রাসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রলাপ বকার অভিযোগ করে, এবং নির্লজ্জভাবে বেয়াদবী করে হুজুর (সাঃ) এর উপস্থিতিতেই, ঝগড়া ফাসাদ করে। কখনও জায়েদ বিন হারিসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি করে, কখনও উসামার নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে। এসব ঘটনা পর্যালোচনা করে একজন সাধারণ ব্যক্তিও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে 'আসল হক হল' শিয়াদের সাথে।

আমি সংক্ষেপে চার/পাঁচটি ঘটনা বললাম, কিন্তু শিয়া আলেমরা যে সব জায়গায় রাসুলে খোদা (সাঃ) এর নির্দেশ পালনে সাহাবাগণ বিরোধীতা করেছে সেই সবগুলো ঘটনাই উদঘাটন করেছে, বিশ্লেষণ করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল তারা সেই সব জিনিসকেই উপস্থাপন করেছেন যেটাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলেমারা নিজেদের সিহা সিত্তাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও দু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যাতে, সাহাবা এ কেরামদের অবস্থা ও শিয়াদের দাবীর যথার্থতা ফুটে উঠবে।

সহীহ বোখারী ৪র্থ খন্ড ৪৭ পৃঃ কিতাবুল আদাবের কষ্টে ধৈর্য্যধারণ এবং এ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত এবং সেই আয়াতে *"এবং যারা ধৈর্য্যশীল নিঃসন্দেহে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে"*। সূরা যুমার–আয়াত–১০। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমাস বলেছেন– "আমি শাকিককে বলতে শুনেছি যে আবদুল্লাহ বলেছিলেন– রাসুল খোদা (সাঃ)

একদিন একদল লোকের মধ্যে কিছু জিনিষ বন্টন করে দিলেন যা তিনি প্রায়ই করতেন"। তখন এক আনসারী বললেন- "আল্লাহর কসম এই বন্টন আল্লাহর জন্য নয়"। আমি বললাম "আমি এই কথা হুজুরকে বলবো।" তাই আমি সেই সময় হুজুরের নিকট গেলাম, যখন তিনি সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন- "আমি তাঁর কানে কানে কথা বলতেই তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি চরমভাবে রাগান্বিত হয়ে গেলেন"। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমি মনে মনে বললাম আহা আমি যদি খবরটা হুজুর (সাঃ) এর কানে না পৌছাতাম। অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন- "মুসা (আঃ)কেও এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল"- কথাটা বলেই তিনি ধৈর্য্য ধারণ করলেন- এভাবে বুখারী শরীফের একই খন্ডে কিতাবুল আদবের হাসার অধ্যায়ে আছে- আনাস বিন মালেক বলেছেন "আমি রাসূলে খোদা (সাঃ) এর সাথে চলছিলাম। তাঁর গায়ে একটা নাজরানী চাদর ছিল। চাদরটার আচল খুব মোটা ছিল। চলছি এ সময় এক গ্রাম্য আরবীয় হঠাৎ হুজুরের দিকে এগিয়ে আসলো এবং সে হুজুরের চাদরের কোনা ধরে জোরে টান দিল- টানার ফলে দেখলাম হুজুরের কাঁধে দাগ পড়ে গেছে। চাদর টেনে ধরে আরবী বললো- "হে মুহাম্মদ খোদার মাল যা, তোমার কাছে আছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দাও।" রাসুল (সাঃ) তাঁর দিকে ফিরে হাসতে থাকলেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন তাকে কিছু দেওয়া হয়। এই কিতাবুল আদাবের অন্য জায়গায় এক রাওয়ায়েতে আছে- যা হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- "রাসুল (সাঃ) নিজেই একটা জিনিস বানালেন, তা থেকে মানুষকে ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।" কিন্তু কিছু লোক তা ব্যবহারে আপত্তি করলো। রাসূল (সাঃ) বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন- হামদ ও সানার পর বললেন- "শেষ পর্যন্ত মানুষের কি হলো যে, আমি যা নিজ হাতে বানিয়েছি, তা থেকে তারা দূরে থাকছে। আল্লাহর কসম! খোদার ব্যাপারে আমি সবার চেয়ে বেশী ধারণা রাখি, এবং সবচেয়ে বেঁশি ভয় করি।"

যে এই রাওয়ায়েতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে সে নিজেই বুঝবে সাহাবীগণ নিজেদেরকে কোন কোন ব্যাপারে উঁচু মনে করতেন। তাদের ধারণা রাসুল (সাঃ) ভুল করতেন, কিন্তু তারা ভুলের উর্ধ্বে। অথচ কোন কোন ঐতিহাসিক সাহাবীদের এই কাজ-গুলোকে ভালভাবে জানতেন, যে তা রাসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ছিল।

এবং কতিপয় সাহাবাদের কাজকর্ম এমনভাবে উপস্থাপিত করে যে, রাসুল (সাঃ) এর চেয়েও তারা জ্ঞানী ও তাকওয়াতে উচ্চমানের ছিলেন।- যেমন ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত যে, বদরের যুদ্ধে কয়েদীদের ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত ছিল ভুল (নাউযুবিল্লাহ) আর হযরত ওমরের সিদ্ধান্ত ছিল ঠিক। আর এর সমথর্নে তারা কিছু মিথ্যে হাদীস উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন আমাদেরকে মছিবতে ফেলার তাহলে ওমর ছাড়া কেউ পরিত্রান পেত না"। আর বর্তমানেও তারা বলে যদি ওমর না থাকতেন তা হলে নবী ধ্বংস হয়ে যেত। (নাউযুবিল্লা) আল্লাহ যেন এই বিভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আমাদেরকে বাঁচান যা থেকে আর কোন জঘন্য বিশ্বাস হতে পারে না। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই আকীদা যারা পোষণ করে তারা ইসলাম থেকে এতটা দূরে চলে গেছে যে, যতটা পশ্চিম থেকে পূর্বের দূরত্ব। তার উপর ওয়াজিব, সে যেন সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে মনের শয়তানী দূর করে। কোরানের ঘোষণা- *"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে নিজের নফসের চাহিদাকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ জেনে শুনে তাকে গুমরাহীতে ছেড়ে দিয়েছেন।আর তার কান ও মনের মধ্যে সীল মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন এবং খোদা ছাড়া তার হেদায়েত কে করতে পারে তাহলে তোমরা কি একটুও চিন্তা কর না"।* (আল জাসিয়া আয়াত ২৩) আমি আমার জীবনের শপথ খেয়ে বলতে পারি। যাদের এই বিশ্বাস যে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আবেগ দ্বারা চালিত হতেন তিনিও দোষে গুনে মানুষ, এবং তিনি খোদার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত না করে বরং আবেগ ও মেজাজ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন। সেই লোকগুলি নবী (সাঃ) এর দ্বারা-সম্পাদিত কাজ থেকে নিজেদেকে দূরে রাখতেন কেননা তাহারা নিজেদেরকে রাসুল (সাঃ) এর চেয়েও মুত্তাকী এবং রাসুল (সাঃ) এর চেয়েও বড় আলীম মনে করতেন। এ সমস্ত লোক কোন মতেই মুসলমানদের সম্মান ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু বলা হয় রাসুল (সাঃ) এর পর সমস্ত মিল্লাতের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম এবং মুসলমানদেরকে তাদেরই আনুগত্য করতে বলা হয়, কেননা তারা রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী ছিলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এখানেই অসঙ্গতি যে, তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এবং আলে মোহাম্মদের উপর দরুদ পাঠ করার সময় তাঁদের সাথে সমস্ত সাহাবাদের সামিল করেন। অথচ কোথায় আলে মোহাম্মদ, কোথায় সাহাবা। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আল্লাহ আলে

মোহাম্মদের মর্যাদা এবং অবস্থানকে জানেন এবং তাঁদের সেই মর্যাদা প্রকাশের জন্য সকলকে নির্দেশ দেন। রাসুল (সাঃ) এর সাথে আহলে বায়তের উপর দরুদ পাঠ কর। সেখানে আমাদের কি দায় পড়েছে সাহাবাদেরকে আহলে বায়তের স্থান দেওয়া বা তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়ার। অথচ আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপরে আহলে বায়েতকে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দান করেছেন। আমাকে অনুমতি দিন এর মূল কারন আমি বের করব। উমাইয়া এবং আব্বাসী খলিফাগণ যেহেতু আহলে বায়তের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতেন তাই তারা নবীর বংশের সন্তানদের ধ্বংস করেছে, দেশান্তরিত করেছে এবং তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন," কোন মুসলমানের নামাজ ততক্ষণ গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না আহলে বায়তের উপর দরুদ পাঠ করা হয়"। তাহলে আহলে বায়তের শত্রুতা পোষণকারী বা তাদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী, যারা, তারা কি ভাবে বৈধতা পেতে পারে?

যেহেতু আহলে বায়তের ফজিলত লুকানোর মত নয়। তাই কৌশলে উমাইয়া এবং আব্বাসীগন সাহাবীগণকেও আহলে বায়তের সাথে মর্যাদাগতভাবে ব্যালেন্স করে দিয়েছে এবং বলছে সাহাবা এবং আহলে বায়েত সমান মর্যাদা সম্পন্ন। কেন না সেই উমাইয়া এবং আব্বাসীদেরই প্রবীন কতিপয় লোক রাসুল (সাঃ) এর সাহচর্য্য পেয়েছিলেন এবং কতিপয় অল্প শিক্ষিত তাবেইনদেরকে তারা কিনে নিয়েছিলেন যাতে এ সব ব্যক্তিরা সাহাবাদের মর্যাদার ব্যাপারে কিছু মিথ্যা এবং মনগড়া হাদীস সংকলন করে। আর এই সব নকল নবীসরাই আব্বাসী এবং উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের ঘাড়ে তাদের প্রশাসন চাপিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। আমার কথার সাক্ষী স্বয়ং ইতিহাস। এই হযরত উমর যিনি তার রাজত্বকালের জন্য বিশ্বের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং একজন আপোষহীন এবং কঠোর ব্যক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছেন, সামান্যতম অপরাধের জন্যও বড় ধরণের দায়িত্বশীলকে অপসারণ করতে কুণ্ঠিত হননি অথচ তিনি মাবিয়ার সাথে গলায় গলায় ভাব রেখে চলেছেন। যে মাবিয়াকে আবু বকর নিয়োগ দিয়েছিলেন সেই মাবিয়াকে ওমর তার পুরো রাজত্বকালে বহাল তবিয়তে রেখেছেন। শত সহস্র অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা গায়ে মাখেন নি। এক কান দিয়ে শুনেছেন অন্য কান

দিয়ে বের করে দিয়েছেন। সামান্যতম কৈফিয়ত পর্যন্ত তলব করেননি। অথচ মানুষ এসে বলেছে মাবিয়া স্বর্ণ এবং রেশমের কাপড় পরিধান করেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) পুরুষদের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন। তখন ওমর শুধু এতটুকুন বলতেন, "আরে রাখ, সেত আরবের বাদশা।"

মাবিয়া বিশ বছর পর্যন্ত বরং তার চেয়েও বেশী দিন রাজত্ব করেছেন অথচ কারো পক্ষে সম্ভবই ছিল না তার বিরোধীতা করা বা তাকে অপসারণ করা। এবং যখন হযরত ওসমান খলিফা হলেন তখন তিনি বেশ কয়েকটি এলাকা মাবিয়ার অধীনে ন্যস্ত করেন। অবস্থাটা এই দাঁড়ায় যে সে প্রচুর অর্থ সম্পদ ও অধিক ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে। সৈনিকদের মাঝে নিজের পছন্দ মত লোককে কমান্ডিং পদে বসিয়ে রাখে। আরবের যত খারাপ, বদমাশ, চাটুকার, মোসাহেব ছিল সবাইকে তার চারপাশে স্থান দেয় যাতে প্রয়োজনের সময় উম্মতের ইমামদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। মিথ্যা অহমিকা, স্বৈরতন্ত্রের স্টীম রোলার দিয়ে শক্তির দাপটে প্রশাসনকে নিজের আয়ত্তে রাখা হয়। যাতে মৃত্যুর আগে সে তার ফ্যাসেক, মদখোর, জেনাকারী, ভোগবিলাসী প্রিয় পুত্র এজিদের জন্য মানুষের কাছ থেকে জোর পূর্বক আনুগত্য (বায়েত) নিতে পারে। এজিদের বায়েতের ব্যাপারটাও একটি বিরাট দুঃখজনক ঘটনা যা এখানে বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো আপনারা সেই সব সাহাবীদের মানুষিক অবস্থাটা বুঝুন যারা অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করে বনি উমাইয়াদের হুকুমতের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল যাতে কুরাইশরা খুশী হয় কেননা তাদের পছন্দ ছিল না যে, নবুয়াত ও খেলাফত উভয়টা বনি হাশেম গোত্রের হাতে থাকুক। (খেলাফত ও মুলুকিয়াত, মওদুদী, ইয়ামুল ইসলাম আহমদ আমিন)

বনি উমাইয়া প্রশাসনের কর্তব্যই ছিল বরং এটা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে যে যারা তাদের ক্ষমতার রাস্তাকে পরিষ্কার করে দিয়েছিল তাদের শুকরিয়া আদায় করা। আর শুকরিয়া জ্ঞাপনের ন্যুনতম উপায় হচ্ছে কিছু বর্ণনাকারীকে কিনে নেওয়া যারা তাদের মনিবের তুষ্টির জন্য খুঁজে খুঁজে অনির্ভরযোগ্য দুর্বল ও জাল হাদীস লিপিবদ্ধ করবে এবং তা শহরে–নগরে, অলিতে–গলিতে, গ্রাম–গঞ্জে

প্রচার করবে। যাতে করে কতিপয় সাহাবা তাদের মনিবদের মর্যাদা আহলে বায়েতদের মর্যাদার কখনও অধিক কখনও সমকক্ষ হয়ে পড়ে। সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কিত এই সব দুর্বল রাওয়ায়েতগুলি জাল। আল্লাহ্ পানা দাও! আল্লাহ্ সহায়, যদি এই সব বর্ণনাগুলি শরয়িতী দলিলগুলির আলোকে বিচার বা পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে সবই দুর্বল বা বানানো। তাছাড়া এগুলি কোন বিবেকবান মানুষ বর্ণনা করার সাহসই পাবে না। তবে হাঁ, যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে অথবা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়েছে তাদের কথা ভিন্ন।

আমি উদাহরণ স্বরূপ দুইটি উদাহরণ দিচ্ছি। ছোট সময় থেকে হযরত ওমরের প্রশংসা শুনে আসছি। এবং এটাও খুব প্রসিদ্ধ যে, হে ওমর তুমি' ন্যায় বিচার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছ আবার অনেকে বলে ওমরকে কবরের মাঝে সোজা খাড়া করে দাফন করা হয়েছে, যাতে তার মৃত্যুতে ন্যায়বিচার মরে না যায়। অর্থাৎ ওমরের ন্যায়পরায়নতা সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু সত্যিকার ইতিহাস বলে বিশ হিজরীতে যখন ওমর জনগণের মধ্যে বন্টন পদ্ধতি চালু করলেন তখন নবী (সাঃ) এর সুন্নতের কোন অনুসরণ তিনি করেননি এবং তা গ্রাহ্যও করেননি; কেননা রাসুলে কারীম (সাঃ) সকল মুসলমানের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে সকলকে সমানভাবে দেখতেন। কাউকে ছোট, কাউকে বড় ভাবতেন না। আবু বকরের সময়ও সেই পদ্ধতি চলে আসছিল। কিন্তু ওমর এক নতুন পদ্ধতি চালু করলেন। তিনি মোহাজেরদিগকে আনসারদের উপর, প্রভুকে গোলামের উপর, কোরাইশদেরকে সকল আনসারদের উপর, আরবদেরকে অআরবদের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং গোত্রকে আরেক গোত্রের উপর মর্যাদা দিতেন।

হে বিবেকবানগণ! তাহলে বুঝ এটা কি ন্যায় বিচারের লক্ষণ? এমনি ভাবে হযরত ওমরের জ্ঞানের ব্যাপারেও অনেক কথা শুনা যায়। তিনি তৎকালীন আরবে সব সাহাবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে বলা হয় এমন কি যখন রসুল (সঃ) এবং ওমরের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য হতো তখন আল্লাহ্ ওমরের পক্ষেই অনেক কোরানের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তাতে প্রমান করার চেষ্টা করা হয় ওমর কোরান হাদীসের বড় পন্ডিত ব্যক্তি

ছিলেন, অথচ ইতিহাস বলে তার খেলাফতের সময় কোন এক সাহাবী ওমরকে প্রশ্ন করেন- "হে আমিরুল মোমেনীন- আমি রাতে স্বপ্নদোষে অপবিত্র হয়ে পড়ি। তখন আমি পানি পাইনি তাহলে কি করব?" ওমর বললেন- "নামাজ ছেড়ে দাও।" পাশে বসা ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসের- তিনি বললেন, "না- তাইয়াম্মুম করে পড়তে হবে"। কিন্তু হযরত ওমর সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তাই আম্মারকে বললেন,- "তুমি আমাদের জন্য সেই কাজেরই সিদ্ধান্ত দাও যা তুমি তোমার জন্য কর।" (বুখারী- ১ম খন্ড-৫২) তাহলে বলুন ওমরের কোরানের তায়াম্মুমের আয়াতের কতটুকু জ্ঞান আছে? ওমরের রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাতের কতটুকু জ্ঞান হয়েছে? ওমর নিজেও বলেছেন, "আমি আলেম নই।" যদি আলী না থাকতো ওমর ধ্বংস হয়ে যেত। বেচারা মরতে মরতে মরে গেলেন কিন্তু "কালালার" হুকুম জানতেন না, এই জন্য জীবনে "কালালার" উপর নানানরকম বক্তব্য দিয়ে গেছেন যা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। (কিন্তু আমাদের ওলেমায় কেরাম ওমরকে আলেম সাব্যস্ত করার মধ্যেই ব্যস্ত আছেন।)

ওমরের সৌর্য, বির্য, বলিষ্ঠতা, বাহাদুরীর কথা জোর গলায় বলা হয়, এমনও বলা হয়, ওমরের ইসলাম গ্রহণে কোরাইশরা ভীত হয়ে পড়ে, মুসলমানদের শানশৌকত বৃদ্ধি পায়। এও বলা হয়, খোদা ইসলামের সম্মান ওমরের দ্বারা বৃদ্ধি করেছেন। অনেকে ত বলেই বেড়ায় যে, ওমর যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ করেনি রাসুল (সাঃ) ততদিন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারেননি। কিন্তু ইতিহাস এ কথা প্রমান করে না। ইতিহাসে ওমরের কোন বাহাদুরি খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসে খুঁজে পাইনি যে, বড় কেন কোন সাধারণ যোদ্ধাকেও ওমর হত্যা করেনি। বদর , ওহুদ, খন্দক কোন যুদ্ধেই এমন ঘটনা নেই। বরং ইতিহাসের সাক্ষী ভিন্নতর যে, উহুদের যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়াদের মাঝে ওমরও ছিল। হুনাইনের যুদ্ধেও পলাতকদের তালিকায় সেও ছিল। রাসুল (সাঃ) তাকে খায়বার বিজয়ের জন্য পাঠান কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। যতগুলো যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন সবগুলোতে আদিষ্ট থেকেছেন কিন্তু আদেশদানের ভূমিকায় যেতে পারেননি।

হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে উসামার নেতৃত্বে যে সেনাদল প্রেরিত হয় তাতেও তিনি সাধারণ সৈনিকই ছিলেন, অথচ উসামা ছিল মাত্র আঠারো বৎসরের যুবক। এরপর আপনারাই বলুন এগুলি কি বাহাদুরির নমুনা?

ওমরের তাকওয়া পরহেজগারীর ব্যাপারেও অনেক কথা শোনা যায় যেমন–ওমর আত্ম সমালোচনা এতই করতেন যে তিনি অনেক সময় খুবই ভেঙ্গে পড়তেন। "খোদা না করুন, ইরাকের রাস্তা সঠিক না রাখার কারণে ইরাকের কোন খচ্চরও যদি হোচট খায় তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।" অথচ ইতিহাস তার উল্টো সাক্ষ্য দেয়। তার মেজাজ এতই কড়া ছিল যে কেও যদি তাকে কোরানের কোন কিছু প্রশ্ন করতো তাকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলা হতো। মহিলারা তাকে দেখলে তার ভয়ে বাচ্চাদের লুকিয়ে ফেলতো। যখন রসুল (সাঃ) এর ইন্তেকাল হয় তখন মুক্ত তরবারী হাতে মদিনার পথে পথে তিনি ঘুরতে থাকেন এবং মানুষকে ধমক দিতে থাকেন যে যদি কেও মুহাম্মদ (সাঃ) মারা গেছেন বলে সে তার মাথা উড়িয়ে দেব এবং কসম খেয়ে খেয়ে মানুষকে বলতে থাকেন রসুল (সাঃ) মরেননি বরং তিনি মুসা (আঃ) এর মত খোদার কাছে মুনাজাত করতে গেছেন। অথচ এখানে তার খোদার ভয় কেন আসলো না? এভাবে প্রথম খলিফার সময় ফাতেমা (আঃ) এর ঘরে গিয়ে বলেছেন, "ঘরে যারা আছো বেরিয়ে আস, আর যদি আবু বকরের বায়য়াত না নেও, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।" *(ইমামিয়া ও সিয়াসৎ–কুতাইবা)* তখন মানুষ বলেছে–"আরে এখানে তো মা ফাতেমা আছেন।" ওমর বললেন–"থাকুক গিয়ে।" এখানে তার খোদার ভয় কোথায় গেল? তিনি কোরান ও সুন্নাহর অনুসরণ করেননি। তার খেলাফতের সময় এমন কতিপয় নির্দেশজারী করেন যা কোরান ও সুন্নাহর সরাসরি বিপরীত ছিল। *(আল–নস ও ইজতেহাদ)* তাহলে বুঝুন ,তার খোদার ভয় কতটুকু ছিল।

আমি শুধু ওমরের উদাহরণ এজন্যেই দিলাম তিনি অনেক বড় সাহাবী ছিলেন। আর খুবই সংক্ষেপে লিখলাম। কারণ বই এর কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নয়। আর এই সংক্ষিপ্ত লিখাতেই সাহাবাদের মানসিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ এবং সুন্নী আলেম ও ঐতিহাসিকদের

পরস্পর বিরোধী মনোভঙ্গীর ধরন বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একদিকে তারা মানুষকে সাহাবাদের সমালোচনা ও সন্দেহ করা থেকে বিরত রাখতে চায় অপর দিকে তারা তাদের লিখিত বইতে এমন সব হাদীস রাওয়াতে করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই সাহাবাদের ব্যাপারে সমালোচনা ও তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আমি মনে করি যদি সুন্নী আলেমরা এমন সব কথা না লিখতেন তাহলে সাহাবাদের সুনাম ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হতো না। যদি তারা এই সব হাদীসগুলো রাওয়ায়েত না করতেন, তাহলে সন্দেহ ও সাহাবীদের শ্রেণী বিন্যাস করার দরকার হতো না।

আমার এখনও নাজাফে আসরাফের আলেম জনাব আসাদ হায়দার সাহেব, "যিনি ইমাম সাদেক ও মযহাবে আরবায়া" গ্রন্থের লেখক তার সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনা মনে আছে। আমরা বসে শিয়া সুন্নীদের ব্যাপারে কথা বলছি। তিনি তার পিতার হজ্জের একটা ঘটনা বলছিলেন- যে, তার পিতা হজ্জে তিউনিসিয়ার আজ জায়তুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আলেমের সাক্ষাৎ পান। ঘটনা কমপক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। আসাদ হায়দার সাহেব বলেছেন, "যে আমার পিতা এবং সেই তিউনিসিয়ার আলেমের সাথে আলীর ইমামতের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল"। আমার পিতা আলী (আঃ) এর খেলাফতের হক দারিত্বের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করছিলেন। তিনি মোটামোটি চার পাঁচটি দলিল দেন। সেই তিউনিসিয়ার আলেম ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। আমার পিতার কথা শেষ হতেই আলেম সাহেব বললেন- "আরও প্রমাণ আছে না এতেই শেষ"। পিতা বললেন বাস এতেই যথেষ্ট।" তিউনিসিয়ার আলেম বললেন তাসবিহ বের কর এবং গণনা করতে থাক"- তখন সে আলী (আঃ) এর ইমামতের উপর এমন একশত দলিল উপস্থাপন করলেন যা আমার পিতা জানতেনই না। হায়দার সাহেব বলেন, "সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিতাবেই যে সমস্ত প্রমাণগুলো লিখা আছে তা যদি পড়তেন এবং অনুধাবন করতেন তাহলে আমার বিশ্বাস অনেক আগেই এর ফায়সালা হয়ে যেত"।

আমি আমার সত্তার কসম খেয়ে বলতে পারি-যদি মানুষ অন্ধ অনুকরণ ও গতানুগতিকতা ছেড়ে দিয়ে শুধু যুক্তি ও প্রমাণের উপর চলতো তাহলে ঠিকই হায়দার সাহেবের কথা পুরাপুরি সত্যে পরিণত হতো।

সাহাবাদের ব্যাপারে কোরআনের ভাষ্য

প্রথমেই আমি আরজ করবো আল কোরআনে আল্লাহ সাহাবাগণের ব্যাপারে যে সব প্রশংসা বাক্য বলেছেন, তা সেই সব সাহাবাদের জন্য যারা রাসুল (সাঃ) সাথে মহব্বত রাখতেন, তাঁর অনুসরণ করতেন, কোন লোভ লালসা ও চাপে নয় বরং শত প্রতিকুলতার মধ্যে থেকেও যারা আল্লাহর রাসুল (সঃ)কে সমর্থন করতেন, আল কোরআন সেই সব সাহাবাগণেরই প্রশংসা করেছে। ইনারাই সেই সাহাবা যাঁদের উপর খোদা সন্তুষ্ট আছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছেন।

সাহাবাদের এই দলটিকেই মুসলমানগণ, তাদের সম্পাদিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনের দ্বারা চিনেছে এবং তাদেরকে মন খুলে ভালবেসেছে। এসব সাহাবার নাম শুনার সাথে সাথে মুসলমানগণ (রাজিয়াল্লাহু আনহু) বলে। তাঁরা শিয়া সুন্নি সকলের নিকটই সম্মানিত। আমার আলোচনা সেই সব সাহাবী নামধারী মুনাফেকদের ব্যাপারে নয় যাদের কে শিয়া-সুন্নি সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে, মুনাফেক হিসাবে জানে। বরং আমার আলোচনা তাদেরকে নিয়ে যাদের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতদ্বৈততা পাওয়া যায়। কোরআনও অনেক স্থানে তাদের ধমক- দিয়েছে, সতর্ক করেছে। রাসুল (সঃ)ও সময় সময় তাদের সাবধান করেছেন এবং মানুষকেও তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। জিঁ হ্যা, শিয়া-সুন্নিদের মাঝে সবচেয়ে বড় মতপার্থক্য এই সব সাহাবীদের ব্যাপারেই। কারণ শিয়ারা এসব সাহাবীগণের কোন কথা বা কাজকেই বিনা বিচার বিশ্লেষণে গ্রহণ করে না। সর্বদাই তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে ও সন্দেহ করে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এসব সাহাবাগণকেও প্রথমোক্ত সাহাবাদের মতই সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমি সেই সব সাহাবীদের উপর আলোচনা এজন্য সীমিত রাখতে চাই, যাতে সব না হউক, অল্প হলেও, তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

আমি কথাগুলো শুধু এজন্যে বলছি যাতে, কেও একথা বলতে না পারে যে, আমি সেই সব আয়াতগুলোর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেছি যাতে তাদের প্রশংসা রয়েছে। আর শুধু সেই সব আয়াতগুলো এনেছি যেগুলোতে কোরআনে মজিদে তাদের শাসানো হয়েছে।

কুফরী অবস্থানে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার আয়াত

এরশাদ হচ্ছে এবং *"মোহাম্মদ একজন বার্তাবাহক বই আর কিছুই নন। তার আগে অনেক বার্তাবাহক গত হয়েছে। অতঃপর সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা উল্টো দিকে ঘাড় মুড়ে চলে যাবে? আর কেউ পৃষ্ঠা দর্শন করলে কখনও তাতে খোদার কোন ক্ষতি হবে না। আর অতি শীঘ্রই আল্লাহ শুকরকারীদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।"* (ইমরান-১৪৪ আয়াত)

উপরের এই আয়াতে বুঝা যায় হুজুরের তিরোধানের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়ার মত অনেকেই ছিল- এবং তারা হয়ত উল্টো দিকে চলেও যাবে। আবার কতিপয় সাহাবী সত্যের পথে অবিচল থাকবে তাও বুঝা যায়। *" আমার বান্দাদের মাঝে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ খুব কমই।"* সুরা সাবা-১৩।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুল (সঃ) এর সেই হাদীস যে "অধিকাংশ মুরতাদ হয়ে যাবে" সেটিও এর সামর্থক। আমি হাদীসগুলো পরে বর্ণনা করবো। উক্ত আয়াতে আল্লাহ মুরতাদের শাস্তির কথা বলেন নি বরং যারা টিকে থাকবে তাদের প্রশংসা করেছেন। তাদের বদলা দানের ওয়াদা করেছেন। আমরাও তাদের শাস্তি কি হবে বলতে চাই না। তবে এটাত ঠিক মুরতাদরা সাওয়াব এবং ক্ষমারযোগ্য নয়।

সাহাবাগণের সম্মান রক্ষার্থে কোরআনের ব্যাখ্যাকারকগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত 'তুলাইহা, সুজা ও আসওয়াছে' আনাস এর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যা ভুল। কারণ হলো- তারা রসুল (সাঃ) এর জীবদ্দশাই মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী করেছিল। নবী (সঃ)ও তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষে পরাস্ত করেছিলেন। ঠিক এভাবে এই আয়াত দ্বারা মালেক বিন নোওয়াইরা এবং তার অনুচরগণেরও উদ্দেশ্যে নয় যারা আবু বকরকে জাকাত দানে অস্বীকার করেছিল। কারণ তারা জাকাতের

অস্বীকারকারী ছিলেন না বরং আবু বকরের কাছে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। "যে যতক্ষণ আমরা আসল ঘটনা না জানবো ততক্ষণ তারা দাবী করেছিলেন, জাকাত দেব না।" তাদের অস্বীকারের কারণও স্পষ্ট, তাহলো তারা রাসুল (সাঃ) এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশ নিয়েছিলো এবং গাদীরের খুমে হুজুর (সাঃ) যখন হযরত আলী (আঃ) এর খেলাফতের ঘোষণা দেন তখন তারা আলীর (আঃ) এর বায়াত নেয় (আবু বকর ও ওমর বায়াত নেয়) হঠাৎ করে মদীনা থেকে দূত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের খবরের সাথে সাথে আবু বকরের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করতে যায় তখন তারা সবাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে "আমরা তো আলীর বায়াত নিয়েছি মাঝখান থেকে আবু বকর কোত্থেকে আসল?" ইতিহাস সাহাবাদের অসম্মান করতে চায়নি তাই মূল ঘটনার গভীরে যেতে চায়নি, তাছাড়া মালেক এবং তার সকল সাথী মুসলমান ছিল যার স্বাক্ষ্য স্বয়ং ওমর, আবু বকরও দিয়েছেন। সাহাবাদের একটি দলও সাক্ষী দিয়েছিল। খালেদ যখন মালেককে হত্যা করে তখন তারা এর ঘোর বিরোধীতা করেছিল, তিরস্কার করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী–আবু বকর নিহত মালেকের ভাই মুতামিমের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল এবং বায়তুল মাল থেকে তার ক্ষতিপূরনও আদায় করেছিল। যদি মালেক মুর্তাদ হতো তাহলে তার হত্যা ওয়াজেব ছিল। তারজন্য ক্ষমা চাওয়া বা সরকারী অর্থ ভান্ডার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই বুঝা যায় এই আয়াত দ্বারা মালেক ও তার সাথীরা উদ্দেশ্য নয়।

তাই বুঝা যায় এই মুরতাদের আয়াতের উদ্দেশ্য সেই সব সাহাবী যারা মদীনাতে হুজুর (সাঃ) এর সাথে জীবন যাপন করেছেন এবং তার ইন্তেকালের পর কোন কারণ ছাড়াই মুর্তাদ হয়ে গেছে। রাসুল (সাঃ) এর হাদীসেও তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইতিহাসও প্রমাণ করে যে রাসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তারা কারা যারা মুর্তাদ হয়ে যায়, আর কারা উত্তম। মাত্র কতিপয় সাহাবী বিশুদ্ধ ছিল।

জিহাদের আয়াত

এরশাদ হচ্ছে "হে ঈমানদারগণ- "তোমাদের হলো কি যে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা জমিনকে আঁকড়ায়ে পড়ে থাক- তোমরা কি আখেরাতের জীবনের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে অধিকতর পছন্দ কর? দুনিয়ার জিন্দীগির মূল্য আখেরাতের তুলনায় খুবই সামান্য! যদি তোমরা খোদার রাস্তায় অভিযানে বের না হও তাহলে তোমাদেরকে শক্ত শাস্তি পেতে হবে। দুনিয়ায় তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে বসিয়ে দিবেন। এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।' সূরা -(তওবা ৩৮, ৩৯)।

উল্লেখিত আয়াত সুষ্ঠুভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, জেহাদের ময়দানে যেতে সাহাবা কেরামের অনেকেই গড়িমসি করছিল। এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশের প্রতি তাদের বেশ টান ছিল অথচ দুনিয়ার জিন্দীগী যে ক্ষণস্থায়ী তা তারা ভাল করে জানতেন। অবস্থা এতটাই গড়িয়েছিল যে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির ধমক দেওয়ার সাথে সাথে প্রকৃত মোমেনদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয় যাহা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সাহাবারা একবার নয় অনেক বার জিহাদ থেকে নিজেদেরকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের আয়াত বেশ কয়টা আছে। যেখানে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃত মোমেনদেরকে স্থলাভিষিক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে *"এবং যদি তোমরা খোদার পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে খোদাও অন্যদেরকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না"।* সূরা মোহাম্মদ, ৩৮ আয়াত) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, *"হে ঈমানদারগণ তোমাদের কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন "যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যাঁরা তাঁকে ভালবাসবে, তারা মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।*- সূরা মায়েদা-'৫৪

আমরা যদি এই সব আয়াতগুলি খুঁজে বের করি তাহলে কতিপয় সাহাবার উদাসীনতা, অর্বাচিনতা ও নাফরমানীর অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাব। আল কোরআন এ কথা গুলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ঘোষণা দিয়েছে- *"এবং অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন এক দল হউক যারা ভালোর দিকে মানুষকে ডাকবে, ভালকাজের আদেশ দিবে; অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে এবং তারাই হবেন সফলকাম। তোমরা তাদের মত হইও না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কাল হবে; যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনয়নের পর তোমরা কি সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর; যেহেতু তোমরা কুফরী করতে॥"*(আল্ ইমরান আয়াত ১০৪, ১০৫, ১০৬)।

প্রত্যেক বিজ্ঞ আলেম জানেন যে, এই আয়াতগুলি সাহাবায়ে-কেরামদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, খবরদার! প্রকাশ্য প্রমাণাদি আসার পরও বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক বিবাদ থেকে বাঁচ, অন্যথায় কিয়ামতের দিন বড় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আর এই আয়াতগুলি সাহাবাদের কে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, এক দল সৌভাগ্যবান হবেন যারা কিয়ামতের দিন মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দারাই তাঁর রহমতের যোগ্য। আর কতিপয় সাহাবা যারা ঈমান আনার পরও মোরতাদ, তাদের জন্য আল্লাহ্ ভয়াবহ শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। প্রত্যেক ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রই জানেন-হুজুর (সাঃ) এর ইনতিকালের পর সাহাবাদের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়। অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে। রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যে জন্য তার ফলাফল মুসলমানদের জন্য চরম অপমান ও দুঃখ দুর্দশা। ইসলামের শত্রুরা এ সুযোগের সদব্যবহার করেছে।

৩।আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরাপুরি সমর্পণ

এরশাদ হচ্ছে," *যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় বিগলিত হবার সময় কি আসেনি, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য তাঁদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে?*

পূর্বে যাঁদের কেতাব দেওয়া হয়েছিল তাঁদের মত এরা যেন না হয়।একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অতএব, তাই তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, এবং তাদের অধিকাংশই ফ্যাসেক? সূরা হাদিদ–১৬)

প্রখ্যাত মোফাচ্ছের জালাল উদ্দিন আল–সিয়ুতি তাফছিরে দুর্‌রে মনছুরে লিখেছেন যে, সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করার পর এতদিনের দুঃখ–কষ্টের পর তাঁরা আরাম আয়েশের জীবন শুরু করেন। তাই যখন তাদের অনেকেই আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে বলে মনে হল; তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। *"ঐ সব ঈমানদারদের জন্য এখন ও কি সময় আসেনি?"* ।অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণিত কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিলের সতের বৎসর পর মুহাজিরদের অন্তরে যখন অলসতা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাজিল করেনঃ– "ঈমানদারদের জন্য এখন কি সময় আসেনি"।

একটু ভেবে দেখুন ঐ সমস্ত সাহাবা সুন্নীদের মতে, রাসুল (সাঃ) এর পর যাদেরকে সর্বোত্তম মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সেই সাহাবাদেরই অন্তর সতের বছর ধরে অহী অবতীর্ণ হওয়ার পরও যদি আল্লাহ্ ও কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত না হয়ে থাকে যে জন্য খোদা এই পাষাণদের কে 'ফ্যাসেক' বলে গালি দিয়েছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী ধমক দিয়েছেন কিয়ামতের শক্ত শাস্তির, তাহলে সেই কোরাইশ সর্দারগণ যারা হিজরতের পর সপ্তম সালে মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছে তাদের অন্তর নরম হওয়া কি আদৌও সম্ভব? তাহলে তারা কি এই শাস্তির আওতাভুক্ত নয়? নমুনা স্বরূপ বোঝার স্বার্থে কোরান শরীফের কয়েকটি আয়াত এখানে উত্থাপন করলাম, যাতে প্রমাণিত হয়, যে ঢালাওভাবে সমস্ত সাহাবাই, সুন্নীদের বিশ্বাসানুযায়ী সত্যপন্থী ছিলেন না। এখন যদি আমরা কিছু হাদীসে রাসুলের প্রতি দৃষ্টি দেই ,তাহলে এর চেয়েও দশগুন প্রমাণ বেশী পাওয়া যাবে কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্য তিন/চারটা হাদীস উল্লেখ করলাম। কারো যদি আরো বেশী পাওয়ার ইচ্ছা হয় হাদীস গ্রন্থ খুলে দেখে নিন বা অন্বেষণ করুন।

সাহাবাদের ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) যা বলেছেন

হাউজে কাওসার সম্পর্কিত হাদীস

রাসুল (সাঃ) বলেন– "আমি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। দেখলাম আমার সামনে একদল লোক যাদের সবাইকে আমি চিনলাম এবং মধ্যখানে একজন লোক এসে দাঁড়ালো, অতঃপর বললোঃ চল আমরা যাই, আমি বললাম, "কোথায় যেতে হবে"? সে বললো আল্লাহর কসম! "দোজখে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম "এদের দোষ কি"? সে বললো "আপনার পর এরা সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল (তারা তাদের সাবেকী জায়গায় ফেরত গিয়েছিল।) এবং আমি আশা করি অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মুক্তি পাবে"। রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন "আমি তোমাদের সবার আগে হাউজে তোমাদের সম্মুখে থাকব। যে আমার নিকট দিয়ে যাবে সে হাউজের কাছে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে যাবে। যে একবার পান করবে তার আর পিপাসা লাগবে না। সেই হাউজের কাছে, আমার কাছে কিছু লোক আসবে আমি তাদেরকে চিনি, তারাও আমাকে ভাল করে চেনে। অতঃপর আমার এবং তাদের মাঝে একটা দেওয়াল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে", অতঃপর আমি বলব "আরে এরা তো আমার সাহাবী।" তখন উত্তরে বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার ইন্তেকালের পর তারা কি কি করেছে।" তখন– আমি বলব "আফসোস তাদের উপর যারা আমার মৃত্যুর পর দ্বীনের ভিতরে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেছে"। *বোখারী ৪র্থ খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা, ১৫৬ পৃষ্ঠা এবং ২য় খন্ড ৩২ পৃষ্ঠা। মুসলিম শরীফ ৭ম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা হাদীস উল হাউজ।*

এই হাদীসগুলি যা আহলে সুন্নাতের ওলেমারা তাদের "সিহা সিত্তাতে" লিখেছেন অতএব এগুলিতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, অধিকাংশ সাহাবাই দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে বরং হুজুর (সাঃ) এর পর তাদের অধিকাংশ মোরতাদ, হয়ে গিয়াছিল, মাত্র কিছু সাহাবী ছাড়া। উপরোক্ত হাদীস সাহাবীদের তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মোনাফেকদের উপর প্রযোয্য হবে না। কেননা রেওয়ায়েতে রয়েছে হুজুর (সাঃ) বলবেন, "এরা তো আমার সাহাবী" বরং এ হাদীস গুলি মূলতঃ পূর্বে উল্লেখিত আয়াত সমূহের তফসির যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তারা মোরতাদ হয়েছে এবং তাদের জন্য শক্ত শাস্তি অপেক্ষা করছে।

দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত হাদীস

রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের এবং তোমাদের সাক্ষীদের নেতা এবং খোদার কছম! আমি এখনও আমার হাউজে কাওসারকে দেখছি, এবং আমাকে জমিনের ভান্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, "সেই কথায় ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা মুশরেক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি অবশ্যই ভয় পাই যে, তোমরা আমার পরে পার্থীব লালসায় একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হবে"। *(সহী বাখারী ৪র্থ খন্ড ১০১ পৃষ্ঠা)* রাসুল-এ- খোদা (সঃ) খুবই সত্য কথা বলেছিলেন। তাঁর পরে সাহাবাগণ এতটাই পার্থীব লালসার শীকার হন যে, এজন্য তারা পরস্পরে যুদ্ধ করেছে, একে অন্যকে কাফের ফতুয়া দিয়েছেন, অনেক বুর্জুর্গ সাহাবী স্বর্ণ চান্দীর ভান্ডার গড়ে তুলেছে। ঐতিহাসিকগণ যেমন মাসুদী তার "মরুজে যাহাব" গ্রন্থে এবং তাবারি সহ অন্যান্যরা লিখেছেন যে, এক যুবায়ের এর কাছেই পঞ্চাশ হাজার দিনার, এক হাজার ঘোড়া, এক হাজার গোলাম এবং বসরা, কুফা, মিসর সহ অন্যান্য স্থানে অনেক কৃষি জমি ছিল। *(মুরুজে যাহাব মাছউী ২য় খন্ড ২৪১ পৃষ্ঠা)* এভাবে তালহার শুধু ইরাকের জমি থেকে এত ফসল উৎপন্ন হত যে, দৈনিক হাজার দিনার মূল্যের, আবার অনেকে বলেন তার চেয়েও বেশী। *(ঐ)* আব্দুর রহমান বিন আউফের নিকট এক শত ঘোড়া, এক হাজার উট, দশ হাজার দোমবা-ছাগল ছিল। তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক অষ্টমাংশ যা তার স্ত্রীদের হক হয় যা চার স্ত্রীকে হক বন্টন করে দেওয়া হয়, প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে চৌরাশি হাজার দিনার পড়েছিল।

হযরত ওসমান মৃত্যুর সময় দেড় লক্ষ দিনার রেখে যান। জন্তু জানোয়ার এবং কৃষিযোগ্য, অকৃষিযোগ্য ভূমি এত বেশী রেখে যান যার পরিমাপ অসম্ভব। জায়েদ বিন সাবেত স্বর্ণ চান্দীর এত বড় বড় বার রেখে যান যা কুড়াল দ্বারা কাটতে হতো। এবং এই স্বর্ণ কাটতে কাটতে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। তাছাড়াও অন্যান্য মালামাল ও কৃষি ভূমি যার দাম এক লক্ষ দিনার। *(মরুজে জাহাবে মাসুদি ২য় খন্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা।)* তাদের দুনিয়া প্রীতির উদাহরণ এই কয়েকটাই যথেষ্ট, ইতিহাসে তো, এর স্বাক্ষী অনেক। কিন্তু আমি আমরা লেখা বৃদ্ধি করতে চাই না। শুধু কথার যথার্থতার জন্য এইটুকুনই যথেষ্ট। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, রাসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর কতিপয় সাহাবাদের মাঝে দুনিয়ার প্রীতি কত বেশী ছিল।

সাহাবাদের সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মতামত

১। তাদের সাক্ষ্য যে তারা নিজেরাই রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাতের পরিবর্তন করেছেন।

হযরত আবু সাইদ খুদরী বলেছেন- "জনাব রাসুল (সাঃ) ঈদুল ফেতর বা ঈদুল আজহার নামাজের জন্য যখন বের হতেন তখন মাঠে প্রথমেই নামাজ পড়তেন। অতঃপর জনতার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে যেতেন। লোকজন বসেই থাকতো এবং তিনি ওয়াজ করতেন। আদেশ নির্দেশ দিতেন। বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা করতেন। অথবা কোন বিষয়ের নির্দেশ দিতে চাইলে, তা দিতেন অতঃপর চলে আসতেন। আবু সাইদ বলেন এই পদ্ধতিটা হুজুরের পরেও ছিল। কিন্তু যখন মারোওয়ান মদীনার গর্ভনর হয় তখন আমিও তার সাথে ঈদুল ফেতর বা ঈদুল আজহায় নামাজ পড়ার জন্য যাই। যখন নামাজের স্থানে পৌছালাম তখন দেখলাম কাছির বিন সাল্লাত একটা মিম্বার বানিয়ে রেখেছেন। আর মারোয়ান নামাজের পূর্বেই সেই মিম্বারে যেতে চাইলেন। আমি তার পিছন থেকে জামা টেনে ধরলাম, সে টান দিয়ে আমার থেকে জামা টেনে নিলেন এবং নামাজ শেষ হওয়ার আগেই খুতবা শেষ করে দিলেন। আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তুমি রাসুল (সাঃ) এর প্রকৃত পদ্ধতি পরিবর্তন করেছো"। মারোয়ান বললেনঃ "আবু সাইদ তুমি যা জান সে সময় তো অনেক আগেই চলে গেছে।" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা সেটা থেকে উত্তম যা আমি জানি না ।" তখন মারোয়ান বলল, "নামজের শেষে লোকজন তো আর আমাদের জন্য বসে থাকবে না তাই খুৎবাটাকে আগে করে নিলাম"। *(বোখারী ১১ম খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা কেতাবুল ঈদাইন)* আমি কারণগুলি খুব অনুসন্ধান করেছি, হুজুরের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া পদ্ধতি কেন পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষে, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছি যে, সমস্ত উমাইয়া ব্যক্তিবর্গ যারা অধিকাংশই রাসুল (সাঃ) এর সাহাবা ছিলেন তাদের গুরু ছিল মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, যাকে আহলে সুন্নাতগণ ওহির লেখক বলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় বরং মানুষকে বাধ্য করা হতো যেন সকল

মসজিদের মিম্বর থেকে হযরত আলী (আঃ) এর উপর কুৎসা রটনা ও অভিসম্পাত করা হয়, যেমন ঐতিহাসিকগণ বলেছেন। আর সহী "মুসলিম শরীফে" "ফাজায়েলে আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)" অধ্যায়ে এমনি লেখা হয়েছে যে মাবিয়া তার সমস্ত প্রদেশের গভর্ণরদের উপর এই নির্দেশ জারী করেন যে সকল মসজিদের খতিবগণ মিম্বার থেকে আলীর উপর অভিসম্পাত করাকে যেন তাদের দায়িত্ব মনে করেন। সাহাবাগণ যখন এই দৃষ্টতাপূর্ণ কাজের বিরোধিতা করে তখন মাবিয়া তাদের হত্যা করে এবং তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দেয়। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাজার ইবনে আদী ও তাঁর সাথীকে শুধু এই কারণেই হত্যা করা হয়। আবার অনেককেই জীবন্ত কবর দেওয়া হয় কারণ তারা আলীর উপর অভিসম্পাত দিতে অস্বীকার করে। মাওলানা আবুল আলা মওদূদী তার কিতাব *"খেলাফত ও মুলকিয়াতে"*হাসান বাসরী (রাঃ) এর বরাত দিয়ে লেখেছেনঃ চারটি বৈশিষ্ট্য মাবিয়ার ভিতর এমন ছিল যদি তার একটিও তার ভিতরে থাকে তাহলে তা মাবিয়ার ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিষয়গুলো হলো এই ঃ

(১) সাহাবায় কেরামদের পরামর্শ ছাড়া ক্ষমতা দখল।

(২) তারপর মদখোর, ভোগ ও বিলাসী পুত্র এজিদকে খলিফা হিসাবে মনোনিত করা। সে রেশমি কাপড় পরিধান করতো এবং বাদ্য যন্ত্র বাজাতো।

(৩) জিয়াদকে নিজের ভাই ঘোষণা দেওয়া অথচ রাসুলে খোদা (সাঃ) এর হাদীস হলোঃ "সম্মানিত স্বামীর জন্যে সন্তান এবং বেশ্যার জন্য কিছুই নাই"।

(৪) হুজর ইবনে আদী এবং তার সাথীদের হত্যা। ধিক মাবিয়া ধিক! *(ঐ ১০২ পৃষ্ঠা।)*

কতিপয় ঈমানদার সাহাবা নামাজের পর সরাসরি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতেন যাতে করে আলী এবং আহলে বায়েতের উপর অভিসম্পাত করে যে খুৎবা দেয়া হয় তা শুনতে না হয়। যখন বনি উমাইয়ারা এটা বুঝলেন যে মানুষ নামাজের পরে এই জন্যে বেরিয়ে যায় তখন তারা রসুল (সাঃ) এর সুন্নাতকে পরিবর্তন করে খুতবাকে

নামাজের আগে নিয়ে আসেন যাতে মানুষকে বাধ্য হয়ে এগুলো শুনতে হয়। এরা কোন ধরনের সাহাবা ছিলেন যারা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে রসুল (সাঃ) এর সুন্নত তো বটেই এমন কি খোদাই বিধান পরিবর্তন করতো এবং এমন ব্যক্তির উপরে লানত করতো যাকে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছেন যার উপরে দুরূদ ও সালাম পেশ করাকে ওয়াজীব বলেছেন। নবী (সাঃ) বলেছেন আলীকে মহব্বত করা ঈমানের অংশ এবং তার সাথে শত্রুতা করা মুনাফেকী। *(মুসলিম ১ম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)* কিন্তু এই সব সাহাবা রাসুল (সাঃ) এর সুন্নতকে বদলে দেয়। নবীর কথা শুনেছে ঠিকই কিন্তু তা অমান্য করেছে যেমন আলীকে ভাল বাসা তার উপরে দুরূদ পাঠ করা এবং তার অনুসরণ করার পরিবর্তে ষাট বছর পর্যন্ত তাকে গালাগালি ও অভিসম্পাত করেছে।

যেভাবে মুসা (আঃ) এর সাথীগণ পরামর্শ করে হারুনকে হত্যা করতে চেয়েছিল ঠিক সেভাবে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথীগণ মোহাম্মদের হারুণকে হত্যা করেছিল। তাঁর বংশীয় সন্তানদিগকে পাহাড়ের গুহা থেকে বের করে হত্যা করা হয়। তাঁদেরকে দেশান্তরিত করা হয়, তাঁদেরকে পদচ্যুত করা হয়, জনতাকে বলে দেওয়া হয় তাদের নামের অনুকরণে সন্তানের নাম যাতে না রাখা হয়। এতেও তারা শান্ত হয়নি বড় বড় সাহাবাদেরকে ধরে এনে আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে কুৎসা গাওয়ানো হয়, অন্যথায় হত্যা করা হয়। খোদার কসম! আমি যখন "সেহাসেত্তা" পড়ি এবং তাতে যখন পড়তে থাকি সে রসুল (সাঃ) তাঁর এই ভাই এবং চাচার ছেলে আলীকে খুবই ভাল বাসতেন, সকল সাহাবীদের উপর আলী (আঃ)কে প্রাধান্য দিতেন, আলী (আঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন, "হে আলী! আমার সাথে তোমার সম্পর্ক যেমন মুসার সাথে হারুনের সম্পর্ক শুধু পার্থক্য এতটুকু আমার পরে কোন নবী আসবে না"। *(বোখারী ২য় খন্ড ৩০৫ পৃষ্ঠা মুসলীম ২য় খন্ড ৩৬০ পৃষ্ঠায়) মুস্তাদারাক, হাকীম ৩য় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)* এবং আলীকে বললেন- "হে আলী! তুমি আমার থেকে আমি তোমার

থেকে।" *(বোখারী ২য় ৭৬) তিরমিজি সানান ইবনে আনাস* অন্য এক জায়গায় বলেছেন- "আলীকে ভালবাসাই ঈমান, তার প্রতি বিরাগ- নেফাক/ *মুসলিম -১ম সানান নেসায়ী ৬ষ্ঠ খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। সহী তিরমিজি ৮ম খন্ড।* অন্য জায়গায় বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর আলী তার দরজা"। *(সহী তিরমিজি ৫ম খন্ড পৃঃ ২০১, মুসতাদারাক হাকীম- ৩য় খন্ড ১২৬ পৃঃ)* আরও বলেছেন-"আমার পর আলী প্রত্যেক মোমেনের ওয়ালী"। আরও বলেন-"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। হে খোদা, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখে তুমিও তার সাথে শত্রুতা রাখো"। *সহী মুসলিম-২য় খন্ডঃ পৃষ্ঠা -৩৬২, মোসতাদারাক হাকীমঃ ২য় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা, মাসনাদ ইমাম হামবালঃ ৪র্থ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।* এভাবে আমি আলী সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) যে সব হাদীস ও ফজিলতের কথা বলেছেন তা যদি লিখতে যাই যে, হাদীসগুলো শিয়া সুন্নি সকলের কাছেই সমান ভাবে বিশ্বস্ত, তাহলে স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাহলে আপনিই বলুন, সাহাবীগণ কি তাঁর এই গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না? যদি জানতেনই, তাহলে মিম্বার থেকে কেন তাকে অভিসম্পাত করা হতো? কেনো তারা আলী ও আলে আলীর শত্রু হয়? কেন তাঁর সাথে যুদ্ধ হয়- কেন তাঁকে হত্যা করা হয়?

ঐ সব লোকদের এই ধরনের আচরনের পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তা খুঁজে বের করার যত চেষ্টাই করি-ততই একটা বিষয় আমার পরিষ্কার হয়ে যায়, আর তা হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি লোভ, দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে মুরতাদ হওয়া এবং তাদের পুর্বেকার অবস্থানে ফিরে যাওয়া।

আবার এও চেষ্টা করা হয় যেন এই সব ধৃষ্টতাপূর্ণ অভিযোগগুলো সাধারণ সাহাবীদের উপর দিয়ে চলে যায়, বড় বুজুর্গ সাহাবীদের ঘাড়ে না চাপে। কিন্তু আফসোসের সাথে আমাকে বলতে হয়, সেই সব বড় বড় সাহাবীদেরই এসব কাজে নষ্টের গুরু হিসেবে পাওয়া

যায়। কারণ ফাতেমার ঘর, ফাতেমাসহ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যারা যায় তাদের মধ্যে ওমর বিন খাত্তাব এই ধমকি দিয়েছিল। আর সর্ব প্রথম আলীর সাথে যারা যুদ্ধ করে তাঁদের মধ্যে তালহা, যুবাইর, উম্মুল মোমেনিন আয়েশা, মাবিয়া, আমর বিন আসই ছিলো।

আমার আশ্চর্য লাগে, আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ কি করে বলেন সমস্ত সাহাবা ন্যায়বিচারক ছিলেন এবং তাদের উপর এজমা করে? আর সবার নামের সাথেই (রাঃ) লাগিয়ে দেয় এবং কোন বাদ বিচার ছাড়া প্রত্যেকের উপরই দরুদ সালাম পেশ করে। আবার অনেকে ত এও বলে যে "শুধু এজিদকে লানত কর অন্যদের ছেড়ে দাও" কিন্তু এইসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটানো এবং বেদআত প্রবর্তনের সাথে এজিদের কি সহযোগীতা ছিল যা কোন যুক্তিতে ধরা পড়ে না।

আমি আহলে সুন্নাতদের কাছে আবেদন করতে চাই, যদি সত্যিই আপনারা সুন্নাতের অনুসারীই হয়ে থাকেন তাহলে কোরান সুন্নাহ যাদের ফাসেক, মুর্তাদ ও কাফের বলেছে আপনারাও তাদের তাই বলুন। এটাই ইনসাফ। হুজুর (সাঃ) বলেছেন– "যে আলীকে দোষারোপ করলো, সে আমাকে দোষারোপ করলো, আর যে আমাকে দোষারোপ করলো সে খোঁদাকে দোষারোপ করলো। আল্লাহ তাকে মুখ নীচু করে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।" *(সহী বুখারী– ২য় খন্ড, সহী তিরমিজী-৫ম খন্ড সুনান ইবনে মাজা, সহী মুসলিম-২য় খন্ড, মুসতাদরাক হাকীম-৩য় খন্ড)।* এত গেল সেই ব্যক্তিদের শাস্তি, যারা আলীকে দোষারোপ করবে, গালীগালাজ দেবে। তাহলে আপনিই বলুন যারা আলী (আঃ) এর সাথে বেঈমানী করলো, যুদ্ধ করলো, হত্যা করলো তাদের কি ধরণের হাশর হবে? আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এই সত্য সম্পর্কে কি মনে করে, তাদের অন্তরে কি তালা লেগে গেছে? বল, হে আল্লাহ! দয়া করে আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত হতে রক্ষা করুন!

সাহাবীরা এমন কি নামাজেও পরিবর্তন করেছে

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রসুল খোদা (সাঃ) এর জামানায় যে জিনিসগুলো আমি সব চাইতে বেশী ভাল জানতাম তার প্রথম হচ্ছে নামাজ"। আনাস বলেন, "যে জিনিসগুলো তোমরা নষ্ট করেছ, তার মধ্যে কি নামাজ ছিল না"? যেগুলো তোমরা নষ্ট করেছ সে সম্পর্কে জহরি বলেন, "আমি দামেস্কে আনাস ইবনে মালিকের কাছে গিয়ে দেখি যে তিনি কাঁদছেন," আমি প্রশ্ন করলাম, "তুমি কাঁদছ কেন"? তিনি বললেন, "আমার জীবনে যে নামাজ শিখেছিলাম তাকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে"। *(বুখারী ১ম খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠা। বুখারী ২য়-খন্ড ৫৪-পৃষ্ঠা। মুসলিম-১ম খন্ড ২৬০-পৃষ্ঠা)* কারও যেন এই সন্দেহ না হয় যে মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাবেইনগণ নামাজকে পরিবর্তন করেছেন। এই জন্যে আমি এখানে বলতে চাই সুন্নাতে রাসুলের মাঝে সবচেয়ে প্রথম যে নামাজের পরিবর্তন করা হয় তা মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান এবং উম্মোল মোমেনিন হযরত আয়শা করেন। (বোখারী ও মুসলিম উভয়টায়) মিনার সফরের সময় রসুল (সাঃ) দুই রাকাত করে নামাজ পড়তেন, তার পর আবু বকর ও উমর দুই রাকাত করে পড়েন, খেলাফতের প্রথম দিকে উসমান দুই রাকাত পড়েন কিন্তু পরে চার রাকাত পড়তে শুরু করেন। *(বোখারী ২য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা মুসলিম ১ম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা।)* মুসলিম শরীফে আছে যে জহরী বলেন "আমি উরুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি? আয়শাও কি সফরের সময় চার রাকাত পড়েন। উরুয়া বলেন, "তিনি উসমানের মত বদল করে নিয়েছেন? *(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা)।*

হযরত ওমরও নবীর সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর উপরও ইজতিহাদ করতেন এবং বদল করতেন। শুধু তাই নয় তিনি তো কোরানের বিপরীত ইজতেহাদ করেন, নিজস্ব মতের উপর হুকুম দিতেন। ওমর সেই সাহাবীকে নামাজ পড়তে বারণ করেন, যে রাতে অপবিত্র হয়ে পড়ে এবং পানি পায়নি। অথচ কোরানের নির্দেশ হলোঃ *"যদি পানি না পাও, পবিত্র মাটি ব্যবহার কর"* সূরা মায়েদা।

বোখারীর বর্ণনায় অপবিত্র ব্যক্তির জন্য, নামাজ অধ্যায়ে বর্ণনাকারী বলেছেন- আমি শাকীক বিন সালমা থেকে শুনেছি তিনি বলছেন- "একদিন আমি আবদুল্লাহ এবং আবু মুসার সাথে ছিলাম তখন আবু মুসা বলেন- "হে আব্দুর রহমান যদি কেও নাপাক হয়ে যায় আর পানি না পায় তখন সে কি করবে?" তখন আব্দুল্লাহ বললেন- "যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে দাও।" তখন আবু মুসা বললেন- "তাহলে এ সম্পর্কিত আম্মারের প্রশ্নের জবাবে রাসুল (সাঃ) আম্মারকে যে জবাব দিয়েছিলেন আম্মারের সে কথার কি করবো- আব্দুল্লাহ বললেন- "ওমর এই কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি।" তখন আবু মুসা বললেন- "ভাল, আম্মারের কথা বাদ দাও কিন্তু কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপারে (তাইয়াম্মুম) কি বলবে? কথা শুনে আবদুল্লাহ কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে শুধু এতটুকু বললেন- "যদি পানি না পাওয়ার কারণে তুমি তায়াম্মুমের হুকুম দিয়ে দাও তাহলে একজন ঠান্ডার ভয়েও ঠান্ডা পানি থেকে বিরত হয়ে তাইয়াম্মুম করবে।"

তখন আমি (সাথী) শাকীককে বললাম- "তাহলে এই কারণেই আব্দুল্লাহ ঘৃনিত- বললেন "হয়ত তাই!" *বোখারী ১ম খন্ড।*

সাহাবাদের, নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান

আনাস বিন মালিক বলেন- রাসুল (সাঃ) এক আনসারকে বললেন- "আমার পরে তোমরা কতিপয় বড় বড় সাহাবার স্বার্থপরতার ঘটনা দেখবে কিন্তু তা থেকে সেই পর্যন্ত সবুর করবে- যতক্ষণ হাওজে কাউসারের নিকট আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ না হয়"। আনাস বলেন, "কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরতে পারিনি"। *বোখারী ২য় খন্ড।*

আল আলী বিন আল মুসাইয়াব তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন- আমার পিতা বলেন- "আমি আল বারা বিন আজবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আরজ করি। যে আপনি কত সৌভাগ্যবান যে আপনি রাসুল (সাঃ) এর সংস্পর্শ পেয়েছেন, বায়আতে রেজওয়ানে অংশ নেন"। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা তুমি কি জান, "আমরা রাসুল (সাঃ) এর পর তার সুন্নাতের কি কি পরিবর্তন করেছি"। *বোখারী ৩য় খন্ড।*

বারার মত বড় সাহাবী, যিনি গাছের নিচে রাসুল (সাঃ) এর বায়াতের সময় তার সাথে ছিলেন এবং আল্লাহ সেই বায়াতকারীদের উপর সন্তুষ্টও ছিলেন। সে তার নিজের মনের খবর ভালই রাখতেন- সেই বারা তার নিজের সাহাবী ভাইদের ব্যাপারে এমন আক্ষেপপূর্ণ স্বাক্ষী দিলেন। তার পরও কি কোন বুদ্ধিমান লোক নির্বিচারে সকল সাহাবীর ন্যায়পরায়নতার কথা বলতে পারেন?

এই রাওয়ায়েতগুলো মূলতঃ রসুল (সাঃ) এর সেই হাদীসগুলির সমর্থক যেখানে তিনি বলেছেন যে, "আমার পরে আমার সাহাবীগণ আমার সুন্নাত ভেঙ্গে ফেলবে এবং তাদের পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাবে"।

নিজেদের বিরুদ্ধে শায়েখায়নদের (প্রথম দুই কলিফা) সাক্ষ্য প্রদান ঃ

বোখারী (বাবে মুনাকেব ওমর ইবনে খাত্তাব) এ লিখেছেন যে, "যখন উমরকে ছুরির আঘাত করা হয় তখন তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন।" তখন ইবনে আব্বাস বলেন "আমিরুল মোমেনিন,

যদি এমন কথাই হয় যে, আপনি রাসুল (সাঃ) (ঘাবরানোর কি আছে) এর উত্তম সংস্পর্শ পেয়েছিলেন, যখন আপনি রসুল (সাঃ) থেকে আলাদা হলেন তখন তিনি আপনার উপর খুশি ছিলেন। অতঃপর আপনি আবু বকরের সংস্পর্শে সৌভাগ্যবান হন, যখন তিনি আপনার থেকে পৃথক হন, তখন তিনিও আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আপনি রসুল (সাঃ) এর সাহাবাদের সাথে আছেন এবং উত্তম সংস্পর্শ পাচ্ছেন, যদি আপনি তাদের থেকে পৃথক হন, তাহলে তারাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তখন উমর বললেন- "তুমি রসুল (সাঃ) এর সোহবাতের যে কথা বললে, যে তিনি আমার প্রতি খুশি ছিলেন, তাহলে তা হবে খোদার অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করলেন। অতঃপর, আবু বকর এর সংস্পর্শের যে কথা তুমি আমাকে বললে, যে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন সেটাও খোদার অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর বর্ষণ করলেন। খোদার কসম, আপসোস! জমিনের উপর পাহাড়সম স্বর্ণ যদি আমার কাছে হয় এবং খোদার আযাব দেখার আগেই সেই স্বর্ণগুলি যদি আমি সদকা দিতে পারতাম, যাতে খোদার আযাব থেকে বাঁচতে পারি। *(বোখারী ২য় খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা।)* ইতিহাসে হযরত ওমরের একটি ঘটনায় এও লেখা আছে যে আপসোস, "আমি যদি আমার বাড়িওয়ালার দুম্বা হতাম, সে আমাকে খানাপিনা দিয়ে মোটা করতো, অতপর যখন তার ঘরে দেখা করার জন্যে বন্ধু, আত্মীয় আসতো, তখন আমার মালিক আমাকে জবাই করে আমার কিছু গোশত আগুনে ভুনা করতো, আর কিছু গোশতো সিকে দিয়ে শুকাতো, অতপর আমাকে খেয়ে ফেলতো এবং পায়খানা বানিয়ে রাস্তা দিয়ে বের করে দিত তবু যদি আমি মানুষ না হতাম"। *(মিনহাজুল সুন্নত ৩য় খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা ২ হিকায়াতুল আউলিয়া ১ম খন্ড ৫২ পৃষ্ঠা।)* ইতিহাস এমন একটি ঘটনা আবু বকর এর ব্যাপারে লিখেছে যে একবার আবুবকর একটি পাখিকে গাছের উপর বসে থাকতে দেখে বলেন, "হে পাখি- তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি ফল খাও, গাছের উপর বসে থাক, না তোমার কোন হিসাব হবে, না তোমার কোন আযাব হবে। আমার খুবই ইচ্ছে করে, আমি যদি রাস্তার পাশের গাছ হতাম এবং এদিক দিয়ে কোন উট যাওয়ার সময় আমাকে খেয়ে ফেলতো এবং পায়খানা বানিয়ে তার পেট থেকে বের করে দিত তার

পরও যদি আমি কোন অবস্থাতেই মানুষ না হতাম"। *(তাবারী ৪১ পৃষ্ঠা রিয়াজুননাজরাত ১ম খন্ড ১৩৪ পৃষ্ঠা কানজুল আমাল ৩৬১ পৃষ্ঠা। মিনহাজুল সুন্নত ৩য় খন্ড ১২০ পৃষ্ঠা।)* আরও একবার তিনি বলেন আফসোস, "আমার মা যদি আমাকে ভূমিষ্ট না করতেন, আফসোস, আমি যদি ইট বানানোর গোলা কাঁদা হতাম", *(তাবারী ৪২ পৃষ্ঠা রিয়াজুন নাজরাত ১ম খন্ড ঐ)*

এগুলো কতিপয় সেই সব উদ্বৃতি, উদাহরণ স্বরূপ আমি উপস্থাপন করলাম। অথচ কোরআন মোমিন বান্দাদের সুসংবাদ দিচ্ছে, এরশাদ হচ্ছে–

"জেনে রাখ ! তাতে কোন সন্দেহ নেই, খোদার বন্ধুদের বেলায় (কেয়ামতের দিন) দুঃখের ও ভয়ের কোন কারন নেই, এরা তারাই যারা খোদার উপর ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহকে) ভয় করে। সেই ব্যক্তিদের জন্যই ইহকাল এবং পরকালেও সুসংবাদ আছে। খোদার কথার কোন বদল হয় না। উহাই এ মহাসাফল্য। ইউনুস" । – ৬২, ৬৩, ৬৪,। অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে–

"যে ব্যক্তিরা (সৎ মনে) বলেছে আমাদের প্রতিপালক তো (শুধু) খোদা আছে এবং তাতে তারা অটল ছিল তাদের উপর মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেস্তা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) কোন ভয় করো না, কোন চিন্তা করো না যে বেহেশত সম্বন্ধে তোমাদের কাছে ওয়াদা করা হয়েছিল সেটার জন্য তোমরা আনন্দিত হও। ইহ জগতেও তোমাদের বন্ধু ছিলাম পরকালেও তোমাদের বন্ধু থাকব এবং যে জিনিসই তোমাদের মন চাইবে তোমার জন্যে উপস্থিত আছে এবং যা তোমরা চাইবে সেখানে তোমাদের জন্যে উপস্থিত করা হবে। ইহা ক্ষমাশীল ও দয়াবান (খোদার) পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে মেজবানি আছে"। হামীম–আস সাজদা–৩০–৩২।

এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিন আল্লাহর এত সব ওয়াদার পরও কেন আবু বকরের এবং ওমরের আকাংখা, যে যদি তারা মানুষ না হতো? অথচ আল্লাহ মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির উপর মর্যদা দিয়েছেন এবং যখন সাধারণ মোমিন সঠিক রাস্তায় জীবন চলার কারণে তার উপর মরার সময় রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয় তাই সে শাস্তির ভয় পায় না এবং ফেলে আসা দুনিয়ার সামগ্রির জন্য মনক্ষুন্ন হয় না, আখেরাতের জীবনের আগেই দুনিয়াতেই তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, যদি তাই হয়,

তাহলে বুজুর্গ সাহাবীদের এমন কি হলো, যারা রসুল (সাঃ) এর পরেই উত্তম মানব–যে তাদের নিবেদন, যে আফসোস ! আমরা যদি পায়খানা হতাম, ঘাস হতাম অর্থাৎ সব কিছু হতাম যদি মানুষ না হতাম? যদি ফেরেশতা তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে থাকবে তাহলে কেন আযাব থেকে বাঁচার জন্য পাহাড় সমান স্বর্ণ দানের বাসনা করেন। কোরানের এক জায়গায় বলা হচ্ছে–

"এবং (দুনিয়াতে) যারা যারা নাফরমানি করে জুলুম করেছে (কেয়ামতের দিন) চাইবে সকল সম্পদ যাহা জমিনে আছে তাহা যদি পেয়ে যেত আর সেটা তারা তাদের গুনাহর মুক্তিপন হিসাবে দেয়া যেত এবং যখন তারা নিজেদের আজাবকে দেখবে তখন তারা নিজেই লজ্জিত হবে এবং আল্লাহ সকলের সঙ্গে ন্যায় বিচার করবেন, তাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না"। সূরা-ইউনুস- আয়াত–৫৪। অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে–

"এবং যারা সীমা লংঘন করেছে তারা যদি সারা দুনিয়ার সম্পদ পেয়ে যায় বরঞ্চ তার সঙ্গে আরো তত পেয়ে যায়, কেয়ামতে সেটা যদি তারা মুক্তিপন হিসাবে দিয়ে দেয় (এবং নিজেকে মুক্ত করতে চায়) এবং (সে সময়) আল্লাহর নিকট হতে তাদের এমন কর্মফল উপস্থাপন করা হবে যা তাদের কল্পনাতে ছিল না ।আর তারা যে অপকর্ম করেছিল (সে সব) প্রত্যেক বিষয়ে খুলে সামনে এসে যাবে ।এবং যে আজাবের কথা শুনে তারা উল্লাস করত সেগুলোই তাদেরকে ঘিরে ধরবে"।সূরা যুমার আয়াত ৪৮, ৪৭।

আমি আমার মনের গভীরতা দিয়ে চাইছিলাম যে এই আয়াতগুলো, সবচেয়ে বড় সাহাবী যেমন আবু বকর এবং ওমরের বেলায় যেন না হয়। কিন্তু যখন সেই সব সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পড়ি যে, সেই সাহাবীদের রসুল (সাঃ) এর সাথে সবেচেয়ে বেশী ভাল সম্পর্ক ছিল অতঃপর এত সম্পর্কের পরেও রসুল (সাঃ) এর হুকুম থেকে এতটাই বিপরীতে এবং দূরে চলে যায় যে হুজুরের শেষ জীবনে তাদের নাফরমানির জন্য তিনি রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেন। এগুলো যখন ভাবি তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে শব্দ বের হয় না। আমি ভাবনার গভীরে চলে যাই, আমার চোখের সামনে সেই সব ঘটনা ভেসে উঠে, ফিল্মের মত একটার পর একটা ঘটনা, যেগুলো হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ঘটেছিল। যেমন মা ফাতেমা (আঃ)কে তারা কষ্ট দেয়, তাঁকে তারা অপমানিত

করে। অথচ হুজুর (সাঃ) নিজেই বলেছিলেন ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা যে তাঁকে রাগান্বিত করলো সে যেন আমাকে রাগান্বিত করলো। *(বোখারী ২য় খন্ড ২০৬-পৃষ্ঠা)।* হযরত ফাতেমা (আঃ) আবু বকর ও ওমরকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের দুই জনকেই খোদার কসম দিচ্ছি যে, তোমরা কি রসুল (সাঃ) এর সেই কথা শুননি? ফাতেমার খুশি আমার খুশি, ফাতেমার অসন্তুষ্টি আমার অসন্তুষ্টি। যে আমার মেয়ে ফাতেমাকে ভালবাসলো সে যেন আমাকে ভালবাসলো, যে ফাতেমাকে সন্তুষ্ট রাখলো সে আমাকে সন্তুষ্ট রাখলো"। তখন তারা উভয়ে বলেছিল "যে হ্যাঁ আমরা তো এগুলো রসুল (সাঃ) থেকে শুনেছি"। তখন মা ফাতেমা (আঃ) বলেছিলেন "আমি খোদা এবং ফেরেশতাদের স্বাক্ষী রেখে বলছি তোমরা উভয়ে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছ। আমি যখন রাসুল এর সাথে দেখা করবো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো" *(ইমামত ও সিয়াসাত/ কুতাইবা ১ম খন্ড ২০ পৃষ্ঠা ফাদাক ফিত তারিক ৯২ পৃষ্ঠা।)*

যাক, এই বর্ণনাগুলো বাদ দেই, কারণ এতে মনে আঘাত লাগে। ইবনে কুতাইবা যিনি আহলে সুন্নাতদের বড় আলেম ছিলেন এবং তাফসির, হাদীস, গ্রামার এবং ইতিহাসসহ আরো অনেক বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার অনেক বই লিখিত আছে, হতে পারে সে হয়তো পরে শিয়াও হয়ে যেতে পারে। কারণ একবার একজনকে আমি "তারিখে খোলাফা" দেখাচ্ছিলাম তখন তিনি চমকে বলেছিলেন ইনি তো শিয়া ছিলেন। আমাদের আলেমদের এই এক অভ্যাস যখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হিসাবে বলে দেন, লেখক শিয়া ছিলেন। অতএব, তাদের নিকট তাবারি একজন শিয়া, ইমাম নাসায়ি যিনি আলী (আঃ) এর উপর একটি বিশেষ গ্রন্থ লিখেছেন, তিনি শিয়া ছিলেন, ইবনে কুতায়বা শিয়া ছিলেন। সমসাময়িক লেখক ডঃ তাহা হুসাইন মিশরী যখন তিনি "ফেতনাতুল কুবরা" গ্রন্থ লিখেন এবং তাতে "গাদিরে খোম" হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সত্য বিষয়ের অবতারণা করেন, সেও কি শিয়া হয়ে গেছে ! ঘটনা এই যে এদের কেউ শিয়া নন। কিন্তু আমাদের আলেমদের অভ্যাস যখন কোথাও শিয়াদের কথা আসে তখন তারা শিয়াদের ভাল কিছু না দেখে

শিয়াদের খারাপগুলোই তাদের নজরে আসে। তারা সাহাবাদের ভাল দিকগুলো তুলে কোন না কোন ভাবে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি কেউ হযরত আলী (আঃ) এর মর্যাদার কথা বলেন এবং বড় বড় সাহাবাদের ভুল নির্দেশ করে তখন আমরা বলি সে শিয়া হয়ে গেছে। এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং তাহার সামনে কেউ যদি রসুলের নামের পরে, "আল্লাহ্ তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর আশীর্বাদ করুন"। আলীর নামের পরে, "আল্লাহ্ যেন তার উপর শান্তি বর্ষণ করেন", বলেন তাহলেও তারা বলবে এটা শিয়া। এই বিষয়গুলো নিয়ে একদিন আমি সুন্নি আলেমের সাথে কথা বলতে গিয়ে বললাম "বোখারী শরীফ" সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বল্লেন তিনি তো হাদীসের ইমাম ছিলেন, তার কিতাব আল্লাহর কোরআন এর পরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এটাই আমাদের আলেমদের ইজমা, তখন আমি বললাম, তিনি ত শিয়া ছিলেন। তখন, সেই আলেম ভদ্রলোক আমার ঠাট্টার উপরে জোরে হেসে বলেন, খোদা না করুন! ইমাম বোখারী তাহলে শিয়া হয়ে গেছেন। আমি বললাম, কেন? এখনই যে, আপনি বললেন আলীর নামের সাথে যে (আঃ) বলে সে শিয়া। তিনি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই বাস্তব। তখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সাথী লোকজনদের বোখারীর বিভিন্ন অংশ খুলে দেখালাম যেখানে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (আঃ)দের নামের শেষে (আঃ) লেখা আছে। *বোখারীর ১ম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা ১৩০ পৃষ্ঠা/ ২য় খন্ড ১২৬ পৃঃ ২৫০ পৃঃ)* এগুলি দেখে তারা অস্থির হয়ে গেল এবং চুপ হয়ে গেল, কোন উত্তর দিতে পারলেন না। এখন আমি সেই বর্ণনাগুলির দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। যেখানে ইবনে কোতাইবা লিখেছেন- জনাবে ফাতেমা (আঃ) আবু বকর এবং ওমরের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন। আপনার কাছে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হতে পারে। কিন্তু আমি কমপক্ষে "বোখারী শরীফের" ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা কোরআনের পরেই বিশুদ্ধ, এটা আমাদের ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং শিয়াদের হক আছে যে এই কিতাব দ্বারা তাদের পক্ষের যুক্তি জোরালোভাবে তুলে ধরে যেভাবে আমরা তাদেরকে জব্দ করে ফেলেছি। আর বিবেকবান ব্যক্তিদের জন্য এটাই একমাত্র ইনসাফের পথ। বের করুন! "বোখারী শরীফের" আল্লাহর রাসুলের আত্মীয়দের

গুনাবলীর সেই অধ্যায় এবং পাঠ করুন! যেখানে রয়েছে, "ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে ফাতেমাকে রাগান্বিত করল সে আমাকে রাগান্বিত করল"। খাইবারের অধ্যায়ে লেখা আছে, যেখানে আয়েশা বলছেন- "ফাতেমা বিনতে নবী (আঃ) আবু বকরের কাছে লোক পাঠালেন যে, রসুলে খোদা (সাঃ) এর সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু আবু বকর তাঁকে এক দানাও দিতে অস্বীকার করলেন। এ কারণে মা ফাতেমা (আঃ) আবু বকরের উপর রাগান্বিত হন। তিনি তাদের বয়কট করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহার সাথে কথাই বলেননি"।

দুটার পরিণাম একই হল, "বোখারী" ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন। আর ইবনে কোতাইবা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন অথচ উভয়ের ভাবধারা একই। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা (আঃ) এর অসন্তুষ্টিতে নিজে অসন্তুষ্ট হতেন আর ফাতেমা (আঃ) এর খুশিতেই খুশি হতেন। অথচ মা ফাতেমা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন আবু বকরও ওমরের উপর অসন্তুষ্টি নিয়ে।

এবং যদি বোখারী এটা বলেন যে, ফাতেমা আবু বকরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কথাই বলেননি। তাহলে এর অর্থ এটাই হল যেটা ইবনে কোতাইবা লিখেছেন। সুতরাং বোখারীর কথা অনুযায়ী ফাতেমা যখন দুনিয়ার সকল মেয়েদের সর্দার এবং গোটা মুসলিম উম্মতের মধ্যে একক মহিলা যিনি 'আয়াতে তাতহীর' দ্বারা নিষ্পাপ, তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়া কোন সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা, মা ফাতেমা (আঃ) এর অসন্তুষ্টির সাথে সাথে আল্লাহ ও রসুল (আঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। সম্ভবত আবু বকরও এই জন্যই হয়তো বলেছিলেন, '' হে ফাতেমা, আমি খোদা ও আপনার অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি চাই'', এই কথা বলে আবু বকর এতো উচ্চ স্বরে কাঁদতে থাকেন আর সেই কান্না ছিল এতটাই হৃদয় বিদারক যাতে তার রুহ পর্যন্ত যেমন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ফাতেমা (আঃ) সেই কথাই বলেছিলেন- "খোদার কসম প্রত্যেক নামাজে আমি তোমাদের দুই জনের জন্যে বদদোয়া করতে থাকব"। এই ঘটনার পর আবু বকর কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে

যান এবং বলতে থাকেন- "তোমার বায়াত আমার প্রয়োজন নেই, বরং তা থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিলাম"। *(ইমামত ও শিয়াসত ইবনে কুতাইবা ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা।)* এইভাবে অনেক ঐতিহাসিক ও আলেমগণ এই কথার যথার্থতা স্বীকার করেছেন যে আতীয়া (উপহার) ও উত্তরাধিকার এবং আত্মীয়ের পাওনার ব্যাপারে ফাতেমা (আঃ) আবু বকরের সাথে ঝগড়া করেন কিন্তু আবু বকর তাঁর দাবী মেনে নেননি তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকরের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আলেমগণ এই সব ঘটনার কথা এমন ভাবে চেপে যান যেন কিছুই হয়নি যেহেতু এই জাতীয় ঘটনার দ্বারা বুজুর্গ সাহাবার উপর কালিমা লেপন হয়, এই সব ঘটনায় তারা চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ মুখ খুলতে চান না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আমি এক জন মুরুব্বির লেখায় পড়েছি, তিনি ঘটনার কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, তিনি মানতেই পারেন না ফাতেমা (আঃ) অন্যায়ভাবে কিছু চেয়েছেন, আর এইও মানতে পারেন না যে আবু বকর অন্যায়ভাবে দাবী অস্বীকার করেছেন। এই দুর্বল যুক্তি দিয়ে সেই আলেমের এই ধারণা হলো যে তিনি বিষয়টি খোলাসা করে ফেলেছেন। আসলে বিষয়টি এমন হলো যে, "কেউ বললো যে কোরআন মিথ্যা বলেছে এটা যেমন আমি মানতে পারি না তেমনি বনি ইসরাইলগন বাছুর পূজা করেছে তাও আমি মানতে পারি না"। এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে দূর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের আলেমগণ এমন সব কথা বলেন যেগুলো তারা বুঝেনও না ও বিশ্বাসও করেন না। তারা কোন বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা আছে সবই একই সাথে বিশ্বাস করেন। অথচ বাস্তবতা হলো ফাতেমা (আঃ) তার অধিকার দাবী করে ছিলেন আর আবু বকর তা অস্বীকার করেছিলেন। হতে পারে এখানে ফাতেমা (আঃ) এর দাবী মিথ্যে ছিল। (নাউযুবিল্লা) অথবা আবু বকর জালেম ছিলেন এর বাহিরে তৃতীয় কোন পথ নাই। যুক্তি এবং প্রমানাদিতে প্রমানিত হয় যে উম্মার নেত্রী মিথ্যে দাবি করেননি। কেননা সহী হাদীসগুলোতে রসুল (সাঃ) বলেছেন- "ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা যে তাকে কষ্ট দিল সে যেন

আমাকে কষ্ট দিল।" প্রকাশ থাকে যে এই হাদীসের সনদ মিথ্যে নয় আর এই হাদীসটি স্বয়ং সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করে যে ফাতেমা (আঃ) কোন ভুল করতে পারেন না বা কোন খারাপ প্রত্যাশা করতে পারেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন, "আয়াতে তাতহীর" দ্বারা পূতপবিত্র। *(মুসলিম ৭ম খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, তারিখে খোলাফা ১১২ পৃষ্ঠা)* হযরত আয়শার সাক্ষ্য অনুযায়ী "আয়াতে তাতহীর" মা ফাতেমা (আঃ) তাঁর স্বামী ও সন্তানের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই এটার বাহিরে কিছুই হতে পারে না নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানেরা মেনে নিবে তিনি একজন নির্যাতিতা ও নিঃষ্পাপ ছিলেন। মা ফাতেমা (আঃ)কে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার সাহস তাদেরই হতে পারে যারা তার আঙ্গিনায় যেয়ে স্বদর্পে ঘোষণা করতে পারে যে, বায়াত কে অস্বীকারকারীরা ফাতেমা (আঃ) এর ঘর থেকে বেরিয়ে না আসলে আমরা তার ঘর জ্বালিয়ে দেব। *(তরিখে খুলাফা ১ম খন্ড ২০ পৃষ্ঠা।)* এই সব কারণে হযরত ফাতেমা (আঃ) আবু বকর এবং ওমরকে আর কোনদিন তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেননি। কিন্তু অন্য এক দিন যখন আলী (আঃ) তাদের দুই জনকে ঘরে নিয়ে এলেন তখন ফাতেমা (আঃ) দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঘুরে বসেছিলেন। তাদের দিকে ফিরেও চাননি। জনাবে ফাতেমা (আঃ) এর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে রাতের অন্ধকারে দাফন করা হয় যাতে তাদের কেউ তাঁর জানাযায় শরীক হতে না পারে *(বোখারী ৩য় খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)*। তাই রসুল (সাঃ) এর কন্যার মাজার আজও মানুষের কাছে অজানাই রয়েছে। আমি আমাদের আলেম সমাজের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা এসব সত্য ঘটনার ব্যাপারে চুপচাপ কেন? তারা এই ব্যাপারে বিতর্কে আসেন না কেন? তারা আলোচনাও করেন না কেন? বরং আমাদের সামনে সাহাবাদেরকে ফেরেশতার মত করে তুলে ধরেন যেন তারা কোন গোনাহ এবং ভুল করতে পারেন না?

আমি যখন কোন আলেমকে জিজ্ঞাস করি খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উসমান জিননুরাইন কে কেন হত্যা করা হয়েছিল? তখন শুধু বলা হয় মিশরীয়রা এসে তাকে হত্যা করে যারা সবাই কাফের ছিল। কিন্তু যখন আমার অবসর হয় এবং আমি যখন ইতিহাস ঘাঁটি তখন

আমি অবগত হই যে উসমানের হত্যাকারী একজন সাহাবী ছিলেন এবং তাদের আগে আগে উম্মোল মুমিনিন আয়শাও ছিলেন যিনি চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে আগে আগে মানুষদেরকে উসমান হত্যার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তার রক্তকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং বলেছিলেন "নাসেলকে কতল করে দাও সে কাফের হয়ে গেছে"। *(তাবারি ৪র্থ খন্ড ৪০৭ পৃঃ তারিকে ইবনে আসির ৩য় খন্ড-২০৬ পৃঃ লেসানুল আরব ১৪তম খন্ড ১৯৩ পৃঃ তাজুল উরুস ৮ম খন্ড ১৪১ পৃঃ আল আকদুল ফরিদ ৪র্থ খন্ড ২৯০ পৃঃ)*

নাসাল একজন ইহুদি ছিলেন, উসমানের দাঁড়ি সেই ইহুদীর দাঁড়ির সাথে হুবহু মিল ছিল তাই আয়শা উসমান কে 'নাসাল' বলে ডাকতেন। এই ভাবে তালহা, যুবায়ের এবং মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সহ অন্যান্য সাহাবিগণ উসমানকে ঘিরে ফেলে। প্রথমে তার পানিবন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে তিনি বাধ্য হয়ে খেলাফত থেকে ইস্তফা দেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সাহাবাগণ উসমানের লাশটি পর্যন্ত মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দেয়নি। তাকে গোসল এবং কাফন ছাড়াই দাফন করা হয় ইহুদীদের কবরস্থানে, সোবহান আল্লাহ ! অথচ আমাদের বলা হয় উসমানের হত্যাকারী মুসলমান ছিলেন না এবং তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। হযরত ফাতেমা (আঃ) এবং আবু বকরের ঘটনার মতোই এটাও আরেকটি ঘটনা যে হয়তো উসমান মজলুম ছিলেন অর্থাৎ যে সব সাহাবী তাকে কতল করেছে তারা বা তাদের সহযোগীরা দোষী ছিলেন কেননা তারা খলিফাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তার কফিনের উপর পাথর মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেছে। জীবন্ত অবস্থায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তাকে অপমান করেছে। অথবা এ সকল সাহাবা সত্যের উপর ছিলেন যারা হযরত উসমানকে হত্যা করেছেন। কারণ উসমান ইসলামের বিরোধী অনেক কাজ করেছেন, যা ইতিহাসে আছে। এ দুইয়ের একটি অবশ্যই বাতিল হবে, এর বাহিরে তৃতীয় কোন পথ নাই। হ্যাঁ, এখানে আরও কথা আছে, তাহলো আপনি যদি গোটা ইতিহাসকেই অস্বীকার করেন। আর মানুষকে মিথ্যে বলেন যে,

উসমানকে যে মিসরী হত্যা করেছে সে কাফের ছিল। সে যাই হউক, উসমানকে, আপনি জালেম মানেন বা মজলুম, উভয় দিক দিয়েই সাহাবাদের সবাই আদেল ছিলেন তা প্রমাণিত হয় না। কারণ সব দিকেই সাহাবী। এভাবে আহলে সুন্নাতের দাবী অসার প্রমানিত হয় এবং শিয়াদের কথাই সত্য হয় যে কতিপয় সাহাবী আদেল ছিলেন আর কতিপয় নয়।

এভাবে আমি উষ্ট্রের যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করবো, যে আগুন উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা জ্বালিয়ে ছিলেন। এবং তিনি নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। অথচ তাকে খোলা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে– *"এবং নিজের ঘরে বসে থাক এবং বিগত জাহেলিয়াতের জমানার মতো নিজের রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করিও না।"* আহজাব–৩৩।

তার পরও উম্মুল মুমেনিন কেন বেরিয়েছিলেন

এভাবে আবার প্রশ্ন করতে হয় উম্মুল মুমেনিন হযরত আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে খেলাফতের কোন্ দলিলের ভিত্তিতে যুদ্ধ করেছিলেন? যেখানে আলী (আঃ) সকল মুমেন মুমেনার ওলী ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের আলেমগণ দুষ্টতাপূর্ন উত্তর দিয়ে থাকে যে আলী (আঃ) এর সাথে আয়শার শত্রুতা ছিল। আয়শাকে তালাক দেওয়ার জন্য আলী নবী (সাঃ)কে প্ররোচিত করেছিলেন। (যদি ঘটনা সত্যি হয়, যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেই তাহলেও বলতে হয় এতটুকুর জন্যই কি আয়শা কোরানের হুকুম অমান্য করে যুদ্ধের ডংকা হাতে নিয়ে রনহুংকারে বেরিয়ে পড়তে পারেন? যে পর্দার নির্দেশ রসুল (সাঃ) তার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন তা কি করে তিনি ফেলে দিলেন? নবী (সাঃ) প্রথমেই তাকে সাবধান করেছিলেন এবং নিষেধ করেছিলেন যেন একটা উটে না চড়েন। "হাওয়াবের কুকুর তোমার পিছনে ডাকিলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হবে"। *(তাবারী)। ইমামাত ও শেয়াসাৎ।*

অথচ আয়শা মদিনা থেকে মক্কা এবং মক্কা থেকে বসরা এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বেগুনাহ্ লোকগুলোকে হত্যা করালো আর আলীর অনুসারীদের সাথে যুদ্ধ করলো? হাজারও মুসলমানদের হত্যা

করলো যেমন ইতিহাসে লিখেছে? এই সব তাণ্ডবতা কি শুধু এইটুকুর জন্য বৈধ্য হবে যে, আলী (আঃ)কে তিনি চাইতেন না কারণ তাকে তালাক দেওয়ার জন্য তিনি রাসুল (সাঃ)কে প্ররোচিত করেছিলেন? কিন্তু নবী ত তাকে তালাক দেননি তারপরও এই প্রতিহিংসা?

ঐতিহাসিকগণ আলী (আঃ) এর সঙ্গে তার দুশমনির অনেক কিছু লিখেছেন যার বিস্তারিত লিখা এখানে সম্ভব নয়। যেমন যখন তিনি মক্কা থেকে ফিরে আসেন তখন জনতা বললো উসমান নিহত হয়েছেন। এ খবর শুনে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না কিন্তু যখন লোকজন বললো মদীনাবাসীরা আলী (আঃ) এর বায়াত গ্রহণ করে ফেলেছে তখন তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমার কাছে সেই কথাটিই অধিক পছন্দনীয়, আলী খেলাফত পাওয়ার আগে আসমান জমিনের উপর ফেটে পড়ুক" এবং তৎক্ষণাত হুকুম করলেন যে "আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল"। ফিরে গিয়েই তিনি আলীর খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে থাকেন। কেন, উম্মোল মুমেনিন রসুল (সাঃ) এর সেই কথা কি শুনেননি যে, "আলীকে মহব্বত করা ঈমান, আর আলী (আঃ) এর সাথে শত্রুতা করা মুনাফেকী"। মুসলিম ১ম খন্ড ৪৮ পৃষ্ঠা। এই জন্যেই কতিপয় সাহাবীদের এই বক্তব্য প্রসিদ্ধ আছে যে, আমরা মুনাফিকদেরকে আলীর সাথে শত্রুতা করার কারণে চিনে ফেলেছি। উম্মোল মুমেনিন কি রসুল (সাঃ) এর সেই বক্তব্য শুনেন নি যে, "আমি যার মাওলা-আলীও তার মাওলা"।

আসলে তিনি সব কিছুই শুনেছেন কিন্তু আলী (আঃ)কে যেমন পছন্দ করতেন না তেমনি তাঁর নাম নেওয়া ও পছন্দ করতেন না। উপরন্তু আলী (আঃ) এর শাহাদাতের খবর শুনে সরাসরি শুকরিয়া সেজদা দিয়েছেন (তাবারি ইবনে আদিল আল ফেতনাতুল খুবরাসহ অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ)।

আমি এখানে উম্মোল মুমেনিন হযরত আয়শার ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক করতে চাই না, বরং আমি এই কথাটাই প্রমান করতে চাই যে, অনেক সাহাবী ইসলামের নীতির বিরোধিতা করেছেন এবং রসুল (সাঃ) এর নির্দেশ অমান্য করেছেন। এখন বাকী শুধু উম্মোল মুমিনের এই ঘটনা যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এমন একটি দলিল যার উপর ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যখন আয়শা হাওয়াবের জলাশয় এর নিকট দিয়া যাচ্ছিলেন, তখন হাওয়াবের কুকুররা আয়শার পিছনে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করছিল। তখন আয়শার নবীর সেই সাবধান বাণী মনে পড়ে যায়- "আয়শা তুমি সেই উটে আরোহণ করো না", তখন তিনি কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন "আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।" কিন্তু তালহা ও যুবায়ের ঘুষ দিয়ে পঞ্চাশ জনকে মিথ্যে স্বাক্ষী হওয়ার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ার করেন যারা আয়শার সামনে খোদার নামে মিথ্যে কসম খেয়ে বলতে থাকেন, "হে উম্মোলমুমেনিন, এটা চশমায়ে হাওয়াব নয়" বাস তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন এবং বস্রায় আসেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইসলামের এটাই ছিল প্রথম মিথ্যে- স্বাক্ষী" *তাবারি ইবনে আসির, মাদায়েনি এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ।*

হে মুসলমানগণ, হে বুদ্ধিমানগণ, আপনারাই বলুন ! এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এরা কি সেই বুজুর্গ সাহাবি নয়, যাদেরকে আমরা রসুলের পরে উত্তম মনে করি, যাদেরকে আমরা সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ মনে করি যারা খোদার নামে মিথ্যে কসম খেয়েছে, অথচ মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়াকে আল্লাহর রসুল (সাঃ) এমন কবিরাহ গুনাহ্ হিসাবে সাবস্ত করেছেন যা দোজখে নিয়ে যাবে। এখন আবার সেই পুরানো কথাই ফিরে আসতে হয় যে আসলে সত্যপন্থি কারা, আর বাতেল কারা, হযরত আয়শা ও তার সহযোগী তালহা,

যুবায়ের, তারাই জালেম এবং বাতেল, অথবা আলী এবং তাঁর সঙ্গীসাথীগণ জালেম এবং বাতেল তাছাড়া তৃতীয় কোন পথ নেই। সত্য এবং ন্যায়ের মানদন্ডে আলীর বৈধতাকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা রসুল (সাঃ) এর কথা হলো আলী যে দিকে, সত্য সেই দিকে। হযরত আয়শা ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, কেননা তারাই মুসলমানদে মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন, আর সেই যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল তার লেলিহান শিখা আজও উম্মাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। মন্তুষ্টির জন্যে বিষয়টার একটু গভীরে আলোচনা করলে দেখা যায় *(বোখারী ৪র্থ খন্ড ১৬১ পৃঃ)।* উষ্টের যুদ্ধের প্রসঙ্গে যখন তালহা, যুবায়ের এবং আয়শা বসরায় পৌঁছলেন তখন হযরত আলী (আঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং পুত্র হাসান (আঃ)কে কুফা পাঠান। দুই জন কুফায় আসেন এবং মিম্বারের উপরে যান। হাসান (আঃ) মিম্বরের উপর এবং আম্মার এক ধাপ নীচে বসেন। যখন মানুষ উভয়ের কথা শুনার জন্য জড়ো হয় তখন আমি আম্মারকে এই কথা বলতে শুনেছি,- তিনি বলেন- "আয়শা বাসরা গিয়েছেন। তিনি ইহকাল ও পরকালে নবীর স্ত্রী, কিন্তু খোদা তোমাদের পরীক্ষা নিতে চান- যে তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্য করবে, না আয়শার"। এভাবে বোখারী নবী (সাঃ) এর স্ত্রীদের ঘরে কি হচ্ছিল অধ্যায়ে লিখেছেন, আল্লাহর রসুল (সাঃ) একদিন খুৎবা দেওয়ার সময় আয়শার ঘরের দিকে ইশারা করে বলেন "এখানেই অশান্তি, এখানেই অশান্তি, এখানেই অশান্তি, এখানে থেকেই অশান্তি, শয়তানের শিং বের হয়ে আসবে *(বোখারী ২য় খন্ড ১২৮ পৃঃ)।* এভাবে ইমাম বোখারী তার কিতাবে রসুল (সাঃ) এর সাথে আয়শার বেআদবির অনেক ঘটনা লিখেছেন। যে কারণে আবু বকর আয়শাকে এমনভাবে মেরেছিল যে আয়শার শরীর থেকে রক্ত বেরুতে থাকে। রসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে আয়শার এমন আচরণ প্রকাশ পায় যে জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে তালাক দেওয়ার ধমক আসে যে, খোদা তোমার চেয়ে উত্তম স্ত্রী নবীকে দেবেন। এ ধরণের আরও অদ্ভুত কথাবার্তা আয়শার ব্যাপারে লিখা আছে।

এই সব কথার পরও আমি জানতে চাই তাহলে আহলে সুন্নাতের কাছে আয়শার এত মর্যাদা কেন? শুধু এই জন্যেই যে, তিনি নবী (সাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন? নবী (সাঃ) এর স্ত্রী তো আরও ছিলেন বরং, আয়শার চেয়ে আরও উত্তম ছিলেন। যেমন বিবি খোদেজা (রাঃ)। স্বয়ং

নবীর বক্তব্য অনুযায়ী *(তিরমিযি)* তাহলে আয়শার ভিতরে এমন কি বিশেষত্ব ছিল? অথবা তার সম্মান কি এই জন্য করা হয় যে, তিনি আবু বকরের মেয়ে ছিলেন? অথবা এই জন্যেই কি যে রসুলে খোদা (সাঃ) আলী (আঃ) এর জন্যে যে অসিয়ত করে ছিলেন, তা অকার্যকর করতে আয়শার ভূমিকাই মুখ্য ছিল? যেমন বর্ণিত আছে যখন আয়শার সামনে উপস্থাপিত করা হলো যে নবী (সাঃ) আলী (আঃ) এর ব্যাপারে অসিয়ত করে গেছেন। তখন তিনি চট করে বলে উঠলেন "এটা কে বলেছে?" রসুল (সাঃ) আমার বুকের উপর ঠেস দিয়ে শুয়ে ছিলেন, আমার কাছে একটি প্লেট চাইলেন, আমি প্লেটের দিকে ঝুকলাম, এমতাবস্থায় নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন, আমি বুঝতেই পারলাম না, তাহলে আলীর ব্যাপারে অসিয়ত কখন করলেন? *(বোখারী ৩য় খন্ড ৬৮ পৃঃ)* অথবা এই জন্যেই কি তার সম্মান দেওয়া হয়? যে তিনি হযরত আলী (আঃ) এর সাথে শত্রু যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তার পরে তার সন্তানদের সাথে লড়েছেন। শেষে হিংসা বিদ্বেষের চরম শিখরে এসে তিনি ইমাম হাসান (আঃ) এর লাশকে নবীর কবরের পাশে দাফন করতে দিলেন না। (ইমাম হাসান (আঃ) ওয়াসিয়ত ছিল "আমাকে নানার পাশেই দাফন করিও) এই বলে বাধা দিলেন, "যাকে আমি পছন্দ করি না তাকে আমার ঘরে ঢুকতে দিব না।" আমরা বুঝতে পারি না যে রসুল (সাঃ) ইমাম হাসান এবং হোসেন (আঃ) এর জন্য বলেছিলেন যে "হাসান এবং হোসেন জান্নাতের যুবকদের সরদার হবে"। অন্য জায়গায় বলেছিলেন "এই দুই জনের সাথে যারা বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, আর তাদের সাথে যারা শত্রুতা রাখবে আল্লাহ তাদের সাথে শত্রুতা রাখবেন", অন্য জায়গায় বলেছেন "তাদের সাথে যারা যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। আর তাদের সাথে যারা সন্ধি করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।" এই সব হাদীসকে উম্মোল মুমিনীন ভুলে গিয়েছিলেন? না কি জানি মুর্খের মত না জানার ভান করেছিলেন? এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ আলীর ব্যাপারে তিনি অনেক বেশী জানতেন; কিন্তু নবীর নিষেধ শর্তেও তারি সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং মানুষকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ এই কারণেই বনি উমাইয়ারা তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং তাকে সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যেখানে তার পৌঁছা সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে এমন কতিপয় জাল হাদীস বানানো হয়েছে যাতে কিতাব ভরে গেছে।

শহরে-গ্রামে, অলিতে-গলিতে তাঁর পঠন, পাঠন শুরু হয়। সব শেষে তাকে উম্মতে মুসলেমার বড় মর্যাদার অধিকারিনী বানিয়ে দিয়েছে। কারণ অর্ধেক দ্বীনতো শুধু আয়শার কাছেই ছিল এবং বাকী অর্ধেক আবু হুরায়রার নিকট। তিনি উমাইয়াদের কথা মত সুন্দর সুন্দর রাওয়ায়েত জাল করেছিলেন। এই জন্যে তারা আবু হুরায়রাকে বহুবিধ সম্মানিত আসন দেয়, তারা আবু হুরায়রাকে মদীনার গভর্নর করে। তার জন্যে 'কাসরে আকিক' প্রাসাদ বানানো হয় যেখানে এই ব্যক্তি কপর্দ্দকহীন, সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাকে হাদীস বর্ণনাকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এভাবেই বনি উমাইয়ার কাছে নতুন বানানো পুরু দ্বীন চলে আসে। আধা আয়শার দ্বারা, আর অর্ধেক আবু হুরাইরার দ্বারা। সে দ্বীনে আল্লাহ ও রসুলের শুধু নামই লেখা ছিল, সেখানে তাদের পছন্দ মতো বেছে বেছে কিছু কথা নেওয়া হতো যাতে করে তাদের ক্ষমতা পোক্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে এ দ্বীনেই সমস্ত অসঙ্গতি ও নোংরামীর সমাবেশ ঘটানো হয়। আর বনি উমাইয়াগণ এই নতুন বানানো ধর্ম দ্বারাই মানুষকে পরিচালিত করতো, এর ভিত্তিতেই মানুষকে চলতে বাধ্য করতো। কালক্রমে এরই ফল হল আজ আল্লাহর দ্বীন মানুষের কাছে হাসির বস্তু যার কোন ক্ষমতা, মর্যাদা ও মূল্য নেই। আর মানুষ মাবিয়াকে এতটাই ভয় করতো যতটা ভয় খোদাকেও করতো না।।

আমি যখন আমাদের আলেম সমাজকে প্রশ্ন করি, মুহাজের এবং আনসারগণ যেখানে আলী (আঃ) এর বায়আত গ্রহণ করেছে, সেখানে মাবিয়ার যুদ্ধ করার বা বিদ্রোহ করার কারণ কি? আর সে যুদ্ধের পরিণতিতেই মুসলমানদেরকে শিয়া-সুন্নি দুটিভাবে বিভক্ত করে দেয়? তখন তারা তাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী উত্তর দেয়, আলী এবং মাবিয়া উভয়েই বড় সম্মানিত সাহাবী ছিলেন- উভয়েই এজতেহাদ করেছেন- আলীর এজতেহাদ সঠিক ছিল বিধায় তিনি দুটি আর মাবিয়ার এজতেহাদ ভুল ছিল বিধায় তিনি একটি সওয়াব পাবেন, আমাদের জন্য বৈধ নয় যে আমরা তাদের ব্যাপারে পক্ষে/বিপক্ষে কোন কথা বলি। তখন খোদার এরশাদ। "সে উম্মত *অতীত হয়েছে- উহারা যা অর্জন করেছে তা উহাদের আর তোমরা অর্জন কর তা তোমাদেরই।তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের কোন জবাবদিহী করতে হবে না।* বাকারা-১৩৪।"

আফসোসের বিষয় হলো- আমাদের আলেমদের উত্তর এমনি হয়, যারা পাগল, মূর্খ তারাই এটা গ্রহণ করতে পারে। কারণ জ্ঞান ও দ্বীন কিংবা শরা এটা মানতে রাজি নয়। হে প্রভু, আমার সিদ্ধান্তের ভূল, ইচ্ছার ত্রুটি, শয়তানের ধোকা থেকে, তোমার সাহায্য চাই।

বিবেচক মন কিভাবে মেনে নিবে যে মাবিয়া ইসলামকে বুঝার জন্য অনেক কষ্ট করে ইজতেহাদ করেছে। সুতরাং তাকে একটা পুরস্কার দিতে হবে যে সে আমিরুল মোমেনীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধে হাজারো নীরিহ মোমেনদেরকে হত্যা করা ছাড়াও অসংখ্যা অপরাধ করেছে? ঐতিহাসিকদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ যে, মাবিয়া তার শত্রুকে হত্যা করার জন্য বা পথের কাটা সরানোর জন্য বিষ মিশ্রিত মধু খাওয়িয়ে দিত আর বলতো- "আল্লাহর শুকরিয়া তুমি শহীদদের অন্তর্ভূক্ত"।

বুঝে আসে না এসব মানুষ কিভাবে তার ইসলামের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তাকে মুজতাহিদ মানেন-তর্জ্জন্য তাকে পুরস্কার দিতে চায়, অথচ তিনি সীমালঙ্ঘনকারী গ্রুপের সর্দার ছিলেন। প্রসিদ্ধ হাদীস যার সত্যতা সম্পর্কে সকল মুহাদ্দেস এক মত- বলা হয় "আফসোস! আম্মার বিন ইয়াসেরের হত্যাকারীদের জন্য! আর মাবিয়া ও তার সৈন্যরাই আম্মারকে হত্যা করেছিল।" যে ব্যক্তি জান্নাতে যুবকদের সরদার হবে সেই ইমাম হাসান (আঃ) কে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করাতে পারে, যে মিল্লাতে মুসলিম থেকে প্রথমে নিজের জন্য ও পরে অভিশপ্ত পুত্র এজিদের জন্য জোর জবরদস্তি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল, যে শুরা পদ্ধতি তুলে দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করেছে, মিম্বর থেকে আহলে বায়তের উপর লানতের খুৎবা (অভিসম্পাত) আরম্ভ করেছিল, যাহা সুন্নতে পরিণত হয়ে যায়, ইহা শুনতে শুনতে শিশু যুবক হয়ে যায় এবং যুবক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাকেই, কি করে, মুজতাহেদ বলা হয়? যে বিশিষ্ট সাহাবী হিজর ইবনে আদী ও তাঁর সাথীদের খুব নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং সিরিয়ার মরুভূমির মার্জে আদ্রার ভূমির মধ্যে কবরস্থ করেছে কেননা তাঁরা আলী (আঃ) এর উপর অভিসম্পাতের খুৎবা

দিতে অস্বীকার করেছিল। বেহেশতে যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান (আঃ)কে যে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। সুন্নী আলেমরা তাকে কি করে একজন সত্যপন্থী সাহাবা মেনে নিয়েছে, তাকে কি করে মুজতাহেদ বলা যেতে পারে? তাও আবার সোয়াবের অধিকারী! "লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা।"

আবার সেই প্রশ্ন এসে যায় দুজনের মধ্যে কে সত্যতে ছিল কে মিথ্যাতে? হয়তো হযরত আলী (আঃ) ও তাঁর অনুসারিরা জালিম ও বাতিলপন্থী ছিলেন অথবা মুয়াবিয়া এবং তার অনুসারিরা জালিম ও বাতিলপন্থী ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিটি বিষয়ে পরিষ্কার করে গেছেন, যাই হোক, সকল সাহাবা যে ন্যায়পরায়ন ছিলেন তাহা প্রকাশ পায় না। যুক্তিতেও তাহা সাব্যস্ত হয় না। প্রতিটি জিনিসের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যদি বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করি তাহলে কয়েকখণ্ড বই হয়ে যাবে কিন্তু আমি ফায়সালা করে নিয়েছি এই বিতর্ক শুধু কিছু ঘটনার উপর সীমাবদ্ধ রাখবো। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য এপর্যন্ত যা উল্লেখ করলাম তা যথেষ্ট হবে। আমাদের সমাজের অবস্থা আমাদের চিন্তাশক্তিকে অকেজো করে দিয়েছে এবং এজন্য হাদীস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখা হয় নাই, যুক্তি ও আইনগত মানদন্ড দিয়া বিচার করার কথা কোরআন হাদীসে বার বার বলা সত্ত্বেও সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না। ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে গবেষনা করা হয় না যেখানে কোরআন এবং নবীর সুন্নত আমাদের জ্ঞান দিয়ে সব কাজ করতে হুকুম করেছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বিদ্রোহী হয়ে যাব এবং সন্দেহের যে আবরণে আমাকে বন্দী করা হয়েছে তা থেকে আমি বেরিয়ে আসব। বিশ বছর যাবত আমাকে যে শিকলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে মুক্ত হয়ে বলতে চাই, আমার জাতি এটা জেনে নিক "যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আমি আশা করি আমার জাতি এই নতুন পৃথিবীকে জেনে নিক যে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না অথচ তার বিরোধীতা করে যাচ্ছে"।

পরিবর্তনের সূচনা

আমি তিন মাস পর্যন্ত খুবই অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছি। সাহাবাদের জীবন সম্পর্কে গবেষণারত থাকার কারনে আমি আমার সম্পর্কে এতই সন্দীহান ও ভীত হয়ে পড়েছি যে স্বপনেও আমি চিন্তা করতে করতে অস্থির হয়েছি। আমি তাদের মধ্যে কিছু বিস্ময়কর পরস্পর বিরোধীতা দেখেছি। কারণ সারা জীবন আমাকে যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহলো ওলী আল্লাহ ও আল্লাহর নেক বান্দাদের সম্মান করতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি তাদের সাথে বেয়াদবি করে তাদের জীবদ্দশায় বা তাদের মৃত্যুর পরও তাহলে তাদের এ বেয়াদবির জন্য খুবই শাস্তি পেতে হবে। এজন্যই আমি অত্যাধিক ভীত ছিলাম।

আমি নিজেই আল দমিরির 'হায়াতুল হায়ওয়ানেল কুবরায়' পড়েছি- এক ব্যক্তি ওমর কে গালি দিতেন। কাফেলার লোকেরা তাকে বারণ করতো কিন্তু সে মানতো না এমতাবস্থায় সে একদিন প্রসাব করছিল তখন খুবই বিষাক্ত সাপে তাকে দংশন করে। তখন সে সেখানেই মরে যায়। অতঃপর মানুষ তার জন্য কবর তৈরী করে দেখে সেখানেও কাল বিষাক্ত সাপ। অতঃপর মানুষ দ্বিতীয় কবর খোলে সেখানেও "একি অবস্থা"। কয়েকবার এমন হল তখন কতিপয় আলেম বললেন "তাকে যেখানে ইচ্ছা দাফন করতে পার, এমনকি গোটা জমিনও যদি কবর কর তবু সাপ পাবেই কারণ- আল্লাহ তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে চান। এজন্যেই যে, সে ওমরকে গালি দিত।"

এ জন্যে আমি অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় এই স্পর্শকাতর আলোচনার পরে কাতরাচ্ছিলাম। বিশেষ করে 'আজ্জায়তানাহ ইউনিভার্সিটি"তে পড়েছিলাম মূলতঃ মৌলিকত্বের দিকে দিয়ে খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলেন- হযরত আবু বকর এর পর

ওমর ফারুক যিনি সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী। এর পর উসমান যিনি যিনুরাইন। যার বুজুর্গীতে ফেরেশতা পর্যন্ত লজ্জা পেতো। অতঃপর হযরত আলী (আঃ) যিনি ছিলেন জ্ঞানের শহরের দরজা। এই চার জনের পর আশরায়ে মুবাশ্বেরা অন্য ছয় জন-তালহা, যুবাইর, সাদ, সাইদ, আব্দুর রহমান, আবু উবাইদা। এর পর সকল সাহাবাদের নাম্বার। আমাদের আলেমগণ বেশী বেশী করে কোরআনের এই আয়াতটি আমাদের শুনান-

" আমরা তাঁর রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।"

সকল রাসুলকে এক দৃষ্টিতে দেখতে হবে কাউকে সমালোচনা করা যাবে না এবং আলোচনার সময় তারা এই আয়াত সাহাবাদের বেলাও চালিয়ে দেন। এ জন্যেই আমি বেশ কয়েকবার ভয় পাই, এস্তেগফার পড়ি। অতঃপর এই আলোচনা শেষ করতে চাই কারণ, এতে সাহাবাদের ব্যাপারে সন্দেহ হতে থাকে। আর তার ফলে দ্বীনের ভিতরেও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এই পুরা সময়ে আমাদের আলেমদের সাথে আলোচনা করে আমার কাছে এমন অনেক অসঙ্গতি ও খটকা লাগে, যা বিবেক গ্রহণ করতে পারেনি এবং আলেমগণ আমার জন্য ভয় করতে থাকেন যে সাহাবাদের নিয়ে এমন আলোচনায় হয়ত, আল্লাহ আমার উপর থেকে তার নেয়ামত উঠিয়ে নেবেন। আমাকে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তার পরও আমার অন্তরাত্মা আমাকে বার বার অনুপ্রাণিত করে, বিবেক আমাকে তাড়া দেয়- হাদীস কোরআন আমাকে এই আলোচনা করতে বাধ্য করে।-

একজন আলেমের সাথে কথোপকথন

আমি আমার একজন আলেমকে বললামঃ মাবিয়া নিরাপরাধী মানুষকে হত্যা করে, মানুষের সম্পদ লুট করেও আপনার কাছে মুজতাহেদ। এবং আপনারা তাকে কোরআনের একজন ব্যখ্যাকারী বলে বিচার করেন যিনি ভুল করেছেন সেজন্য সে একটি সোয়াবের অধিকারী আর এজিদ রসুল (সাঃ) এর সন্তানদের হত্যা করেছে, মদিনায় হত্যাযজ্ঞের জন্য সৈন্য প্রেরণকে বৈধ মনে করেছে, আপনারা তাকে ইসলামের ব্যাপারে ব্যাখাকারী মনে করেন তার ইজতেহাদ ভুল হয়েছে সে জন্য সে গুনাহগার মুজতাহেদ এবং একটি সুয়াবের অধিকারী, এমনকি আপনাদের অনেকেই এও বলেন, যে হুসাইনকে ত তার নানার তরবারী দিয়েই হত্যা করা হয়েছে। এর দ্বারা শুধু এজিদের কর্মকেই বৈধ সাব্যস্ত করা হয়।

তাই এখন যদি আমি এভাবে ইসলামের ইজতেহাদ করি আর কতিপয় সাহাবার ব্যাপারে সমালোচনা করি তাদের কর্মের আলোকে– আর কতিপয় কে তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণেই যদি আমি উত্তম মনে করি তাহলেও ত ভুল হলে একটি আর সঠিক হলে দুটি নেকী পাওয়ার কথা যেহেতু আমার ইজতেহাদকে মাবিয়া ও এজিদের নবী পরিবারের লোকদের হত্যার সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ তাছাড়া তারাতো ইসলামের মূলে আঘাত করেছে, আর নবীর সন্তানদের হত্যা করেছে– তাদের কর্মই তাদের বাস্তবতা নির্ণয় করে, তার পরও তারা মুজতাহেদ, আর আমি তো উদ্দেশ্যমূলক বরং হাজারও ফেরকাবাজির মাঝখান থেকে একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল খুঁজে বের করে করার জন্য দলিলের ভিত্তিতে পর্যালোচনামূলক আলোচনা করছি; তার পরও আমি কেন সওয়াব পাব না? কেন গুনাহগার হব। তাছাড়া আমার নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন।

মাওঃ "আরে বেটা, এজতেহাদের সময়ত অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে"।

আমিঃ "কে বন্ধ করলো?"

মাওঃ "চার ইমাম অর্থাৎ আবু হানিফা, শাফী, মালেক, হাম্বালী।"

আমিঃ "যদি আল্লাহ তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং সঠিক পথে পরিচালিত সাহাবারা বন্ধ না করে থাকেন (তাহলে আমিও তাদের মতোই ইজতেহাদ করবো, তাতে কোন অপরাধ হতে পারে না।"

মাওঃ "যতক্ষণ তুমি সতেরটি এলেম না জানবে, ততক্ষণ ইজতেহাদ করা বৈধ নয়। যেমন কোরানের তফসির, ভাষাবিজ্ঞান, গ্রামার, হাদীস, ইতিহাস ইত্যাদি।"

আমিঃ "এজন্যে আমি ইজতেহাদ করতে চাই না যে, কোরআন হাদীস ও সুন্নাহর নিয়মগুলো জনগণকে শুধু বলবো বা ইসলামের ভিতর আমিও একটা মাজহাবের প্রধান হয়ে যাব। বরং আমি শুধু সত্য-মিথ্যাকে জানতে এবং এও অবগত হতে চাই যেমন আলী (আঃ) সত্যের পথে ছিলেন না মাবিয়া। শুধু এজন্যেই আর তার জন্যে সতের রকমের জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না বরং উভয়ের জীবন পর্যালোচনাই, সঠিকভাবে জানার জন্য যথেষ্ট।

মাওঃ তা জেনে তোমার কি দরকার? *যে লোকগুলো চলে গেছে তাদের কর্মফল তাদের এবং তুমি যা করবে তদানুযায়ী তোমার কর্মফল এবং তোমাকে তাদের কর্মফল সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে না।* সুরা বাকারা-১৩৪।

আমিঃ "আপনি তুসালুন এর উপর 'পেশ' পড়েন না 'যবর'?"

মাওঃ আমি 'পেশ' পড়ি।

আমিঃ আল্লাহর শুকরিয়া। যদি আপনি জবর পড়তেন তাহলে আলোচনার অবকাশই ছিল না। তাতে অর্থ হতো তোমাদের প্রশ্ন করার অধিকার নেই কিন্তু পেশ পড়ায় অর্থ হবে তাদের কর্মের জন্য তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না। যেমন অন্য জায়গায় আছে- *প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।* কোরআন ৭৪ঃ৩৮

কোরান আমাদেরকে বরং পূর্বের উম্মতদের অবস্থা জানার জন্য উদাত্তভাবে আহবান করেছে এবং বলেছে তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহন কর। তাই খোদা, ফেরাউন, নমরুদ, এর ঘটনা আলোচনা করেছে। এভাবে অতীতের নবীদের কথাও আলোচনা হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয় বরং সত্য মিথ্যা সম্পর্কে জানার জন্য।

এখন কথা হলো আপনি বলেছেন- "অতীতের কাসুন্দী ঘেটে আমার কি লাভ"? তাহলে আমার কথা হলো "এতে আমার ফায়দা রয়েছে প্রথমতঃ আল্লাহর ওলীকে জেনে তাঁর সাথে মহব্বত করবো

আর দুশমনকে জেনে তার সাথে দুশমনী করবো"। আর কোরআন এটাকে ফরজ করেছে। দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো যে সব ইবাদত আমাকে করতে বলা হয়েছে তা কিভাবে আদায় করবো। সেটা কি আল্লাহর কথা আল্লাহর নির্দেশমত পালন করবো, না কি আবু হানিফা বা শাফীর কথা মত পালন করবো। যেমন ইমাম মালেক নামাজে "বিসমিল্লাহ" বলাকে মাকরুহ বলেন। আবু হানিফা, বলাকে ওয়াজেব জানেন। আর অন্যরা বলেন "বিসমিল্লাহ" ছাড়া নামাজ হয় না। যেখানে নামাজ দ্বীনের মৌলিক স্তম্ভ, সকল কর্মের উৎসস্থল, কবুলিয়াতের গ্যারান্টী, তাই আমি চাই না যে আমার নামাজ বাতিল হউক। এমনিভাবে যেমন শিয়ারা বলে– ওজুতে পা মসেহ করা ওয়াজেব। সুন্নিরা কয় পা ধৌত করা ওয়াজিব, আর কোরআন বলে "তোমার মাথা ও পা মসেহ কর" তাহলে মাওলানা আপনিই বলুন কোন বিবেকবান মুসলমান কি এ হযবরল অবস্থায় কোন বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া ইবাদাত করতে পারে?

মাওঃ "তুমি এটাও করতে পার যে, সকল মাযহাবের ভাল ভাল দিক গুলি গ্রহণ করতে পার। কেননা সবগুলি ইসলামি মাহযাব এর কেন্দ্র বিন্দু হলো রাসুল (সঃ)।"

আমিঃ "আমার ভয় হচ্ছিল কখন না জানি আমি আবার এই আয়াতের আওতায় না পড়ে যাই যে *"তুমি কি সেই ব্যক্তিকেও দেখেছো যে নিজের মর্জিকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।আর তার অবস্থা জেনে শুনে খোদা তাকে গুমরাহিতে ছেড়ে দিয়েছে আর তার কান ও মনে মোহর (সিল) লাগিয়ে দিয়েছে আর তার চোখে পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং খোদা ছাড়া তার হেদায়েত কে করতে পারে? তাহলে তোমরা কি এটাও উপলব্ধি করতে পার না!"* – জাসিয়া–২৩।

আমিঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বিষয়কে কোন মাজহাব হারাম আর কোন মাজহাব হালাল বলতে থাকবে; ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা মানবনা, যে সকল মাজহাবই সত্যের দিকে আছে। কেননা ইহা অসম্ভব যে একটি বিষয় একই সময় হারাম এবং হালালও হয়। নবীর কাজে কোন পরস্পর বিরোধী কথা ছিল না। কেননা সবাই কোরআনের আলোতে ছিল।

"ইহা যদি খোদা ছাড়া অন্য কারুর হত তবে তারা এতে অনেক অসামঞ্জস্য পেত।" সুরা নেসা-৮২।

আর কেননা এ সব মাজহাবে অনেক অসঙ্গতি পাওয়া যায় এইজন্য এটা না খোদা থেকে না রাসুলের কাছ থেকে এসেছে কেননা রাসুল (সাঃ) কোরআনের বিপরীত বলতে পারেন না।

মাওঃ "তিনি যখন অনুভব করলেন আমার কথা যুক্তিযুক্ত ও দলিল খুবই মজবুত।তখন বললেন, মিয়া আমি তোমাকে খোদার নৈকট্য লাভের নছিহত করছি। তুমি যেটা ইচ্ছা সন্দেহ করতে পার। কিন্তু সাবধান! খোলাফেয় রাশেদীনের ব্যাপারে সন্দেহ কর না কারণ এই চারজন হল ইসলামের খুটি। একটি ভেঙ্গে গেলে গোটা প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে"।

আমিঃ "আল্লাহ না করুন জনাব, এই চারজন যদি ইসলামের খুটি হয় তাহলে রাসুল (সাঃ) কি"?

মাঃ "তিনি তো নিজেই অট্টালিকা পুরা ইসলামটাই হুজুরের।"

আমিঃ "মাওলানার এই ব্যাখা শুনে মুচকি হাসলাম এবং আবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়লাম। মাওলানা আপনি কোন চিন্তা ছাড়াই কথা গুলি বললেন, এর অর্থ দাড়ালো যে এই চারজন ছাড়া রাসুলে খোদা (সাঃ) এর সত্বা অর্থহীন"। অথচ কোরআনে বলা হয়েছে। *"তিনিই তাঁর রাসুলকে পাঠিয়েছেন পথ নির্দেশ এবং সত্য দ্বীন দিয়ে যাতে সেই দ্বীনকে তিনি সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"* (সূরা-ফাতাঃ ২৮ আয়াত)

খোদা মোহাম্মদ (সাঃ) কে বার্তাসহ পাঠিয়েছেন। এই চারজনের কাউকেই এতে অংশীদার করা হয়নি। এ ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন যে *"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যই রাসুল পাঠিয়েছি। তিনি পাঠ করবেন তোমাদের জন্য আমার নির্দেশনসমূহ এবং তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করবেন এবং শিক্ষা দিবেন তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা, আরো শিক্ষা দেবেন তোমাদেরকে সে সব যে গুলি সম্পর্কে তোমরা অবগত ছিলো না।"* (সূরা- বাকারা, ১৫১)।

মাওঃ "আমরা তো আমাদের বুজুর্গ এবং ইমামদের কাছ থেকে এটাই শিখেছি এবং আমরা আমাদের যুগের আলেমদের সাথে ঝগড়া করতাম না, তর্ক করতাম না, যে ভাবে আজকে আপনি আমাদের সাথে করছেন। আপনি তো সবকিছুতেই সন্দেহ করছেন। অবস্থাটা

এমন হলো যে এখন দ্বীনের উপর আপনার সন্দেহ আসবে, আর এটা কিয়ামতের লক্ষণ। কারণ রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, কেয়ামত মানুষের খারাপ কাজের পরিণতি হিসেবে আসবে"।

আমিঃ "মাওলানা আপনি আমাকে কেন অযথা ভয় দেখাচ্ছেন। খোদা না করুন যদি আমি স্বয়ং দ্বীনের উপর সন্দেহ করিও, না অন্যকে সন্দেহতে ফেলি। খোদার কাছে আশ্রয় চাই। আমি খোদার একত্ববাদে বিশ্বাসী। ফেরেস্তা এং তাঁর অবতীর্ণ কিতাব সমূহে বিশ্বাসী। তাঁর প্রেরিত নবী রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসী। আমি খোদার বান্দা এবং শেষ রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর বিশ্বাসী। যিনি সমস্ত নবী রাসূলদের সরদার, তাই আমি একজন মুসলমান। তারপরও আপনি আমার উপর কেন দোষারোপ করছেন"?

মাওঃ "আমি তোমার উপর এর চেয়েও বড় অভিযোগ উত্থাপন করতে চাই। তুমি আমাদের নেতা আবু বকর এবং ওমরের উপর সন্দেহ করছো। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন "যদি আমার সকল উম্মতের ঈমানকে এক পাল্লায় দেওয়া হয়। আর আমার আবু বকরের ঈমানকে আর এক পাল্লায় দেওয়া হয় তাহলে আবু বকরের পাল্লা ভারী হবে"। ওমরের বেলায় বলা হয়ঃ আমার উম্মতকে আমার কাছে আনা হলো তখন তারা এমন জামা পরেছিল যা দ্বারা বুক পর্যন্ত আবৃত হয় না। অতঃপর ওমরকে আমার সামনে আনা হলো তার জামা মাটিতে রেখা টানছিল। লোকজন জিজ্ঞাসা করল হুজুর এর ব্যাখ্যা কি? বল্লেন দ্বীন। অথচ তোমরা এই চৌদ্দশত হিজরীতে এসে সাহাবাদের আদলে (ন্যায় পরায়নতা) সন্দেহ করছ। তাও আবার আবু বকর এবং ওমরের মত ব্যক্তিকে নিয়ে? তোমরা কি জাননা ইরাকবাসীরা মুরতাদ, মুনাফিক, ইসলামী ঐক্যের বিরোধী।

আমার বুঝে আসছিল না। এই ব্যক্তিকে আমি কি বলব যে নিজের জ্ঞান ও পান্ডিত্বের দাবী করে এবং তার মধ্যে এতই গোঁড়ামি দেখাচ্ছিল যে সে আমাদের মধ্যকার উত্তম কাঠামোগত সুন্দর আলোচনাকে মিথ্যা ও প্রচারণাপূর্ণ বিশৃঙ্খল কথাতে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তার প্রসংশাকারী কিছু লোকের সম্মুখে সে কথাগুলো বলছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাগে ও উত্তেজনায় তাদের চোখ, মুখ লাল হয়ে গেছে। আর আমি তাদের চেহারা থেকে অসন্তুষ্টি

অনুমান করছি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম এবং "ইমাম মালেকের কিতাব মুয়াত্তা এবং বোখারী নিয়ে আসলাম" আমি নিবেদন করলাম "মাওলানা সাহেব" আমাকে যে বিষয়ে আবু বকরের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করছে তা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) স্বয়ং নিজেই বলেছিলেন? মুয়াত্তা পড়ুন। মালেক রেওয়ায়েত করেছেন, রাসুল (সাঃ) ওহুদের শহীদের ব্যাপারে বললেন- "আমি তাদের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিচ্ছি"। তখন আবু বকর বললেন- "আমরা কি তাদের ভাই নই"? তারা যেভাবে মুসলমান হয়েছিল আমরাও কি সেভাবে মুসলমান হই নাই? আমরাও কি তাদের মতন জিহাদ করি নাই? যেভাবে তারা করেছে। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, "হ্যা তা ঠিক। কিন্তু আমি জানি না আমার মৃত্যুর পর তোমরা কি কি বিদাত সৃষ্টি করবে"। এরপর আবু বকর কাঁদেন, খুব কাঁদেন এবং বলেন "আমরা আপনার পরে অবশিষ্ট থাকবো" *(মোয়াত্তা প্রথম খন্ড ৩০৭) পৃষ্ঠা।) আল মাগাজি লিন ওয়াকেদি ৩১০ পৃষ্ঠা।)*

অতঃপর আমি বোখারী খুললাম এবং পড়লাম একদা ওমর বিন খাত্তাব- হাফসার কাছে আসলেন, হাফসার কাছে আসমা বিনতে উমাইশ ও ছিলেন। ওমর আসমাকে দেখে বললেন- "এ কে"? হাফসা বললেন- "আসমা বিনতে উমাইস" ওমর বললেন "এই কি সেই ইথিয়োপিয়াবাসী", আসমা বললেন, "জি হ্যা"। তখন ওমর বললেন- "আমাদের হিজরত তোমাদের পূর্বে তাই রসুলে খোদা (সাঃ) এর ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার"। এ কথায় আসমার রাগ হলো তিনি বললেন- "কখনই না, খোদার কসম! এ হতে পারে না। তোমরা রাসুল (সাঃ) এর সাথে ছিলে, তিনি তোমাদের ভুখাদের খাবার খাইয়েছেন।, অজ্ঞদের ওয়াজ করে শিখাতেন। আর আমরা এমন স্থানে ছিলাম- যা বিদেশ ও দুশমনদের জায়গা। হাবশায় আমরা যা করেছি তা শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) এর জন্য। খোদার কসম! আমরা যখনই যা পেয়েছি, খেয়েছি বা পান করেছি, তখন রসুলের (সাঃ) স্মরণ অবশ্যই করতাম। আমাদেরকেও কষ্ট দেওয়া হতো। আমরা সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম। তাই আমাদের মত তোমরা কি করে হতে পার? আমি ঘটনা রাসুলের (সঃ)- এর কাছে বলবো খোদার কসম! না মিথ্যে বলব, না বাড়িয়ে বলবো, না কমিয়ে বলবো"। অতঃপর রাসুল যখন

আসলেন- তখন আসমা হুজুরকে জিজ্ঞাস করলেন, "হে রাসুল (সাঃ) ওমর এই কথা বলেছে। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন- 'তুমি কি বলেছো'? আসমা বললেন- "আমি এই এই বলেছি"। রাসুল (সাঃ) বললেন- "তোমাদের চেয়ে সে বেশী হকদার নয়, সে এবং তার সঙ্গীরা এক হিযরত করেছে আর তোমরা হেজাজের লোকেরা দুই হিজরত করেছ"। আসমা বর্ণনা করছেন- "(এই ঘটনার পর) আবু মুসা ও হেজাজের অন্যান্য লোকজন সব সময় আমার কাছে আসতেন এবং এই হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করতেন। দুনিয়ার এমন কোন জিনিস নেই যে তাঁদের অন্তরকে এই হাদীসের চেয়ে বেশী খুশী করতে পেরেছে। আর এই হাদীসের চেয়ে গুরুত্ব ও তাদের কাছে পৃথীবির আর কিছু নেই"। *(সহী বোখারী ৩য়, খন্ড পৃঃ ৩৮৭)*

যখন মাওলানা এবং তাঁর সঙ্গীরা এই হাদীস পড়লেন তখন তাদের চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে এবং সবাই অপেক্ষা করতে থাকে যে দেখি মাওলানা এখন কি উত্তর দেয়। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে মাওলানা চোখ মেলে চাইলেন- বললেন- "হে খোদা আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর"।

আমিঃ বললাম, "যখন রসুলে খোদা (সাঃ) নিজে আবু বকরকে সন্দেহ করতেন এবং সাক্ষ্য দেন নি। কারণ হুজুর (সাঃ) জানতেন না যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা কি কি করবে? এবং স্বয়ং রাসুল (সাঃ) যখন আসমার উপর ওমরের ফজিলতও গ্রহণ করেননি বরং আসমাকে ওমরের উপর ফজিলত দিয়েছেন। তাহলে আমাদেরও সত্য না জানা পর্যন্ত সন্দেহ করার অধিকার আছে। সুতরাং এই হাদীসগুলো স্পষ্টতঃ আবুবকর ও ওমরের স্বপক্ষে এ পর্যন্ত যত হাদীস এসেছে তার অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। এই দুটি হাদীসই সেই সব ফজিলতের হাদীসগুলোকে বাতিল করে দেয়। উপস্থিতগণ বললেন তা কি রকম?

আমিঃ "রাসুলে খোদা (সাঃ) আবু বকরের বিশেষ মর্যাদার সক্ষ্য দেন নি কারণ তিনি জানেন না যে তাঁর ইন্তেকালের পর তারা কি কি করবে? এটা কোরআন থেকে প্রমাণিত ইতিহাস সাক্ষী। তারা রাসুল (সাঃ) এর পর অনেক পরিবর্তন করেছে। এজন্যেই আবু বকর

কেঁদেছেন, কারণ তিনিও পরিবর্তন করেছেন। এবং হযরত ফাতেমা (আঃ) কে রাগান্বিত করে ছিলেন। এসব কারণে মৃত্যুর আগে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আকাংখা করে ছিলেন যদি তিনি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হতেন।

এখন রয়ে গেল ঐ হাদীস যে হাদীসে বলা হয়েছে সমস্ত উম্মতের ঈমানের চেয়েও আবু বকরের ঈমানের পাল্লা ভারী হবে। হাদীসটি বাতিল এবং কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যুক্তিতো মানতেই চায় না। সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মোশরেক ছিলেন, দেবদেবীর পুজা করতেন, তার ঈমান গোটা মুসলমানের ঈমানের চেয়েও বেশী তা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না, কেননা উম্মোতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে ওলী আল্লাহ, শহীদ এবং ইমামগণ রয়েছেন যারা গোটা জীবন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন তাই আবু বকরের জন্যে এই হাদীস কি করে যৌক্তিক হতে পারে? যদি ধরেও নেওয়া হয় তাহলে শেষ জীবনে নিজে মানুষ হওয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলেন কেন? তার ঈমান যদি বেশী হবে তাহলে ফাতেমা (আঃ) তার উপর অসন্তুষ্ট হতেন না, প্রত্যেক নামাজের পর তার জন্য বদদোয়া করতেন না।

কথা শুনে মাওলানা চুপ করে রয়েছেন, কিন্তু উপস্থিত অনেকে বলেছেন খোদার কসম, এই হাদীস আমাদেরকে সন্দেহে নিপতিত করেছে। তখন মাওলানা বললেন, "আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন? যে সকলেই যেন সন্দেহে পড়ে যায়"। আমি কথা বলার আগেই তাদেরি এক জন বলে উঠলো "জি না, সত্য তাদের সাথে আছে আমরা আমাদের জীবনে কোন কিতাব পুরাপুরি পড়িনি, আমরা তো আপনাদের অন্ধ অনুসরণ করি। আপনারা যা বলতেন তাই আমরা বিনা বাক্যে মেনে নিতাম"।

এখন আমাদের কাছে সত্য জিনিসটাই প্রকাশ হয়ে গেছে। হাজী সাহেবের কথাই ঠিক। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এই গুলো পড়া এবং তা পর্যালোচনা করা। উপস্থিত অন্যান্যরা তার কথায় শায় দিলেন। এতে সত্য ও ন্যায়ের জয় সূচীত হলো, এই জয় কোন জোর যবরদস্তির মাধ্যমে হয়নি, হয়েছে দলিল ও কোরআনের যুক্তি দ্বারা। আল্লাহ্ বলেন *"যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে নিজের দলিল উপস্থাপন কর"*। আল কোরআন– ২৭ঃ৬৪।

এই ঘটনার পর আমি এই বিষয় গুলোর উপর একাধারে তিন বছর বিচার বিশ্লেষণ, গবেষণা করি, কেননা যেগুলি পড়েছি সেগুলি আবার পড়েছি অনেক সময় একই বই বার বার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। অতঃপর আমি আল্লামা শরফুদ্দিন মৌসুরির ''আল মোরাজাত পড়ি এবং বেশ কয়েক বার পড়ি এবং এ বইটি আমার হেদায়েতের পথে পাথেও হয় এবং অন্তরে আহলে বায়তের প্রতি আমার মহব্বত উপচিয়ে ওঠে। জনাব শেখ আমিনির গ্রন্থ 'আল গাদির' তিন-বার পড়ি কারণ এটা সঠিক তথ্যের সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ। এ ছাড়াও আমি শহীদ সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের সদর এর বই 'ফেদাকের ইতিহাস' এবং শেখ মোহাম্মদ রেজা মুজাফফর এর বই 'সাকিফা 'পড়ি। এই ঘটনা আমার অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দেয় ও মনের দরজা খুলে দেয় এবং বিস্‌মিল্লাহ্ ওয়া বিল্লা ওয়া আলা মিল্লাতে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে আমার কর্মে ঝাপিয়ে পড়লাম। আমি আশা করি, যে সত্যকে অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সহায় হন এবং তিনি কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। এ দুটি বই পড়ে অনেক গোপন তথ্য জানা গেল। এভাবে 'কিতাবুল আল নাস ওয়াল ইজতিহাদ' পড়ি। এটা পড়ে আমার ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। অতঃপর আল্লামা শরফুদ্দিনের কিতাবে 'আবু হুরাইরা' পড়ি এবং শায়খ মাহামুদ আবু রাইয়াহ্ আল মিসরীর 'শয়খুলমুদীর' পড়ি এবং এটা পড়ে বুঝতে পারি যে, হুজুর (সাঃ) এর ইন্তকালের পর আহ্‌কাম পরিবর্তনের সাহাবী দুই ধরণের ছিলেন। এক এমন লোক যারা ক্ষমতার দাপটে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে সুন্নতের ভিতর পরিবর্তন করেছেন। দুই- এমন লোক যারা রাসুল (সঃ) এর নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে পরিবর্তন করেছেন।

আল্লামা আসাদ হায়দারের "আল ইমাম সাদেক (আঃ) ও চার মাযহাব বই পড়ি"। এতে বুঝতে পারি এলহামি জ্ঞান যা আল্লাহ্ মেহেরবাণী করে জ্ঞানীদের দান করে এবং অর্জিত জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য কত? এবং আল্লাহ্ যাদের হেকমত দিয়ে থাকে তাদের

ইজতেহাদ এবং মনগড়া ইজতেহাদের উপর আমল করার পার্থক্য কত? এই দুই প্রকারের ইজতেহাদ ইসলামী উম্মাকে ইসলামের মূল থেকে কত দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর সাইদ জাফর মুর্তজা আল আমিলী সাইদ মর্তুজা আল আসকারী, সাইদ খুই, সাইদ তাবাতাবাই, সায়েখ মোহাম্মদ আমিন জয়নাদীন, ফায়রুজা আবাদি, ইবনে আবিল হাদীদ আল মুতাজেলীর শাহারুল নাহজুল বালাগা, তাহা হোসেনের আল ফেতনাতুল কোবরা ইত্যাদি গ্রন্থ পড়ি।

ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে আমি পাঠ করি তারেকে তাবারি, ইবনে আছির, মাসুদি, আল ইয়াকুবী, ছাড়া ও আরো অনেক বই পড়ি। অতঃপর আমি নিশ্চিত হই যে, ইসনা আসারী দলটাই সঠিক। অতএব আমি শিয়া হয়ে গেলাম। এবং আল্লাহর রহমতে আহলে বায়তের নৌকায় আরহণ করেছি এবং তাদের ভালবাসায় নিজেকে ধন্য করেছি। কেননা 'আলহামদুলিল্লাহ' তাঁদেরকেই আমি সাহাবীদের বিকল্প পেলাম। যাদের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস মাত্র গুটি কয়েক বাদে তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের পরিবর্তে নবী পরিবারের পবিত্র ইমামদের সাথে মিশে গিয়েছি যাদের থেকে আল্লাহ অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং যাদেরকে ভালবাসা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন।

অনেক আলেম আবার বলে থাকেন শিয়ারা সেই সব পার্সি এবং অগ্নি পুজক যাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি হযরত ওমর কাদিসিয়ার যুদ্ধে ধ্বংস করেছিলেন। এজন্য শিয়ারা ওমরকে দুচোখে দেখতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তাই আমি এই সব মূর্খদের বুঝাতে চাই শিয়ারা পার্সির সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং ইরাক,-সৌদি, সিরিয়া, লেবাননে অসংখ্য শিয়া পাওয়া যায়। এরাতো পার্সি নয় বরং আরবী। এভাবে পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, আফ্রিকা, আমেরিকা চীন, সুদান, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, বাংলাদেশ সহ আরো অনেক দেশে শিয়া রয়েছে যারা না আরবী না পার্সি।

আর যদি আমরা শুধু ইরানকেই শিয়া হিসাবে মনে করি তাহলে প্রমাণ আরো মজবুত হয়। কেননা আমি পার্সিয়ানদেরকে বার ইমামে বিশ্বাসী দেখেছি, এ সেই বারোজন ইমাম সবাই আরবী, কোরাইশ, হাশিমী। রসুল (সাঃ) এর বংশের লোক। যদি ইরানীরা এ ব্যাপারে একঘোঁয়েমি করত তা হলেতো আরবদের অপছন্দ করত এবং তারা কোন পার্সি মুসলমানকে ইমাম বানিয়ে নিত। কেননা সালমান ফার্সি ইরানী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় সাহাবী, শিয়া সুন্নী সকলেই তাঁকে সম্মান করত। এর বিপরীতে আহলে সুন্নাতদের আমি পেয়ে থাকি যে তাদের ইমামদের অনেকেই ইরানী। যেমন আবু হানিফা, ইমাম নাসায়ি, তিরমিজি, বোখারী, মুসলিম, রাজি, ইবনে মাজা, গাজালি, ইবনে সিনা, ফারাবীসহ আরো অনেক। এভাবে লিখলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা যাবে। যদিও আমরা এটা যুক্তি তর্কের খাতিরে মেনে নেই ইরানের শিয়াগণ হযরত ওমরকে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ ওমর তাদের মর্যদা, বড়ত্ব ও গর্বকে খর্ব করে দিয়েছিলেন। তাহলে আরবের শিয়া বা অনারব (ইরানী ছাড়া) শিয়াগণ কেন ওমরকে ছেড়ে দিয়েছেন। আসলে এই দাবীর কোন যৌক্তিকতা নাই। মূলত শিয়াগণ ওমরকে ছেড়ে দিয়েছে কারন হলো তিনি হযরত আলী (আঃ) কে রাসুল (সাঃ) এর পরে খলিফা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং উম্মতে মুসলেমাকে গৃহযুদ্ধ এবং মছিবতে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সত্য উন্মোচিত হওয়ার পর এখন যে কোন মুক্ত চিন্তার অধিকারী আলেমের চোখের পর্দা খুলে যাবে এবং সত্য উপস্থিত হবে এবং তিনিই অতীত কোন দুশমনী ছাড়াই ওমরকে ছাড়তে বাধ্য হবেন। সত্য এবং ইনছাফের কথা হলোএই যে, শিয়া ইরানী হোক, আরবী হোক, বা অন্য যে কোন দেশের হোক তারা কোরআনের আয়াত এবং হাদীসে রাসুল (সাঃ) এর সম্মানের কাছে আত্মসমপণ করেছেন এবং হেদায়াতের ইমাম হযরত আলী (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের অনুসরণ করেছে। উমাইয়া এবং আব্বাসীদের জুলুম নির্যাতন অথবা দুনিয়ার কোন লোভ লালসা

তাদেরকে ছয়শত বৎসর পর্যন্ত আহলে বায়তের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। অথচ ছয়শত বৎসর শিয়াদের কতই না নাজেহাল করা হয়েছে। ন্যায্য সরকারী সাহায্য প্রাপ্তদের তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের খুঁজে খুঁজে পাহাড় পর্বত এবং কুয়ার ভিতর থেকে এনে হত্যা করা হয়েছে। এমন সব মিথ্যা প্রপাগান্ডা তাদের নামে ছড়ানো হয়েছে মানুষ তাদের শত্রু ভাবতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থা আজও আছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শিয়াগণ ইমামে আহলে বায়েত ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য স্বীকার করেনি। কিন্তু এসব প্রতিকূলতাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করে শিয়াগণ সত্যের রশি আঁকড়ে ধরে আছে। তারা অহেতুক কোন অপবাদের তোয়াক্কা করেনি। আজকেও আমি বড় বড় আলেমদের চ্যালেঞ্জ করছি, যদি তারা শিয়াদের বড় কোন আলেমের সাথে বসেন এবং এ বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা করেন তা হলে তাদের বিবেক থাকলে, শিয়া না হয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না।

সেই খোদার শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। কারণ "খোদা হেদায়েত না দিলে আমাদের হেদায়েত পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যিনি আমাকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছেন। যে পথ আমি অনেক বৎসর ধরে খুঁজেছি। এখন আমার বিশ্বাস হযরত আলী (আঃ) এবং আহলে বায়েতের অনুসরণই উত্তম। কোরানের বাণী ও রাসুল (সাঃ) এর অনেক হাদীস এ ব্যাপারে রয়েছে। এ বিষয়ের উপর ইজমাও হয়েছে। তাছাড়া যে একটু চিন্তা ভাবনা করবে তার জন্য বিবেকই হবেই বড় প্রমাণ। সব কথার উপর আলী (আঃ) হলেন সব সাহাবীদের মধ্যে জ্ঞানী, সব চেয়ে বীর এ ব্যাপারে সকলেই একমত। শুধু তাই নয়, এই ঐক্যমতই আলী (আঃ) এর খেলাফত প্রাপ্তির অগ্রাধিকারের উপর বড় প্রমাণ। এরশাদ হচ্ছে- *এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয়ই খোদা তালুতকে তোমাদের বাদশা করেছেন। তারা বললো, কিভাবে আমাদের উপর তার হুকুমত হতে পারে, কেননা এই রাজত্বের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশী আমরা হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী করা হয়নি। তিনি (নবী) বলিলেন, খোদা*

তোমাদের জন্য তাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞান ও দৈহিক কর্মদক্ষতা দান করেছেন এবং খোদা যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। কেননা তিনি ক্ষমতাবান সকল বিষয়ই অবগত আছেন। (বাকারা ২৪৭ আয়াত)।

এবং রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "আলী আমার থেকে এবং আমি তার থেকে এবং আলীই আমার পর সমস্ত মোমেনদের ওলী *(তিরমিজি ৫ম খন্ড ২৯৬ পৃষ্ঠা, আল খাছাইছেনছাই ৮৭ পৃষ্ঠা; মোস্তাদরাকে হাকিম ৩য় খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা।)* আল্লামা জামাখশারি হযরত আলীকে নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখেন– "মতোপার্থক্য এবং সন্দেহ বেড়ে গেছে। প্রত্যেকেই এই দাবী করতে থাকে যে তারা সঠিক পথে আছে। তাই আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ধারণ করেছি এবং মোহাম্মদ (সাঃ) ও আলী (আঃ)কে ভালবাসি। একটা কুকুর মোহাব্বতে আসহাবে কাহাফের কারণে কামিআব হয়েছে, তদরূপ আমিও নবীর (সাঃ) এর বংশকে ভালবেসে কেন বিজয়ী হবো না। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমি বিকল্প পেয়েছি। রাসুলে খোদা (সাঃ) এর পর আমিরুল মোমেনিন, সায়েদুল মুরসালিন, আসাদুল্লাহিল গালিব, ইমাম আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ); বেহেস্তে যুবকদের সরদারদ্বয় ইমাম হাসনায়েন (আঃ) এবং বাতুলে মোস্তফা (সঃ), বেহেস্তে নারীদের শিরমণি জনাবে ফাতেমা জাহারা (আঃ) যিনি রাগান্বিত হলে, আল্লাহ স্বয়ং রাগান্বিত হতেন তাঁদেরই অনুসরণ করতে শুরু করেছি।

ইমাম মালেকের পরিবর্তে ইমামদের ওস্তাদ, উম্মতের শিক্ষক হযরত জাফর সাদেক (আঃ) কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেছি। ইমাম হোসেন (আঃ) এর বংশের নয় জন নিষ্পাপ ইমাম এর যাঁরা আছেন এবং অলি আল্লাহর সঙ্গে নেককারদের ধারণ করেছি।

সাবাহীদের মধ্যে যারা তাদের যাহেলী অবস্থানে ফিরে গিয়েছিল যেমন মাবিয়া, আমর ইবনে আস, মোগিরা বিন সোবা, আবু হুরাইরা, আকরামা, কাবে তাদের পরিবর্তে আমি সেই সব সাহবাদের অনুসরণ করছি যারা রাসুলের সাথে এখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন নি। যেমন আম্মার ইবনে ইয়াসীর, সালমান ফার্সী, আবুজারগাফফারী, মেকদাদ ইবনে আসোয়াদ খোজাইমা ইবনে সাবেত ইত্যাদিকে গ্রহণ করেছি।

আমাদের জাতির সেই সব আলেম যারা আমাদের চিন্তা শক্তি অকেজো করে ফেলছে, যাদের অধিকাংশ প্রত্যেক সময়ে ক্ষমতাসীনদের জ্বী হুজুর করেছে, তাদের পরিবর্তে সেই সব শিয়া আলেমদের গ্রহন করছি যারা কখনই দ্বীনের ব্যাপারে অলসতা দেখান নি এবং যারা কখনই কোন জালেম শাসকের দরজার চৌকাটে পা দেয়নি।

হ্যাঁ, আমি আমার বদ্ধমূল ধারণাগত কিন্তু যুক্তিসহ নয় এমন অযৌক্তিক বিশ্বাসের এর পরিবর্তে স্বাধীন, মুক্ত, খোলামেলা চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের গবেষণা কে গ্রহণ করেছি, যা সঠিক দলিল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন আজ কাল বলা হয় আমি ত্রিশ বৎসর ধরে যে ময়লা আবর্জনা সৃষ্টি করেছিলাম তা ধুয়ে মুছে চিন্তা শক্তিকে পরিষ্কার করেছি। অর্থাৎ বনি উম্মায়াদের বিভ্রান্তির পরিবর্তে নিস্পাপদের উপর বিশ্বাস করে আমি আমার ভবিষ্যত জীবনকে পবিত্র করেছি। আমার বাকী জীবনকে পাক করে নিয়েছি।

হে খোদা, মোহাম্মদ (সাঃ) এবং আলে মোহাম্মদ (সাঃ) এর মিল্লাতের উপর এমাকে জীবিত রাখ এবং তাঁর সুন্নাতের উপর আমার মৃত্যু কর এবং তাঁদের সাথে আমার হাশর কর কেননা আমার নবী (সাঃ) বলেছেন- "মানুষ যার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তার সাথেই তার হাশর হবে"। শিয়া হয়ে আমার মূলের দিকে ফিরে এসেছি। কারণ আমার বাপ এবং চাচার (সাজরা) বংশের ধারা অনুযায়ী বলতেন যে, আমরা সে সময়ে আব্বাসী খেলাফতের অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে, ইরাক থেকে হিজরত করে আফ্রিকার এই তিউনিশিয়ায় বসবাস করছি। এখনও সেখানেই আছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অনেকেই আছে যাদেরকে শরিফ বলা হয়। কেননা তারা 'সাদাত' বংশের। কিন্তু পরবর্তিতে তারা বনি উম্মাইয়া ও আব্বাসীয়দের বেদাতে নিপতিত হয়েছে। আর এখন সেই সম্মান টুকুন ছাড়া মানুষের মনে আর কোন স্থান নাই, খোদার শুকরিয়া যে তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে তিনি সত্যকে জানার জন্য আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছেন।

জ্ঞানালোক প্রাপ্তির কারণ সমূহ

যে সব কারণের উপর ভিত্তি করে সত্য জ্ঞান পেয়েছি যদিও তা অনেক, তবুও এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তার কিছু উল্লেখ করছি।

১। খেলাফতের উপর অকাট্য প্রমাণ।

যেহেতু আমি আগেই কসম খেয়েছি যে, বিতর্কিত ব্যাপারে আমি শুধু সেই দলিলগুলোই গ্রহণ করবো, যেগুলো শিয়া-সুন্নি সকলের কাছেই সমভাবে সত্য বলে গৃহীত। এই মৌলিক পদ্ধতিতে আমি- আবু বকর ও আলী (আঃ) এর মাঝে, কার উপরে, কার মর্যাদা বেশী, আলোচনা করবো। আর শিয়াদের দাবী অনুযায়ী বলছি ফেলাফতের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আলী (আঃ) এর পক্ষে সুস্পষ্ট বাণী বর্তমান আছে; না কি ফেলাফতের ব্যাপারটি নির্বাচকমন্ডলী বা সুরার উপর ন্যাস্ত, যা আহলে সুন্নাতগণ দাবী করেন- কোনটি সঠিক তাও আলোচনা করবো।

যারা সমস্ত বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের অনুসন্ধান করবে, তার কাছেই প্রমাণিত হবে যে, আলী (আঃ) এর ফেলাফতের বিষয়ে অকাট্য দলিল আছে। যেমন রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "আমি যাদের মাওলা, আলীও তাদের মাওলা"। হুজুর (সাঃ) যখন বিদায় হজ্জ থেকে মদিনা ফিরছিলেন, তখন এই হাদীস বলেছিলেন। এই বক্তব্যের পর নিয়মানুযায়ী আলীকে সবাই মোবারকবাদ দেয়। হযরত আবু বকর, ওমরও সাধুবাদ দিয়ে বলেছিলেন- "আবু তালেবের সন্তান মোবারক হউক; তুমি সকল মুমেন ও মুমেনার ওলী হয়ে গেলে। *(মসনাদে আহমদ ৪র্থ খন্ড-২৮১ পৃঃ/ সেররুল আলীমীন ১২ পৃঃ/ তাজকেরাতুল হাউজ-২৯ পৃঃ/রিয়াযুন নাজরা ২য় খন্ড-১৯৯ পৃঃ কানজুল আমাল ২য় খন্ড ৩৯৭ পৃঃ আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ৫ম খন্ড ২১২/পৃঃ ইবনে আসির-২য় খন্ড ৫০ পৃঃ তাফসিরে রাজী ৩য় খন্ড ৬৩ পৃঃ/ আল হাবির নাকনতী ১ম খন্ড -১১২ পৃঃ)*

এই হাদীসটির উপর শিয়া সুন্নি সকলেই ঐক্যমত। এছাড়া আরও অনেক হাদীস আছে। যার বেশী আগ্রহ আছে সে যেন আল্লামা আমিনীর 'আলগাদীর' কিতাবটি অধ্যায়ন করেন যাহার ১৩খন্ড ছাপা হয়ে গেছে। এই গ্রন্থে লেখক শুধু সেই রাওয়ায়েতগুলোকেই তুলে ধরেছেন যা সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছেও পাওয়া যায়। লেখক এখানে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রমাণগুলির দু' একটাই উল্লেখ করবেন।

বলা হয় 'সকীফায়' আবু বকরের খেলাফতের বিষয়ে সকলেই একমত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে মসজিদে সকলের বায়াত নেওয়া হয়। এটা এমন একটা দাবী যে ব্যাপারে কোন দলিল নেই কারণ যেখানে হযরত আলী (আঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) হাসেম গোত্রের অনেক সাহাবী, উসামা বিন জায়েদ, সালমান ফারসী, আবু জর গেফারী, মেকদাদ, আম্মার, হুযাইফা, খুবইমা, আবু বুরাইয়াদ আসলামী, বুরা বিন আযেব, আবু কাব, সুহাইল বিন হানিফ, সায়াদ বিন উবাদা, আবু আইয়ুব আনসারী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, খালেদ বিন সাইদ, কায়েস বিন সাদ ছাড়াও আরোও অনেক সাহাবী বায়াত গ্রহণে অস্বীকার করে *(তাবারী, ইবনে আসির, তারিখে খোলাফা, খামিস)* তাহলে আল্লাহর বান্দাগণ বলুন- এজমা কি ভাবে হলো? যদি শুধু আলী বায়াত গ্রহণ না করতেন তাহলেও ইজমার উপর আলী (আঃ) এর একক বিরোধীতাই যথেষ্ট ছিল। রাসুল (সাঃ) দ্বারা তিনি মনোনীত না থাকলেও, তিনি একজন খলীফা পদপ্রার্থী ছিলেন। তাই আবু বকরের খেলাফতের জন্য সকলের ইজমা ছিল বলা নিছক প্রপাগান্ডা ছাড়া কিছু ছিল না।

হযরত আবু বকরের বায়াত কারও পরামর্শ ছাড়াই সম্পন্ন হয় বরং সে দিকে কারও ভ্রুক্ষেপই ছিল না। এমন কি অনেক গোত্রের লোকেরা জানতেই পারেনি যে, বায়াত হয়ে গেছে। যেমন মুসলমানদের দায়িত্বশীল অনেকই তখন রাসুলের (সাঃ) এর দাফন

কাফনে ব্যস্ত ছিলেন । অবস্থা এমন ছিল যে, মদীনাবাসীরা হঠাৎ জানতে পারে যে, হুজুর (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তখন কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়, এমতাবস্থায় জোর-জবরদস্তী করে মানুষের কাছ থেকে বায়াত নেওয়া হয়। তারা যে জবরদস্তি করেছিলেন তার অন্যতম প্রমাণ তারা ফাতেমা (আঃ) এর ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ধমকী দেয়, যদি বায়াত অস্বীকারকারীদের ঘর থেকে বের করে না দেওয়া হয়। এখন আপনিই বলুন, এই যখন অবস্থা তাহলে আবু বকরের খলিফা হওয়া কি করে সর্ব সম্মত ও পরামর্শ ভিত্তিক হয়েছিল? *(তারিখে খোলাফে ১ম খন্ড ৮১ পৃঃ)।*

হযরত ওমর নিজেই বলেন- আবু বকরের বায়াত কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই করা হয়, আল্লাহ্ যেন, মুসলমানদের এই ভুল থেকে বাচান। এখন যদি কেহ এর পুনরাবৃত্তি করে, তাকে হত্যা করা হবে। (অন্য রাওয়ায়েতে আছে) যে এ ধরণের তড়িঘড়ি বায়াতের জন্য দাওয়াত দেবে তাকে হত্যা করে দেব। তাই বুঝা গেল, আবু বকরের বায়াত নেওয়া ও জনগণ যারা তার আনুগত্য করেছে, কোনটাই সঠিক হয়নি। আল-খোলাফা।

আবু বকরের বায়াত গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় হযরত আলী (আঃ) বলেন- খোদার কসম, আবু কাহাফার পুত্র জবরদস্তি, টেনে হিঁচড়ে খেলাফতের জামা পরিধান করেছে। অথচ আবু বকর জানতো খেলাফতের জন্য আমি এতটাই হকদার যে, চুম্বকের চার পাশের লৌহ দন্ডের ন্যায় যাকে (টানলেও ছাড়ান যায় না)। আমার থেকে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত, আমার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

আনসারদের সর্দার সায়াদ বিন উবাদা বর্ণনা করেন- "সাকীফার" দিন আবু বকর এবং ওমর, আনসারদের উপর, জেঁকে বসেছিল। আমি বহু চেষ্টা করেছি তাদের খেলাফত থেকে বিরত রাখবো, কিন্তু অসুস্থতার কারণে পারি নি। যখন আনসারগণ আবু বকরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, তখন সায়াদ বললেন- "আল্লাহর কসম, আমি কোন অবস্থাতেই তোমাদের আনুগত্য করবো না, যতক্ষণ না আমার কাউসে যতগুলো তীর আছে সবগুলো তোমাদের উপর না মারবো।

আমার বল্লম তোমাদের রক্ত দিয়ে না রাংগাবো। যতক্ষণ হাতে শক্তি আছে ততক্ষণ তোমাদের উপর তরবারী না চালাবো এবং আমার বংশ গোত্র নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করবো। মানুষও জিনসহ সবাই তোমাদের আনুগত্য মেনে নিলেও খোদার সাথে সাক্ষাতের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত আমি তোমাদের আনুগত্য করবো না"।

তাই সায়াদ তাদের সাথে জামাত পড়তেন না, জুমা পড়তেন না, হজ্জ করতেন না, যদি সত্যিই সায়াদের সাথে কোন সহযোগী থাকতো তাহলে যুদ্ধ না করে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। হযরত সায়াদ (রাঃ) এ অবস্থায়ই হযরত ওমরের খেলাফত কালে, শামে (সিরিয়া) মৃত্যু বরণ করেন।

স্বয়ং হযরত ওমর বলেন- এটা একটা তড়িঘড়ি বায়াত ছিল, এর ত্রুটি থেকে মুসলমানগণকে আল্লাহ্ বাঁচান। যিনি এই বায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন তার বক্তব্যই এমন, তখন বুঝাই যায় মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল।

মৃত্যু পর্যন্ত এই খেলাফতকে যে মেনে নেন নি, যিনি তাদের সাথে জুমা পড়েন নি, সেই সায়াদ বিন উবাদার কথা মত এই খেলাফত ছিল একটি জুলুমের মহড়া।

বড় বড় সাহাবা বিশেষ করে নবী (সাঃ) এর চাচা এ থেকে দূরে সরে থাকেন। তাই আবু বকরের এই খেলাফত শরিয়তসম্মত ছিল না, বৈধ ছিল না। আসল কথা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে এসবের কোন উত্তর নেই। বরং তাদের কাছেও আলী (আঃ) এর খেলাফতের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমানাদী আছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করেন শুধু সম্মান রক্ষার্থে, তাই শিয়াদের বক্তব্যই যথার্থ, তাদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। জ্ঞান ও বিবেক এটাই বলে। *(সাকিফা ও খেলাফত, নকীফ, আব্দুল ফাত্তাহ্ এ মাকসুদ)*

ফাতেমা (আঃ) এর সাথে আবু বকরের মতবিরোধ

শিয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবই এ বিষয়ের উপর ঐক্যমত। যদি তর্কের খাতিরে কোন বিবেকবান ব্যক্তি না মানতে চান যে, আবু বকর ফাতেমা (আঃ) এর উপর কোন প্রকার জুলুম করেন নি। তবুও আবু বকরের ভুল স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ যিনি এই লোমহর্ষক ঘটনা পড়বেন তারই দৃঢ় বিশ্বাস হবে, আবু বকর জেনে শুনেই জনাবে ফাতেমা জাহ্‌রা (আঃ) কে কষ্ট দিয়েছেন। তাঁকে মিথ্যবাদিনী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। যাতে করে মাসুমা (আঃ) হাদীসে গাদীরে খোমের ঘোষনানুযায়ী তাঁর স্বামীকে খেলাফতের হকদার হিসেবে দলিল উপস্থাপন না করেন। আর এ কথার সত্যতার উপর অনেক প্রমান রয়েছে যেমন- ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন-হযরত ফাতেমা (আঃ) স্বয়ং নিজের স্বামীর জন্য আনসারদের কাছে গিয়েছেন, আনসারগণ বলেছেন "হে নবীর (সাঃ) দুলালী আমরাতো এখন আবু বকরের বায়াত নিয়ে নিয়েছি আপনি যদি আগে আসতেন তাহলে কোন অবস্থাতেই আলী (আঃ)কে ছাড়া আমরা কারও আনুগত্য করতাম না"। আলী (আঃ) বলেন- "তাহলে আমি কি রসুল (সাঃ) এর জানাজাকে ঘরে রেখে ক্ষমতার জন্য দৌড়ে যেতাম, দাফন-কাফন না করেই"? ফাতেমা (আঃ) জনতাকে বলেছেন, হাসানের বাবা তাই করেছে যা করা উচিৎ ছিল, আর তারা যা করেছে তাদের ব্যাপারে খোদাই ফয়সালা করবেন। *(তারিখে খোলাফা ১ম খন্ড- ১৯ পৃঃ)।*

যদি আবু বকর একাজ ভুল ও অদূরদর্শিতার কারণে করে থাকতেন তাহলে ফাতেমা (আঃ)কে তিনি বুঝ দিতেন, তাঁকে আশ্বস্ত করতেন। আবু বকর সব সময় ফাতেমা (আঃ) এর দাবী অস্বীকার করেছেন। না আলী (আঃ) এর না ফাতেমার (আঃ), কারও সাক্ষীই তিনি গ্রহণ করতে চাননি। এসবের জন্যই ফাতেমা (আঃ), অসন্তুষ্ট

হয়ে স্বামীকে বলেছিলেন- "মরার পর আমাকে চুপি চুপি রাতের বেলা দাফন করো, তাদেরকে আমার জানাজায় আসতে দিয়ো না"। *(বোখারী ২য় খন্ড- ৩২ পৃঃ মুসলিম, ২য় খন্ড ৭২ পৃঃ)।*

আমি (লেখক) যখনি মদীনায় গিয়েছি, তখন খুব চেষ্টা করেছি এ ঘটনার মুলোৎঘাটনের, আর যা পেয়েছি তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

(১) জনাবে ফাতেমা (আঃ) এর কবর অজ্ঞাত, কেউ জানেন না তা কোথায়, অনেকের মতে নবী (সাঃ) এর হুজুরার ভিতরে আছে আবার কেও মনে করেন- নবীর হুজরার বিপরীতে তাঁর যে ঘর ছিল সেখানেই আছে। অনেকে মনে করে অন্যসব আহলে বায়তের কবরের মাঝে জান্নাতুল বাকীতে তাঁর কবর। কিন্তু সঠিক অবস্থান কেহ বলতে পারেননি।

এতে করে আমার যা মনে হয় তা হলো হযরত মাসুমা (আঃ) রাতের আধারে তাঁকে চুপি চুপি দাফন করার কথা কেনো বলেছিলেন হয়ত কালক্রমে মানুষ যেন জানতে চায় তাঁর এমন কি হয়েছিলো, যে জন্য তিনি স্বামীকে এমন ওসিয়াৎ করেছিলেন? আর এ পথ বেয়েই মানুষ যেন সত্যের সন্ধান পায়।

(২) হযরত উসমানের কবর জিয়ারতের জন্য কেউ গেলে তাকে অনেকটা পথ এগিয়ে একেবারে জান্নাতুল বাকীর শেষ প্রান্তে যেতে হয়। সেখানে একটা দেওয়ালের নিচে তার কবর। আর অন্যসব সাহাবীর কবর ঢুকতেই ভিতরে পাওয়া যায়, এমন কি তাবে তাবেইনদের অন্যতম হযরত মালেকের কবরও তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়। তার কবরও হুজুর (সাঃ) এর স্ত্রীদের কবরের পাশেই। আর এতে করে ঐতিহাসিকদের সেই কথাই প্রমাণিত হয় যে উসমানকে 'হাসো কাওকাবে' দাফন করা হয়েছে। 'হাস্যে কাওকাব' হলো ইহুদীদের ভূমি। যখন উসমানকে মুসলমানগন জান্নাতুল বাকীতে দাফন করতে দেয়নি, তখন তার আত্মীয়রা বাধ্য হয়ে সেখানে ইহুদির কবরস্থানে তাকে দাফন করে। পরবর্তীতে মাবিয়া সে জায়গাটি কিনে জান্নাতুল বাকীর সাথে মিলিয়ে দেয় যাতে বুঝা যায় যে উসমানের কবরও বাকীতেই অবস্থিত। যে কেহ সেখানে গেলে তার কাছেই এই সত্য উদ্ঘাটিত হবে।

আমার ত আশ্চর্য মনে হয় রাসুলের (সাঃ) ইন্তেকালের পর সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন হযরত ফাতেমা (আঃ)। বড়জোর ছয় মাসের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁর বাবার সাথে কবরস্থ হতে পারেন নি। উপরন্তু তিনি বলে যান তাঁকে যেন চুপি চুপি রাতের আধারে দাফন করা হয়। সেখানে হাসান (আঃ) তার নানার কাছে শুতে পারেননি– এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। হযরত হাসান (আঃ) এর শাহাদতের পর তাঁর ছোট ভাই ইমাম হোসেন (আঃ) লাশ নিয়ে আসলেন নানার পাশে দাফন করতে– তখন খচ্চর এর পিঠে চড়ে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে আয়শা বলতেছিলেন– "যে, আমার ঘরে একে দাফন করতে দেব না যাকে আমি বন্ধু মানি না"। এই নিষেধাজ্ঞার ফল এই হলো যে, বনি উমাইয়া এবং বনি হাশেমগন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একে অপরের উপর আক্রমণের জন্য উদ্ধত হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম হোসেন (আঃ) আয়শাকে বললেন– "আমার ভাইয়ের লাশকে নানার কবর তাওয়াফ করিয়ে জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে যাব"। ভাই অসীয়ত করেছেন, তাঁর জন্য যেন, এক বিন্দু রক্ত না ঝরে।

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস তার স্ব-রচিত বানী আবৃত্তি করেন– "তুমি উটের উপর উঠেছ (জামালের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গীত) এবং আজকে খচ্চরের পিঠে বসেছ ইমাম হাসান (আঃ) এর জানাজাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য। যদি তুমি জীবিত থাকো, তাহলে হাতীর উপরও বসবে"।

স্ত্রীর অংশ হলো এক অশটমাংশ। কিন্তু একজন স্ত্রী হিসাবে কি ভাবে সম্পূর্ণ হুজরা (ঘর) দখল করতে পারলো। যদিও সেই সময় নবীর নয় জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তবে তাদের হক গেল কোথায়?

নবীর কোন উত্তরাধিকারী হয় না। (আবু বকরের কথা মত, যা তিনি ফাতেমা (আঃ) কে বলেছিলেন।) তবে স্ত্রী হয়ে আয়শা নবীর হুজরার সম্পূর্ণ অধিকারী কিভাবে হলেন মেয়েকে বঞ্চিত করে, কোন আয়াতের বলে মেয়ের অধিকার বঞ্চিত করে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইহাকেই বলে পলেটিক্স।

অনেক ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে মজার ঘটনা লিখেছেন যেহেতু ঘটনাটি ওয়ারিশ সংক্রান্ত তাই এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না। ইবনে আবি হাদীদ মুতাজেলী "নাহজুল বালাগার" শরায় লিখেছেন- হযরত উসমানের খেলাফতের সময় হযরত আয়শা ও হাফসা, উসমানের কাছে আসেন এবং বলেন- "রসুল (সাঃ) এর সম্পদ আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিন। উসমান হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কথা শুনেই সোজা হয়ে বসেন এবং আয়শাকে উদ্দেশ্যকরে বলেন- তুমি এবং তোমার সাথের এই যে মহিলা তোমরা দুজনে মিলে একজন আরবীকে নিয়ে এসেছো যার ন্যুনতম পবিত্রতা সম্পর্কে ধারণা নাই, বর্ণনা প্রদান কচ্ছে যে রসুল (সাঃ) বলেছেন- "আমরা যারা নবী তাদের কোনও ওয়ারীস নেই"। যদি সত্যিই রাসুলের ওয়ারীশ না হয় তাহলে তোমরা রাসুলের পর কি চাইতে এসেছ? আর যদি ওয়ারিশ হয় তাহলে ফাতেমাকে কেন হক থেকে বঞ্চিত করেছ"? আয়শা তখন ভেবাচেকা খেয়ে কতক্ষণ দাড়িয়ে থেকে, রাগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর বলতে থাকলেন নাসালকে (উসমান) হত্যা করে ফেল সে কাফের হয়ে গেছে। *(শহরে ইবনে আবিল হাদীদ ১৬ খন্ড, ২২০-২২৩ পৃঃ)।*

৩।আলী (আঃ) নেতৃত্বের সর্বাধিক হকদার ছিলেন

আমার সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং বাপ দাদার মাজহাব ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হলো, আমি আলী (আঃ) এর খেলাফত ও ইমামতের হকদারিত্বের সঙ্গে আবু বকরের খেলাফতের তুলনা করতে গিয়ে যে সব যৌক্তিক ঐতিহাসিক কারণ পেয়েছি তা উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য।

শিয়াগণ আলী (আঃ) এর মানাকেব ও ফজিলতের উপর অসংখ্য হাদীস খুব মজবুত ও বিশ্বস্তসূত্রের দ্বারা এনেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতেও এগুলো বিস্তর আছে। এ বিষয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে হযরত আলী (আঃ) এর

গুণাবলীসমূহ সাহাবাদের একটা বড় অংশ বর্ণনা করেছেন। হযরত আহাম্মদ বিন হাম্বল বলেছেন যত ফজিলতের বর্ণনা আলীর বেলায় এসেছে অন্য কোন সাহাবীদের বেলায় তা আসে নি। কাজী ইসমাইল নাসাই, আবু আল নিশাপুরী বলেন– যত সুন্দর ও মজবুত সনদের দ্বারা আলী (আঃ) এর ফজিলতগুলো বর্ণিত হয়েছে– অন্য সাহাবীদের ব্যাপারে তেমনি আসেনি।

আপনি খেয়াল করবেন, বনি উম্মাইয়া খলিফাগণ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র হযরত আলী (আঃ) এর উপর অভিসম্পাত, তাকে গালি গালাজ দিত, তাঁর গুনাবলী না বলার জন্য মানুষকে বাধ্য করতো। এমন কি 'আলী' কারও সন্তানের নাম রাখাও নিষেধ ছিল। এতদসত্ত্বেও আলী (আঃ) এর মহৎ গুণাবলী ও সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াতে থাকে তাই ইমাম শাফেয়ী বলেন– "এই লোকটির জন্য আমি আশ্চর্য হই যার গুনগান শত্রুরা তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে অনবরত গোপন করছে। তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে, এমনকি তাঁর ভক্ত অনুসারীরা ভয়ে ভয়ে তাঁর গুণাবলীর কথা বলতে পারছে না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর গুণাবলীর অনেক কিছুই মানুষ জানে"।

এভাবে আমি আবু বকরের ব্যাপারেও উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের সনদগুলো ঘেটেছি কিন্তু যারা আলী (আঃ) এর চেয়ে আবু বকরের গুরুত্ব বেশী দেয় সেই আহলে সুন্নাতের গ্রন্থেও আলী (আঃ) এর মহৎ গুণাবলীর সমান ফজিলতের হাদীস আবু বকরের বেলায় নেই। উপরন্তু আবু বকরের ফজিলতী বর্ণনাগুলো হয়ত ইতিহাসের গ্রন্থে, আর সেগুলো তার মেয়ে আয়শার মুখ থেকে নিসৃত। তাঁর সাথে আলীর সম্পর্ক কেমন ছিল এর বহু প্রমাণ দলীল রয়েছে। আর এও জানা আছে যে, সে বেশকিছু মনগড়া হাদীসকে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে আলী (আঃ) এর উপরে তার পিতা আবু বকরের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অথবা আবু বকরের ফজিলতগুলো আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত। তিনিও হযরত

আলী (আঃ) এর ঘোর দুশমনদের অন্যতম ছিলেন। অবস্থা এমন ছিল সারা দুনিয়া আলী (আঃ) এর বায়াত নিয়ে ফেলেছে কিন্তু তিনি নেন নি বরং তিনি অভিশপ্ত ইয়াজিদের আনুগত্য করেছেন। আর সেই আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন- রাসুলের পর উত্তম মানব আবু বকর, পরে ওমর, পরে উসমান পরে আর কারোর ফজিলত নেই সবাই সমান।

হাদীসটির উপর একটু দৃষ্টি দিন, দেখুন, এর অর্থ হচ্ছে আলীর কোন যোগ্যতা, মর্যাদা, গুনাবলী নেই তিনি বাজারী মানুষের মতই। এই আব্দুল্লাহ কোথায় ছিলেন যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানি ইমামগণ বলেন হাজারও প্রতিকুলতার মাঝে যতগুলো মহৎ গুণাবলীর হাদীস, মজবুত রাওয়ায়েতসহ আলী (আঃ) এর জন্য এসেছে, অন্য কোন সাহাবীদের ব্যাপারে তা আসেনি। আব্দুল্লা বিন ওমরের সামনে আলী (আঃ) এর একটি গুণও কি চোখে পড়েনি, বা শুনেন নি? আসলে শুনেছেন- তা স্মরণেও ছিল, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, রাজনীতি এমনি আশ্চর্য বস্তু।

হযরত আয়শা ও আব্দুল্লাহ বিন ওমর ছাড়া আবু বকরের ফজিলত আর যারা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন আমর বিন আস, আবু হুরাইরা, উরুয়া, আকরামাসহ আরও অনেকে যারা আলীর চরম শত্রু ছিলেন। হয় তারা আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। তাও না হলে অন্তত আলীর (আঃ) শত্রুদের জন্য অনেক হাদীস জাল করতেন। ইমাম আহাম্মদ বিন হাম্বল বলেন- "আলী (আঃ) এর অসংখ্য শত্রু ছিল। শত্রুরা অনেক অনুসন্ধান করেছে আলী (আঃ) এর ত্রুটি বের করার কিন্তু, পারেনি। ছিদ্রান্বেষণকারীদের অনেকে তাঁর এমন শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ করেছে"। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা করেন-

"অবশ্য কাফেরগন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, আমিও পরিকল্পনা করছি, তাই কাফেরদেরকে অবকাশ দাও। আর এই সুযোগ সামান্য সময়ের জন্য।" (সূরা ত্বারিক্ব ঃ১৫-১৭)

অবশ্যই এটা খোদার মোজেজা যে একাধারে ৬০০ বৎসর ধরে হযরত আলী ও আলে আলী (আঃ) এর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতন চালানোর পরেও, আলী (আঃ) এর ফজিলতগুলো আজও বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি ছয়শত বৎসর এজন্যেই বললাম বনি আব্বাসিয়রা হত্যা, নির্যাতন ও জুলুম আহলে বায়তের উপর উমাইয়াদের চেয়ে কোন অংশেই কম করেননি বরং দুহাত বেশী ছিল।

কবি আবু ফারাস আল হামাদানী তাদের সম্পর্কে লিখেছেন, "বনি উমাইয়ারা আলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছিল।, হে বনী আব্বাসরা, বনি উমাইয়াদের জুলুম নির্যাতন অন্তত তোমাদের কৃত জুলুমের চাইতে তা অনেক কম ছিল। তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কতবার খোলাখুলিভাবে বেঈমানী না করেছো? তাদের রক্তের সাগর বহিয়েছো? দেখাবার জন্য তোমরা নিজেদেরকে আলে মুহাম্মদ-এর শিয়া বলে দাবী করতে, কিন্তু মুহাম্মদ-এর সন্তানদের পবিত্র রক্ত এখনও তোমাদের হাতে লেগে রয়েছে"।

এটা আল্লাহ্ পাকের দয়া ও মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয় যে এতসব লোমহর্ষক অত্যাচারের পরও হযরত আলী (আঃ) এর পক্ষেই হাদীসগুলো পাওয়া যাচ্ছে।

আবু বকর প্রথম খলিফা ছিলেন, খলিফা হিসেবে তার অবশ্য ক্ষমতা ছিল, উমাইয়া সুলতানগণ, আবু বকর, ওমর ও উসমানের সপক্ষের লেখক ও বর্ণনাকারীদের মুখ স্বর্ণ দিয়ে ভরে রাখতো, তাদের জন্য বেতন নির্ধারিত ছিল, ফলে তারা অসংখ্য জাল হাদীস দিয়ে আবু বকরের সুনাম অব্যাহত রাখতে গিয়ে ইতিহাসকে কাল

কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলে। এত কিছুর পরও হযরত আলীর (আঃ) গুণাবলীর নির্ভুল যে সব হাদীস বর্ণিত আছে তার দশ ভাগের এক ভাগও আবু বকরের বেলায় নাই। তাছাড়া বানানো হাদীসগুলোকেই যদি ইতিহাসের নিরিখে পর্যালোচনা করা হয় তা হলে যুক্তি ও দলিলে কোন অবস্থায়ই হাদীসগুলো টিকে না।

যেমন–

যদি সকল উম্মতের ঈমানকে এক পাল্লায় দেওয়া হয় আর আবু বকরের ঈমান অন্য পাল্লায় তাহলে আবু বকরের ঈমানই ভারি হবে। এই হাদীসের উপর পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। আরও একটু ভালভাবে যদি আলোচনা করি তাহলে দেখবো–যদি আবু বকরের নিজেরই এই ঈমানের উচ্চতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকত তাহলে তিনি কোন অবস্থাতেই ফাতেমা (আঃ) এর উপর জুলুম হতে দিতেন না এবং সকিফাতে খেলাফতের বায়াতটিও ওমর বা ওবায়দার ঘাড়ে ফেলে দিতেন। যদি আবু বকরের ঈমান সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) এর ধারণা এতই উচু থাকতো তাহলে উসামার নেতৃত্বে তাকে যুদ্ধে পাঠাতেন না।

যদি রসুল (সাঃ) আবু বকরের ঈমানকে এমনি মনে করতেন, তাহলে উহুদের শহীদদের ব্যাপারে স্বাক্ষী দিলেন, তার ব্যাপারেও দিতেন, অস্বীকার করতেন না যে আমি মরে গেলে তোমরা কি কি করবে আমি জানি না। অতঃপর আবু বকর খুব কেঁদেছিলেন।

যদি আবু বকরের প্রতি হুজুরের এধরনের ধারণাই ছিল তাহলে সুরা বারাতের ঘোষণা, *"আবু বকরের হাত হতে নিয়ে আলী (আঃ) কে দেওয়ার জন্য পাঠাতেন না"*।

রসুল (সাঃ) এর এটাই যদি বক্তব্য হবে তাহলে খায়বারের যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) বলতেন না– কাল এমন ব্যক্তির হাতে যুদ্ধের পতাকা (সেনাপতি সাব্যস্ত) দিব যে খোদা ও রসুল (সাঃ)কে ভালবাসে; সর্বদা সম্মুখে এগিয়ে যাবে কখনও পিছু হটবে না। সে দৃঢ়চেতা, ভেঙ্গে যাওয়ার পাত্র নয়, তার মনের পরীক্ষা খোদা নিয়েছেন। অতঃপর তিনি

পর দিন আলী (আঃ) এর হাতে পতাকা দেন, আবু বকরের হাতে নয়। খোদার কাছে গোটা উম্মতের চেয়ে আবু বকরের ঈমান যদি বেশীই হতো তাহলে যে সময় তারা নবী (সাঃ) এর আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজ উচু করেছিল তখন তাদের পুরা নেক আমল নষ্ট করে দেয়ার ধমক দেওয়া হতো না। (সহি মুসলিম)-

যদি আলী (আঃ) ও তার অনুসারীরা জানতেন যে আবু বকরের ঈমান এতই বেশী, তাহলে কোন অবস্থাতেই তার বায়াত নিতে অস্বীকার করতো না। যদি ফাতেমা (আঃ) জানতেন আবু বকর এতবড় ঈমানদার, তাহলে যে কোন অবস্থাতেই তার প্রতি রাগান্বিত হতেন না, কথা বলা বন্ধ করতেন না, তার জন্য নামাজে বদ দোয়া করতেন না, তার জানাযায় তাদের শরীক না হওয়ার জন্য ওসিয়ৎ করতেন না।

এখন আমরা সেই হাদীসটির উপর আলোচনা করবো যেখানে বলা হয়েছে "যদি আমি কাওকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকে বন্ধু বানাতাম।" এ হাদীসটিও প্রথমটির মত মিথ্যা। হিজরতের পূর্বে মক্কায় যখন হুজুর (সাঃ) একে অপরের ভাই সাব্যস্ত করলেন আর হিজরতের পর মদিনায় আনসার ও মুহাজেরদের মাঝে যে মুয়াখাত (ভ্রাতিত্বের বন্ধন স্থাপন) করলেন সে দুটোতেই আবু বকর কোথায় ছিলেন? রাসুল (সাঃ) তাকে কেন ভাই বানালেন না? উভয় স্থানেই রসুল (সাঃ) আলী (আঃ) কে সাথে নিয়ে যান; এবং তাঁকেই কেন ভাই ঘোষণা দিলেন? "আলী, তুমি আমার দুনিয়া ও আখেরাতে ভাই" আবু বকরকে কেন বঞ্চিত করলেন। না উনাকে আখেরাতের ভাই, না আখেরাতের খলিল, এসব কিছুইতো বানালেন না। বাস, আর বেশী আলোচনা করতে চাই না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যে দুটি হাদীস বেশী বলে তার উপর আলোচনা সীমিত রাখলাম। শিয়াদের কাছে আরও শক্ত শক্ত প্রমান ও উত্তর আছে।- তাছাড়া হাদীস দুটি আবু বকরের মৃত্যুর পর বানান হয়েছে।

এতো গেল ফজিলত সংক্রান্ত কথা এখন যদি আপনি শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের কিতাবগুলোতে আলী (আঃ) এর দোষত্রুটি অনুসন্ধান করেন, একটিও সামান্যতম ত্রুটি পাবেন না, কিন্তু অন্যদের অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি আহলে সুন্নাতের সেহাহ্ সিত্তা ও ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

এভাবে অনুসন্ধান করলে, দেখা যায় সঠিক ইজমা বা উম্মতের মতৈক্য একমাত্র আলী (আঃ) এর খেলাফতের বায়াতের সময় হয়েছিল। কেননা আলী নিজে বায়াত নেয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করছিলেন কিন্তু মুহাজের ও আনসারগণ জোট হয়ে তার হাতে বায়াত নেয়। মাত্র হাতে গুনা কজন তার কাছে বায়াত নেয়নি- তাদের তিনি বাধ্য করেননি। অথচ, ওমরের কথানুযায়ী আবু বকরের বায়াত ছিল "তড়িঘড়ি ও জোর-জবরদস্তিমূলক"। "আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ ভুলের ক্ষতি হতে রক্ষা করুন"।।

আর ওমরকে তো আবু বকরের দেওয়া পূর্বকার প্রতিশ্রুতি মত একাই পছন্দ করে খলিফা বানিয়ে যান। উসমানের খেলাফতের ঘটনা- ইতিহাস এটাকে পাতানো হাস্যকর নাটক বলেছে। কেননা ওমর নিজে ছয়জনের একটা কমিটি গঠন করে দেন এবং এই ছয়জনের ভেতরে একজনকে খলিফা হতে হবে, ওমরের কথা মত এই ছয় জনের ভেতরে চারজন একদিকে আর দুই জন অন্য দিকে যদি রায় দেয় তাহলে সেই দুইজনকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর তিনজন এক দিকে আর তিন জন অন্য দিকে যদি হয় তাহলে যে তিনজনের দিকে আব্দুল রহমান ইবনে আউফ থাকবে সেটি মেনে নিতে হবে, আর যদি এই ছয়জন (এই সময়ের ভিতরে) কোন সমাধানে না আসতে পারে তাহলে সেই ছয়জনকেই হত্যা করে ফেলতে হবে।'

ইহা একটা অনেক লম্বা ও অদ্ভুত ঘটনা। সংক্ষিপ্ত হলো আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হযরত আলী (আঃ)কে মনোনীত করেন এবং বলেন- "আপনি খোদার নির্দেশ (কোরআন), রাসুল (সঃ) এর সুন্নাত ও আবু বকর ও ওমরের সুন্নাত পালন করবেন"। কিন্তু হযরত আলী (আঃ) আবু বকর ও ওমরের সুন্নাত অনুসরণের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু ওসমান সেটা কবুল করে নেওয়ায়, তিনি খলিফা হয়ে যান। হযরত আলী (আঃ) সেই কমিটি থেকে বের হয়ে আসেন। এমনটি যে হবে সেটা তিনি আগে থেকেই জানতেন। সেটার বর্ণনা তাহার বিখ্যাত ভাষণ "আল সাক সাকীয়া" তে করেছেন। হযরত আলী (আঃ) এর পর মাবীয়া খেলাফতে বসে এবং সেই খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। সেই রাজতন্ত্রের ধারায় উমাইয়ারা একের পর এক ক্ষমতায় আসতে থাকে। বনী উমাইয়ার পর সেটা বনী আব্বাসীদের কাছে চলে যায়। তারপর বনী আব্বাসীরা একে অন্যকে খলিফা বানিয়ে যায়। কখনও আবার জোর করে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া হয়। ইসলামের ইতিহাসে শান্তিপূর্নভাবে বায়েতের প্রথাই শেষ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কামাল আতাতুর্কের হাতে সেই খেলাফতের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়। এই সময়ের মধ্যে সত্যিকারের বায়েত শুধু হযরত আলীর (আঃ) এর সময় হয়েছিল।

যে সব হাদীসে আলী (আঃ) এর অনুসরণ ওয়াজিব করা হয়েছে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সেই সব হাদীস আমাকে বাধ্য করেছে হযরত আলী (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বকে মানতে। শিয়াদের কাছে যে সব হাদীস রয়েছে হযরত আলী (আঃ) এর শানে তা ব্যাপক। আমি আমার অভ্যাস মতো সেই সব হাদীসকেই নিয়েছি যা উভয় পক্ষই গ্রহণ করেছে। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরলাম।

(১) হাদীস–ই–মদীনাঃ

"আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা।"

রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর খেলাফত পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠির জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। কারণ জাহেলের বিপরীতে আলেমের অনুসরণই বিধিসম্মতঃ আল্লাহ্ এরশাদ করেন, *"হে মোহাম্মদ (সাঃ) বলে দিন, জ্ঞানি ও মুর্খ কি সমকক্ষ ও সমমর্যাদার হতে পারে,* (সূরা রজম–৯) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–*"তবে যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিক হকদার, না যাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না সে? তাই তোমাদের কি হলো; তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত কর?"* –(সূরা ইউনুস–৩৫)। তাহলে মুল কথা হলো আলীম হেদায়েত করে থাকেন এবং জাহিল হেদায়েত গ্রহণ করে থাকে। জাহিল অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে ইতিহাসের সর্ব সম্মত ধারনা হলো, হযরত আলী (আঃ) সাহাবাগণের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ মাসলাগুলো সাহাবীগণ আলী (আঃ) এর কাছেই জানতে আসতেন। কিন্তু আলী (আঃ) কারও কাছে জানতে জাননি। তাই আবু বকর বলেন, হে আল্লাহ্ তুমি এমন কোন সমস্যার জন্য আমাকে জীবিত রেখ না যেটা সমাধানের জন্য আলী থাকবে না। আর ওমরও সব সময় বলতেন– যদি আলী না হতো ওমর ধ্বংস হয়ে যেতো। ইবনে আব্বাস বলতেন, আমার এবং সকল সাহাবার জ্ঞান হযরত আলীর জ্ঞানের তুলনায় এমন ছিল যেমন সাত সমুদ্রের নিকট এক বিন্দুর মতো।

স্বয়ং আলী (আঃ) বলেন- "আমার মরার আগেই, আমার কাছ থেকে জেনে নাও। খোদার কসম, কিয়ামতের আগে সংঘটিতব্য কোন বিষয়ের প্রশ্নও যদি করো তাও আমি বলে দিয়ে যাব। আমার কাছে কোরানের ব্যাপারে জানতে চাও, আল্লাহর কসম, কোরআনে এমন কোন আয়াত নেই যা আমি জানি না। এটা রাতে না দিনে অবতীর্ণ হয়েছে, পাহাড়ে না সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে"।

এদিকে আবু বকরের জ্ঞান ছিল এমন যে যখন তাকে 'আব্বান' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হয় ঐ আয়াতের যে-

"আর ফল এবং চারা এসব কিছু তোমাদের এবং তোমাদের পশুদের উপকারের জন্যে বানানো হয়েছে" ।আলকোরআন, ৮০ ঃ ৩১-৩২। তখন এর উত্তরে সিদ্দীকে আকবর বলেন- "কোন্ আকাশ ছায়া দেবে, কোন্ মাটি আমাকে বহন করবে যদি আমি বলি খোদার কিতাবে এমন আয়াত আছে যার অর্থ আমি জানি না"।

আর ওমর বলতেন- "সবাই ওমরের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। এমন কি যারা পর্দানসীন (মহিলা) উনারাও"। একদা হযরত ওমরের কাছে একটি আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাকে গালি দেন। অতঃপর চাবুক দিয়ে তাকে এমন মারা মারতে থাকেন যতক্ষণ তার শরীর হতে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। আর ওমর বলতে থাকেন- "এমন প্রশ্ন আর কোন দিন করবে না, যা প্রকাশ পেলে তোমাদের খারাপ লাগবে"। *(সুনানে দারামী ১ম খন্ড- ৫৪ পৃঃ তাফসিরে ইবনে কাছির- ৪র্থ খন্ড- ২৩২ পৃঃ দূর্রে মনসূর-২য় খন্ড-১১১পৃঃ)*

সেই লোক কালালার মাসলাও জিজ্ঞেস করে ছিলেন- তাবারীর মতে হযরত ওমর বলেন- "যদি আমার 'কালালাহ' এর অর্থ জানা থাকতো তা হলে তা আমার নিকট শামের (সিরিয়া) রাজপ্রাসাদের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে হতো"। ইবনে মাজা তার এক কিতাবে লেখেছেন- ওমর বলেন- "তিনটি বিষয় এমন, যদি তা রাসুল (সাঃ) বলে যেতেন, তা হলে তা দুনিয়া ও তার ভিতরে সবকিছু থেকে হতো উত্তম- (১) কালালাহ (২) রেবা (৩) খেলাফত"। সোবহানাল্লাহ! এগুলো হুজুর (সাঃ) বলে জাননি তা অসম্ভব।

(২) আলী (আঃ) এর মর্যাদার হাদীস ঃ

"হে আলী, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক যেমন মুসার সাথে হারুনের সম্পর্ক, পার্থক্য শুধু আমার পরে কোন নবী আসবে না"।

এই হাদীস দ্বারা আলী (আঃ) এর হেদায়েত, খেলাফত লাভের অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়। বিবেকবান সবাই জানেন মুসা (আঃ) যখন আল্লাহর দর্শনে গিয়েছিলেন তখন হারুনকে তার অনুপস্থিতিতে, ভারপ্রাপ্ত, অলী, খলিফা, করে গিয়েছিলেন- তাই আলী (আঃ) রাসুল (সাঃ) এর অনুপস্থিতিতে এগুলো হওয়ার বৈধতা অর্জন করলেন। এই হাদীস দ্বারা যে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় তা হলো-

১। হারুনের মত হযরত আলী (আঃ) ও রাসুল (সাঃ) এর সমস্ত বৈশিষ্ঠ্যের ধারক বাহক (একমাত্র নবুওয়াত প্রাপ্তি ছাড়া)

২। রাসুল (সাঃ) ছাড়া সকল সাহাবাগণ থেকে হযরত আলী (আঃ) সর্বোত্তম ও প্রধানতম।

হাদীস-ই-গাদীর

আলী (আঃ) এর মোকাবিলায় যাদের বিশ্বাস, আবু বকর, ওমর, উসমান বেশী মর্যাদাবান- যাঁকে রসুল (সাঃ) তাঁর পর মুমেনদের ওলী বানিয়েছেন তাদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে এই হাদীসটিই যথেষ্ট।

উত্তপ্ত গরমের মাঝে দাড়িয়ে, আল্লাহর রসুল (সাঃ) সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন- আমি কি সকল মুমেনদের সত্তার উপর সকল মোমিনদের চেয়ে বেশী অধিকার রাখি না। সবাই বলেছিলেন- অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল - তখন তিনি বলেছিলেন- "আমি যাদের মাওলা, আলী তাদের মাওলা। হে খোদা, যে আলীকে বন্ধু রাখে তুমিও তাকে বন্ধু রাখো, যে আলীর দুশমন তুমিও তার শত্রু হও। যে আলীকে সাহায্য করে, তুমি তাকে সাহায্য কর, যে আলীকে সাহায্য করে না, তুমিও তাকে সাহায্য করো না। যে দিকে আলী ঘোরে, সত্যকে সেদিকেই ঘুরিয়ে দাও"।

এটা একটা প্রকাশ্য দলিল যে রসুল (সাঃ) আলী (আঃ)কে মুমেনদের জন্য খলিফা বানিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তি হাদীসের এটাই ব্যাখ্যা করবে, যারা অন্যায়ের প্রতি অন্ধ হয়ে আনুগত্যশীল তাদের ব্যাখা আলাদা। প্রচন্ড গরমে ভিজে গিয়ে একাকার, এরই ভিতরে রসুল (সাঃ) আলী (আঃ) এর ইমামতের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার পর সর্ব প্রথম উম্মোল মোমেনীনগণ আলী (আঃ) কে মোবারকবাদ দেয়; পরে আবু বকর ও ওমর এসে বলেন- "হে আবু তালেবের সন্তান তোমার উপর সাধুবাদ, তুমি আজ থেকে সকল মুমেন মুমেনার ওলী হয়ে গেলে"। যদি এ দ্বারা ইমামত ও খেলাফতের উদ্দেশ্য না হবে তাহলে রসুল (সাঃ) এতকিছু করতেন না। আর সকলেই মোবারকবাদ জানানোর এবং আপেক্ষিক বায়াতের এ প্রশ্ন আসতো না।

বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত ঐতিহাসিক দলীল প্রমাণাদিকারীরাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দেয় যে, এ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাকারীরা মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহ্ বলেন, *" অবশ্যই তাদের মধ্যে এক দল সত্যকে জেনেও গোপন করে" ।* আলকোরআন ২ ঃ ১৪৬।

৪। হাদীস—ই—তাবলিগ

"আলী আমা থেকে আর আমি আলী থেকে। আমার কর্তব্য আমি বা আলী ছাড়া কেউ করতে পারে না"।

রসুল (সাঃ) হজ্জে আকবরের সমাবেশে সুরা-ই বারাতে দিয়ে আবু বকরকে পাঠান। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) অহী নিয়ে আসার পর হুজুর (সাঃ) আলী (আঃ)কে পাঠিয়ে এই তাবলিগের কাজ আবুবকরের বদলে তাঁর উপর ন্যস্ত করেন।

তখন আবু বকর কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছিলেন- তিনি রসুল (সঃ)কে বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার ব্যাপারে কি কিছু অবতীর্ণ হয়েছে"? তখন রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন- আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন- "আমি নিজেই এই দাওয়াত পৌছাব বা আলী আমার পক্ষ থেকে পৌছাবে"। অন্য জায়গায় রসুল (সাঃ) বলেন- "হে

আলী আমার পর উম্মত যে বিষয়ে মতবিরোধ করবে তার ব্যাখ্যা তুমি দিবে"। *(তারিখে দামেস্ক-২ খন্ড -৪৮৮পৃঃ কানজুল হাকায়েক-২০৩ পৃঃ কানজুল আম্মাল- ৫ খন্ড- ৩৩ পৃঃ)* এতে কি প্রমাণ হয় না, যে তাঁর পর আলী ইমামত ও খেলাফতের বৈধ উত্তরাধিকারী? যদি রাসুল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে শুধু হযরত আলী (আঃ) উম্মতে মুসলিমের মতবিরোধের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। তাহলে যাদের (আম্বান বা কালালার) অর্থ জানা ছিল না তাদেরকে হযরত আলী (আঃ) এর উপর কি করে প্রাধান্য দিতে পারি? খোদার কসম! এটা সেই মুসীবত, যাতে উম্মতে মুসলিমা বন্দী হয়ে আছে এবং এই জন্যেই মুসলমানরা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারছে না যে দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল? এতে আল্লাহ্ বা রাসুল (সাঃ) বা আলী (আঃ) এর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। বরঞ্চ তাদেরই দোষত্রুটি ছিল যারা অবাধ্য হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বদলিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন- *"এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর রাসুলের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন সেদিকে এসো। তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যেভাবে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এরা কি যে অবস্থায় পুর্বে ছিল সে অবস্থায় থাকবে? যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না এবং সঠিক পথে চলত না"* (সুরা মায়দা-১০৪।

৫। আলী (আঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে আরও একটি হাদীস

রাসুলে খোদা (সাঃ) হযরত আলীর (আঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন " এই আলী আমার ভাই, আমার ওয়াসি এবং আমার পর আমার প্রতিনিধি হবে। সুতরাং, তাঁর আদেশ শোন এবং তার আদেশ মতো কাজ কর।" এই হাদীসও সেই সকল হাদীসের মতো সত্য যাহা ঐতিহাসিকগণ নবী (সাঃ) এর নবুয়াতের প্রথম দিকে বলেছেন যাতে নবীর অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু তাদের সেই রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে তারা ঘটনাকে বিকৃতি করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়, সেতো অত্যাচার উৎপীড়নের যুগ ছিল। কিন্তু আজও সেই চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত চলে আসছে। তার একটি নমুনা। ডঃ মোহাম্মদ হোসেন হাইকেল তার

গ্রন্থ " লাইফ অফ মুহাম্মদ" এ এই হাদীসকে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। দেখুন প্রথম সংস্করণ ১৩৫৪ হিজরী প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১০৪। কিন্তু দ্বিতীয় সংকলন ছাপার সময় (ওয়াসী আমার পর খলিফা হবে) সরিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক এই ভাবে তাফসীরে তাবারী ১৯তম খন্ডে ১২১ পৃষ্ঠতে (ওয়াসী ও আমার পর খলিফা হবে) কেটে আমার ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি লিখেছে। কিন্তু পরিবর্তনকারীরা বুঝতে পারে নাই যে, তাবারী তার ২য় খন্ডে ৩১৯ পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছে। দেখেছেন কেমন করে তারা হাদীস পরিবর্তন করে দেন। "ষড়যন্ত্রকারীরা খোদার নূরকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়"।

এই তর্কের মধ্যে আমি সত্যিকার ঘটনা জানার জন্যে "লাইফ অফ মুহাম্মদ" প্রথম সংকলন খুঁজতে লাগলাম। অনেক কষ্ট , পরিশ্রম, টাকা–পয়সা খরচ করে আল্লাহর মেহেরবানীতে সেটা আমি পেয়েই গেলাম। আসল কথা হল এই পবির্তন ধরার পর থেকে আমার বিশ্বাসের মধ্যেই নতুন করে বল পেয়েছি। সেই দুষ্টু লোকদের এই প্রচেষ্টা থাকে যে, তাদের শত্রুদের কাছে আসল কোন দলিল যেন না থাকতে পারে। কিন্তু যখন কোন ন্যায়বান ব্যক্তি, সত্যের সন্ধানে এই সব পরিবর্তন দেখবে তখন সে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। তার মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় যে, এই লোকগুলো মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য এই কাজ করছে। ষড়যন্ত্রকারীরা কিছু লেখককে কিনে নেয়। তারা এই জন্যে অনেক টাকা খরচ করে। লেখকদের কাজ থাকে সেই সাহাবীদের (যারা নবীর পর তাদের সাবেকী কুফরী রাস্তায় ফিরে গিয়েছিল) মান মর্যাদা রক্ষা করা। এতে যদি শিয়াদের গালমন্দ দিতে হয় কিংবা কাফের ফতুয়া দিয়ে হলেও তা করতে হবে।

"এই ধরনের কথা তারাও বলেছে যারা তাদের আগে ছিল। তাদের সবার মন একই রকম।যারা দৃঢ়প্রত্যয়শীল তাদের জন্য অবশ্যই আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে"।(সূরা বাকারা–১১৮)।

সে সকল বিশুদ্ধ হাদীস যেগুলো আহলে বায়তের অনুসরণকে ওয়াজেব বলেছে ঃ

১। দুটো ভারী জিনিষ সম্পর্কিত হাদীস

রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন- "হে মানব সকল, আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা মেনে চলতে থাক তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট (গুমরাহ) হবে না; প্রথমত আল্লাহ্র কিতাব দ্বিতীয় হলো আমার ইতরাত অর্থাৎ (আহলে বায়েত)"।

আবার অন্য জায়গায় বলেছেন "অচিরেই আমার নিকট রবের দূত আসবে, আর আমি তাঁর (ডাকে) সাড়া দিব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি অতি মূল্যবান জিনিষ রেখে যাচ্ছি, প্রথমত কোরআন, যাতে হেদায়েত ও নূর আছে। এবং দ্বিতীয় আমার আহলে বায়েত"। *(সহী মুসলিম, সহী তিরমিজি মুসতাদারাক হাকীম, মাসনাদ ইমাম হাম্বল।)*

এই হাদীস নিয়ে প্রথমে আমি খুব চিন্তা ভাবনা করি, যাহা আহলেসুন্নাত ওয়ালজামাতের সিহাসেত্তাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আমি দেখতে পাই দু'টা ভারী জিনিসের হাদীসের (কোরআন ও ইতরাত) উপর শুধু শিয়ারা আমল করে, আর আহলে সুন্নাতরা ওমরের অনুকরণে কিতাবুল্লাহের উপর আমল করে। আফসোস! যদি কিতাবুল্লাহের উপরই তারা আমল করত, নিজেদের ইচ্ছা মতো মনগড়া ব্যাখ্যা না করত, তাহলেও কথা ছিল। যেখানে সুন্নাতীদের নিশানবরদার ওমর নিজেই 'কালালা' ও 'তাইয়াম্মুমের' আয়াত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, এমন কি অনেক মসলা মসায়েলের ব্যাপারেও তার অজ্ঞতা ছিল, তাহলে যারা তার পরে জন্মগ্রহণ করেছেন; বাদ বিচার ছাড়া মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ওমরের অনুসরণ করেছেন। তারা কিভাবে কিতাবুল্লার মতে পরিচালিত হবে? আসল কথা হল, আহেলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাহাদের বর্ণনায় বলছেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, কোরআন ও আমার সুন্নাত"। এই সুন্নতী হাদীস বর্ণনা করে প্রথমতঃ হাদীস হতে 'ইতরাত' বাদ দিতে চায়। কিন্তু সুন্নতী হাদীস যদি সত্য হয়ে থাকে (যদি মেনেও নেওয়া হয় ইহা সত্য) তবে আগের হাদীসে যে 'ইতরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে এই হবে যে, ইতরাতের দিকে উপস্থাপন কর, সে আমার সুন্নাত বর্ণনা

করে দেবে অথবা যখন তোমরা তাঁদের দিকে উপস্থাপন কর তবে তাঁহারা (ইতরাত) সহী হাদীস বর্ণনা করে দিবেন। কেননা তাঁরা সব ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্ আয়াতে তাতহীর দ্বারা তাঁদেরকে পাক ও পবিত্র ঘোষণা দিয়েছেন। তাই তাঁদের দিকে মুখাপেক্ষী হলেই তাঁরা বিশুদ্ধ হাদীস বলে দেবে অথবা এও হতে পারে আহলে বায়েত, অর্থ এবং অন্তর্নিহিত ভাবধারা বর্ণনা করে দেবেন। কেননা শুধু কোরআন হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়, অনেক পথভ্রষ্ট (গুমরাহ) দল আছে তারাও কোরআন থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে। এই কথাটা সে সময় রাসুল (সাঃ) ও বলেছিলেন। অনেক কোরআনের তেলাওয়াত-কারী এমনও আছে তাদের উপর কোরআন লানত করছে। কোরআন তো আর কথা বলতে পারে না এর উপর যত ইচ্ছা ব্যাখ্যা করে নাও। কোরআনে দুই ধরনের আয়াত আছে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। অস্পষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। এই জন্যই কোরআনে যত ধরনের ব্যাখ্যা, নবীর কথা অনুযায়ী, তা আহলে বায়তের দিকে রুজু করতে হবে। "রাসেখুনা ফিল ইলম্" দ্বারা "আহলে বায়েতকে" বুঝানো হয়েছে। এই জন্যই শিয়াগণ সকল বিষয়, নিষ্পাপ (মাসুম) ইমামগনের দিকে রুজু (উত্থাপন) করে থাকেন। ইজতেহাদ শুধু সেখানেই করেন যেখানে মাসুম ইমাম (আঃ)দের বাণী না থাকে। আর আমরা (সুন্নীরা) কোরআনের তফসীর হোক কিংবা সুন্নাতে রাসুলের বিষয় হোক, সাহাবীদের দিকে উপস্থাপন করে থাকি অথচ সকল সাহাবী নির্বিশেষে তাদের অবস্থা, কীর্তি কর্ম, তাদের ধারণা, অভিমত তর্কের উর্ধ্বে নয়, তাই তাদের থেকে ইজতেহাদ বৈধ নয়। যখনই আমি আমাদের ওলেমাদের প্রশ্ন করি আপনারা কার সুন্নাতের অনুসরণ করেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সুন্নতের। অথচ এটা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত। কেননা আহলে সুন্নাতগন স্বয়ং রাসুল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-"তোমাদের উপর ওয়াজিব আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং আমার পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের উপর আমল করা এবং শক্তভাবে আমল করবা"। সুতরাং যে সুন্নাতের উপর উঁহারা আমল করছেন সেটা রাসুল (সাঃ) এর নয়, বরঞ্চ বেশীর ভাগ সুন্নাতে খলিফার, এমন কি রাসুল (সাঃ) এর

সুন্নাত ও খলিফার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। (সুতরাং সেটাও সুন্নাতে খলিফাই ছিল) এবং যদি রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাত বলে মেনেও নেই তাহলেও রাসুল (সাঃ) এর কোনো সুন্নাত লিখিত ছিল না (তাহলে অনুসরন কিসের) কেননা আহলে সুন্নাতের সেহাসেত্তাতে বর্ণিত হয়েছে রাসুলে খোদা (সাঃ) সাহাবাদেরকে তাহার সুন্নাত লেখতে বারণ করে ছিলেন। কেননা ইহা কোরআনের সঙ্গে মিশে একাকার না হয়ে যায়। আবু বকর ও ওমর তাদের খেলাফতকালে সেটা শক্তভাবে পালন করেছেন। যেখানে সুন্নাত নকল হতে পারে নাই, তার আবার অনুসরণ হয় কিভাবে? সেহাসেত্তাতে "কিতাবুল্লাহ ও ইতরাত" কথা আছে, "সুন্নতী" নাই। সুতরাং আমি আমার "সুন্নাত" রেখে এসেছি একথার সপক্ষে তাদের কোন প্রমাণ নাই।

ঈমাম মালেক তার গ্রন্থ মুয়াত্তাতে প্রথম "সুন্নাতী" কথাটি উদাহরণ স্বরূপ দিয়েছেন। হাদীস বলে দেন নাই। তাবারি, ইবনে হেশামসহ অনেকে ঈমাম মালেকের মুয়াত্তা থেকে "সুন্নাতী" কথাটি নিয়েছেন। "সুন্নাতী"র কথা কোন হাদীসে নাই। সেটাকে সত্য বলে মনে করি কিভাবে? আমি এই বিতর্কিত আলোচনায় অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে যে উদাহরণ পেশ করেছি তা সেই "সুন্নাতী" হাদীস বাতিল করার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, সুন্নাতে খলিফার (আবু বকর, ওমর, উসমান) এর মধ্যে নবী (সাঃ) এর সুন্নাতের বিপক্ষে অনেক উপদল ছিল এতক্ষণে আপনারা তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

নবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরেই যে হাদীস বা সিরাতে খলিফা পেশ করা হয়, যাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও ঐতিহাসিকগণসহ সকলে লিখেছেন তা হচ্ছে মা ফাতেমার সঙ্গে আবু বকরের অভিযোগে বর্ণিত হাদীস নিয়ে যুক্তি তর্ক। আবু বকর মা ফাতেমা (আঃ)কে এ হাদীস বলেছিলেন যে, "নবীদের সম্পদের কোন ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয় না, সব সদকা হয়ে যায়।" জনাবে ফাতেমা (আঃ) এই হাদীসের তীব্র প্রতিবাদ এবং বাতিল করে বলেছিলেন, "আমার বাবা কোরআন বিরোধী কথা বলতে পারেন না। ইহা মিথ্যা"। যখন কোরআন বলে– *"খোদা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছে যে, ছেলের অংশ মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুন।"*– (সুরা নেসা–২।)

ইহা মিথ্যা"। যখন কোরআন বলে- *"খোদা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছে যে, ছেলের অংশ মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণ।"* (সুরা নেসা-২।)

এই আয়াত নবী ও সাধারণ, সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এভাবে তিনি সেই আয়াতও তুলে ধরেন- যা নবী দাউদ (আঃ) ও সোলেমান (আঃ)-এর ব্যাপারে আছে, *"আর তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে একজন সন্তান দাও, যে আমার ও ইয়াকুবের বংশের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকার) হবে। হে খোদা তুমি তাকে একজন বানাও যাকে তুমি ভালভাবে পছন্দ কর।"* আল কোরআন-১৯ ঃ ৫৬।

[নবী (সাঃ)-এর একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি (ফেদাক বাগান) ছিল। নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর সেটাকে বাজেয়াপ্ত করে ফেলেন। হযরত ফাতেমা (আঃ) আবু বকরের কাছে গিয়ে সেটা ফেরত চান তখন আবু বকর এই বলে ইহা দিতে অস্বীকার করেন যে নবীরা মারা গেলে তাদের কোন উত্তরাধিকার (ওয়ারিস) হয় না। (সেটা নবী না কি তাকে বলে গেছেন)? নবী যখন কোন কথা বলতেন তাহা অনেকে শুনত ও পরে তারা তা বর্ণনা করত। কিন্তু এই হাদীসটি শুধু আবু বকর বর্ণনা করেছেন তাহলে এই হাদীসটি কি শুধু সিদ্দিকে আকবর শুনে ছিলেন? যাহা সম্পূর্ণ কোরআন বিরোধী ছিল।- অনুবাদক।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাও আবু বকরের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। এই ঘটনা আবুবকরের খেলাফতের প্রথম দিকে ঘটেছিল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লেখকরাই ইহা লিখেছেন। ঘটনা এই ছিল যে, কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তখন আবু বকরের হুকুম ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া। কিন্তু ওমর তার বিপক্ষে ছিলেন।তিনি বলেছেন এদেরকে হত্যা করিও না। আমি নবীকে নিজে বলতে শুনেছি যে লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ বলবে তার জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ থাকিবে তার হিসাব আল্লাহর নিকট আছে।

মুসলিম শরীফে লেখা আছে রাসুল্লাহ (সাঃ) যখন খায়বারে ইসলামের পতাকা হযরত আলী (আঃ) হাতে দিলেন। তখন হযরত আলী জিজ্ঞাসা করলন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ কোন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। রাসুল (সাঃ) বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লাইলাহা ইল্লালাহো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ না বলে, আর যখন সেটা স্বীকার করে নেবে তখন তোমাদের জন্য তাদের রক্ত ঝরান এবং সম্পত্তি হস্তগত করা, একমাত্র ইনসাফের কারণ ব্যতিরেকে, অনুচিত হবে এবং এজন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু আবু বকর সে হাদীসের উপর সন্তুষ্টি হতে পারলো না এবং বলতে লাগলো, "খোদার কসম, যে নামাজ ও যাকাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কারণ ইহা তাদের উপর সঠিকভাবে আরোপিত খোদার হক"। নয়তো এভাবে তিনি বলেছেন। "খোদার কসম, জনগণ রাসুলুল্লাহকে যাহা দিতেন, যদি তার চেয়ে একটি উটের গরার রশিও কম দেয়, তার জন্যও আমি যুদ্ধ করবো।" আবু বকর এই কথায় অটল থাকায় ওমর সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "আবু বকরের এই কথা আমার অন্তরকে প্রশস্ত করেছে"। আমি জানিনা যে লোক আল্লাহ রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধীতা করছে, আল্লাহ তার অন্তরকে কিভাবে প্রশস্ত করে। কেননা খোদা কুরআনের এই আয়াতের দ্বারা মুসলমানদের হত্যাকে হারাম করে দিয়েছেন।

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা খোদার পথে জেহাদ করার জন্য যাত্রা করবে তখন ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিও এবং যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য তোমাকে শান্তির প্রস্তাব করে তবে তুমি না বুঝে সুজে বলে দিও না যে তোমরা ঈমানদার নাও। (ইহা থেকে প্রকাশ পায়) যে তোমরা (শুধু) দুনিয়ার সয় সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হয়েছো এবং এই অজুহাতে হত্যা করে লুটে নাও এবং ইহা বুঝ না? এবং যদি ইহা হয় তবে খোদার নিকট অনেক ধন সম্পত্তি আছে। (হে মুসলমান) আগে তুমি নিজেও তো এমন ছিলে। আবার খোদা তোমার উপর করুনা করেছেন। হঠাৎ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছো। সুতরাং খুব ভালভাবে জেনে নাও। নিশ্চয়ই খোদা তোমাদের প্রতিটি কর্মের খবর রাখেন" সূরা নেসা-৯৪।

যে লোকেরা আবুবকরকে যাকাত দিতে চাচ্ছিল না, আসলে তারা যাকাত অস্বীকারকারী ছিল না। তারা বিলম্ব করছিল এই জন্য যে আসল ঘটনা জানার জন্য। কারণ তাদের মধ্যে অনেকে বিদায়ী হজ্বে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। তারা নবী (সাঃ) কর্তৃক হযরত আলীর খেলাফতের ঘোষণা শুনেছিল আবার যখন আবু বকরের খেলাফতের কথা শুনেন, তারা হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন, এবং বললেন, "আমরা আলীকে খলিফা জানি। (মাঝখানে আবু বকর কোথা থেকে চলে এলো) আসল ঘটনা আমরা জেনে নেই, তবে জাকাত দিব"। কিন্তু আবু বকর তাদেরকে হত্যার জন্য অটল ছিলেন। কারণ আসল কথা যেন না উঠে আসে। আমি এই ঘটনা তাদের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি যারা এটা নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করতে চান।

কিন্তু আমি এটুকু নিশ্চয়ই বলবো যে, রাসুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় তালাবাহ নামে একজন এসে রাসুলুল্লাহ (সঃ)কে বলল, "ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি খোদার কাছে আমার জন্য দোয়া করুন খোদা যেন আমাকে ধনী বানিয়ে দেয়"। সে অনেক অনুরোধ করল আর প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জাকাত দেবে। যাই হোক, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেন এবং সে এতো ধনী হয়ে গেল যে মদীনায় তার উট ও ভেড়া এতো হয়ে গিয়েছিল, যে মদীনা ও তার আশপাশে তার জায়গা হচ্ছিল না, তাই সে মদীনার বাইরে চলে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে শুক্রবারের নামাজেও সে আসতে পারতো না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে যাকাতের জন্য যখন লোক পাঠালেন তখন সে ব্যক্তি এই বলে লোককে ফেরত দেয় যে ইহাতো "জিজিয়া" এর জাকাত দেব কেন। কিন্তু নবী (সাঃ) না তাকে হত্যা করলেন, না হত্যার হুকুম দিলেন।

অবশেষে কোরআনের আয়াত নাযিল হল

এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিল যদি দয়া করে কিছু ধনসম্পত্তি দেয় তবে নিশ্চয়ই দান খয়রাত করবে এবং নেককার বান্দা হয়ে যাবে। যখন খোদা দয়া করে কিছু দান করল তখন কৃপণতা দেখালো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। (সুরা তওবা, ৭৫-৭৬)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তালাবাহ কাঁদতে কাঁদতে নবীর কাছে এসে হাজির হল আর বলল ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার যাকাত কবুল করে নিন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

তখন যদি আবু বকর ও ওমর সুন্নাতে রাসুল অনুসরণ করতেন, তবে এর বিরোধীতা কেন? শুধু যাকাত না দেওয়াতে বেগুনাহ্, নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা কেন/ আবু বকরের ভুল ফায়সালার সংশোধনকারীরা বা তার এই ব্যাখ্যায় যে, যাকাত খোদার মাল, ইহাকে না দেওয়াতে হত্যা জায়েজ হয়ে যায়। তালাবাহ্র ঘটনার পর, আবু বকরের জন্যও তার সমর্থনাকরীদের এই হাদীসের আলোকে আর কোন অজুহাত নাই। কেননা তালাবা ও জিজিয়া মনে করে যাকাত দেওয়া বন্ধ রেখেছে কিন্তু রাসুল (সাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন নাই। কে বলতে পারবে যে, আবু বকর ওমরকে এইভাবে আশ্বস্ত করেন নাই। যে যাকাত বন্ধকারীদের হত্যা এই জন্য দরকার আছে যে, তারা গাদীরের ঘটনার যেখানে আলী (আঃ)কে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) উত্তরাধিকারী সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়েছিল, উত্থাপন করে, তার প্রতিবাদ করছে। আবার যাতে করে ইসলামী শহরগুলোতে এই ঘটনা ছড়িয়ে না যায়, ব্যাস এর পরই খোদা ওমরের দিলকে প্রশস্ত করে দেয়। তাদের হত্যা বৈধ্য হয়ে যায়। কেননা তিনি সেই ওমর আছেন যিনি আবু বকরে বায়াত অস্বীকারকারীরা মা ফাতেমার ঘরে বসে থাকার কারণে ফাতেমা (আঃ)-এর ঘরের সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন "যদি তোমরা ঘর থেকে বের হয়ে আবু বকরের বায়াত না কর, তবে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব"।

তৃতীয় ঘটনাও আবু বকরে খেলাফতের প্রথম দিকে ঘটেছিল। এ ঘটনায় আবু বকর ও ওমরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। আবু বকর যে কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর বানীর মনগড়া মন্তব্য করেছিলেন তা খালেদ বিন ওয়ালিদের ঘটনায় আছে। খালেদ বিন ওয়ালিদ, মালেক বিন নাওয়ারাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে সেই রাতে তার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে জেনা (বেভিচার) করে। ওমর খালেদকে বললেন "হে আল্লাহর শত্রু, তুই একজন মুসলমানকে হত্যা করলি এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে জেনা (বেভিচার) করলি। খোদার কসম! আমি তোকে পাথর দ্বারা রজম করবো (পাথর মেরে মেরে হত্যা করব)"।

আবু বকর খালেদের পক্ষ অবলম্বন করে বললেন, "হে ওমর, একে ছেড়ে দাও। সে বুঝেনি এবং এ কারণে ভুল হয়ে গেছে। খালেদের ব্যাপারে তোমার মুখ বন্ধ রাখ"। ইহা আরেকটি লজ্জাকর ঘটনা এবং সেও আবার এতো বড় সাহাবী যাকে আমরা সম্মান ও গর্বের সঙ্গে দেখি। আমরা তাকে সায়ফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) নামে ডাকি। দুঃখজনক হলো যে, এই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্থান দখল করে আছে। আমার বুঝে আসে না যে খালেদ বিন ওয়ালিদের মতো সাহাবীদের ব্যাপারে কি মন্তব্য করব সে এমন একজন স্বনামধন্য সাহাবী যিনি বনী তামিন গোত্রের সর্দার, শক্তি, বাহাদুরী ও সাহসে ও অদ্বিতীয় ছিলেন যার নাম মালেক বিন নাওয়েরাহ, তাকে হত্যা করে। ইতিহাসের লেখকগণ বলেছেন, খালেদ বিন ওয়ালিদ মালেক ও তার সঙ্গীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।কারণ মালেক ও তার সঙ্গীরা অস্ত্র রেখে যখন জামাতে নামায পড়ছিলেন তখন খালেদের সঙ্গীরা মালেক ও তার সাথীদের রশিদ দিয়ে বেঁধে ফেলে। সেই বন্দীদের মধ্যে মালেকের স্ত্রী লাইলাও ছিল। সারা আরবে তার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখা যেত না। খালেদ তাকে দেখামাত্র বিচলিত হয়ে পড়ে। মালেক, খালেদকে বলেন যে, "আমাকে আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দাও। তিনি যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন"। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও ইবনে কুতাদা আনসারীও মালেককে আবু বকরের নিকট পাঠিয়ে দিতে জোর দাবি জানান। কিন্তু খালেদ কারোর কথা তোয়াক্কা না করে বলল, "তাকে যদি আমি হত্যা না করি, তবে খোদা আমাকে ক্ষমা করবেন না।" তখন মালেক তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "এই সে, যে আমাকে হত্যা করিয়েছে"। খালেদ হুকুম করল, সঙ্গে সঙ্গে মালেকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। খালেদ মালেকের স্ত্রী লাইলাকে হস্তগত করে সেই রাতে তার সঙ্গে জিনা (বেভিচার) করে নিজের মুখে কালিমা লেপন করে।

আমি সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাপারে কি আর বলবো যারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বেগুনাহ মুসলমানদেরকে হত্যা করে। আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে নেয়। খোদা যাকে হারাম করেছেন সে স্বামী হত্যা স্ত্রীকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়।

ইসলামের বিধান মতে যার স্বামী মরে যায়, একটা সময়ের জন্য সে বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু খালেদের জন্য মালেক ও তাহার সঙ্গীদের কষ্ট দিয়ে লোমহর্ষকভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীর সঙ্গে কোন বাদ বিচার ছাড়াই জেনা করা এটা তো কোন ব্যাপারই ছিল না। খালেদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ওমর স্বাক্ষী দিয়েছেন যে তারা মুসলমান ছিল কিন্তু খালেদের নিকট তাদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। ইবনে কুতাদা আনসারী খালেদের কর্মকাণ্ডে ভয়ানক রাগ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় ফিরে আসেন এবং কসম খেলেন যে, যে দলে খালেদ সেনাপতি হবে, সে দলে তিনি থাকবেন না।

এই বিষয়ের উপর মোহাম্মদ হোসেন হাইকেল মিশরীয় বই "আবু বকর সিদ্দিকী" এতে ওমরের বিচার ও মন্তব্যের দলিল আছে। যিনি ন্যায় বিচারে প্রতীক সেই ওমরেরই রায় আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সুতরাং হাইকেল বর্ণনা করেন, ওমর বললেন, খালেদ একজন মুসলমানের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ইসলামী বিধি লংঘন করে, তার সঙ্গে জেনা করে নিজের মুখে কালিমা লেপন করেছে। এই কারণেই তাকে সেনাপতি থেকে সরাতে হবে সে যেন দ্বিতীয়বার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করতে পারে যা থেকে মুসলমানদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এবং আরবদের মধ্যে মুসলমানের মানমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত না হয়ে পড়ে। যদি একথা মেনেও নেই যে মালেকের ব্যাপারে খালেদ অন্যায় করে ভুল করেছে, যাকে ওমর কখনও মানতে পারে নাই তাহলে লাইলার সঙ্গে সে যে এতবড় কলংকের কাজ করেছে তার জন্য বিচার করে সাজা ধার্য্য করা কি উচিত ছিল না? এই অজুহাত কখনও দাঁড় করা চলবে না যে সে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) ছিল সে বিজয়ের নায়ক ছিল, যে দিকে যেত জয় সুনিশ্চিত হয়ে যেত। আর এই অজুহাতে যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা খালেদ ও তার মতো সেনাপতিদের জন্য স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ লাইসেন্স হয়ে যাবে। এবং মুসলমানদের জন্য এক কলঙ্কজনক নজির সৃষ্টি করবে, যার জন্য ওমর বার বার শুধু তাগিদ দিতে থান। যার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন খালেদকে ডেকে আবু বকর অনেক ধমকান। (আবু বকর সিদ্দীক-হাইকাল) আমি কি ওস্তাদ

হাইকাল ও সেই আলেমদেরকে যারা সাহাবাদের কর্মকাণ্ডগুলো খুব চালাকির সঙ্গে উপস্থাপন করে থাকেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আবু বকর খালেদের উপর কোন সাজা ধায্য করেন নাই? আর মিষ্টার হাইকেলের কথামত ন্যায়ের প্রতীক ওমর খালেদকে শুধু সেনাপতি থেকে বরখাস্ত করে ক্ষান্ত থাকলেন কেন, বিচার করে সাজা ধার্য্য করলেন না কেন? বিচারের সম্মত না হয়ে উনারা কি কোরআনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন কি? আসতাগফিরুল্লাহ এটাকে বলে রাজনীতি! এখন বলুন তাদের রাজনীতি, আপনারা কিভাবে বুঝবেন যারা সত্যকে বদলিলে আল্লাহর কুরআনের বাণীকে দেওয়ালে ছুড়ে মারতে পারে, তারা কিনা করতে পারে?

আমি কি আমাদের আলেমদেরকে প্রশ্ন করতে পারি, যারা নিজেদের বইতে লিখেছেন এক সভ্রান্ত ঘরের মহিলা চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জনাব উসামা তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য নবীর কাছে গেলেন। সুপারিশ করা মাত্রই নবী (সাঃ) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন আর বললেন, "দুঃখ হয় তোমার উপর, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে এসেছো। যদি আমার মেয়ে ফাতেমাও চুরি করতো,তবে তার হাত আমি কেটে দিতাম (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) তোমাদের আগের লোকেরা এই জন্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা যখন কোন ভদ্র লোক চুরি করতো তাকে ছেড়ে দিত আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার বিচার করে সাজা দিতো"।

আর এই ঘটনার দিন নিরাপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যা করে সেই রাত্রেই তার স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করাতে সাহাবায়ে কেরামগণ কেন চুপ থাকতে পারলেন? যেখানে স্বামীর দুঃখজনক মৃত্যুতে স্ত্রীর উপর শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল। সেখানে তার উপর করুণা না করা, এ কোন ধরনের ভদ্রতা, একেই বলে "মরার উপর খাড়ার ঘা"। যদি আমাদের এই ওলেমারা খালেদের এই কর্মকাণ্ডের কথা শুনে লজ্জা শরমে চুপ থাকতেন তাও কথা ছিল। কিন্তু হায়! চুপ থাকার পরিবর্তে তাকে সম্মানসহ তথাকথিত উপাধি দেওয়া হলো 'সায়ফুল্লাহ' আল্লাহর তলোয়ার। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমার এক বন্ধু ইয়ারকি করতে ও কথা ঘুরাতে ওস্তাদ ছিল। সে আমাকে একবার হতভম্ব করে দেয়। ঘটনা হলো আমার সেই সাবেকি অজ্ঞতার সময় একবার আমি খালেদের প্রশংসা করে সাফুল্লাহ বলা মাত্র, আমার বন্ধু বলে উঠল না সে তো শয়তানের তলোয়ার ছিল। সে সময় আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। কিন্তু পরে বিস্তারিত পড়াশুনা ও আলোচনার পর আল্লাহ আমার চোখ খুলে দেন এবং জোর জবরদস্তী করে খেলাফত দখলকারীদের স্বভাব চরিত্র জানা হয়ে যায় এবং এটাও জানতে পারি এই লোকগুলো আল্লাহর হুকুমকে বদলিয়ে আল্লাহর সীমালংঘন করে ছিল, তখন আমার সেই বিস্ময় দুরে হয়ে যায়।

নবী (সাঃ)-এর সময়ই খালেদের একটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটেছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) খালেদকে বনি জুদিয়ামা গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠান কিন্তু কোনো রকম হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বারণ করেন। বনি জুদিয়ামা গোত্রের লোকেরা "আমরা ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি" এই কথাটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেনি। বাস, খালেদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করে দেয়। বন্দীদেরকে তার সঙ্গীদের কাছে দিয়ে বলে তাদেরকে হত্যা করে দাও কিন্তু অনেকে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়ে বলল, "জিনা এরা মুসলমান হয়ে গেছে। এদের হত্যা করা বৈধ নয়"। তাহারা মদীনায় ফিরে এসে নবী (সাঃ)কে সম্পূর্ণ বর্ণনার পর রাসুল্লালহ দুইবার বলিলেন হে আল্লাহ খালেদ যে ঘটনা ঘটাল তার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই"। সহি *(বোখারী ৪র্থ খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠা।)* ইহার পর হযরত আলী (আঃ)কে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে বনি জুদিয়ামা গোত্রে পাঠালেন। খালেদ যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে হযরত আলী(আঃ) তাদের ওয়ারিশদেরকে তার ক্ষতিপূরণ দিলেন। এমনকি যে কুকুর মারা গিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাবার দিকে মুখ করে দুহাত উঁচু করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! খালেদের কর্ম কাণ্ড থেকে আমি মুক্ত আছি"। এ কথা তিনবার উচ্চারণ করলেন। *সিরাত ইবনে হেশাম, তাবাকাত ইবনে সাদ।*

আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি সাহাবাদের বিচার এখন কোথায় গেল? যখন খালেদ বিন ওয়ালিদ শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত আর আমরা তাকে 'সায়ফুল্লাহ' বলে ডাকি। তাহলে কি, আল্লাহর তলোয়ার নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই কি ছিল? যেখানে শরিয়ত মতে হত্যা ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে বলে, কিন্তু অন্যদিকে খালেদ বিদ্রোহ করে পাইকারীভাবে মুসলমানদের হত্যা করে তাদের শস্য সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়, বিধবা ও বাচ্চাদেরকে বন্দী বানানো হয়। শেষ পর্যন্ত এটা খোদার উপর দোষ দেয়া হয়! হে মাবুদ! তুমি যে মাটি ও আকাশ এবং তার মধ্যে জিনিসগুলোকে অযথা সৃষ্টি করে নাই এটা কাফেরদের বিশ্বাস আবু বকর তো খলিফাতুল মুসলিমীন ছিলেন তিনি কি করে এগুলোকে বৈধ বলে মেনে নিলেন। এতো বড় বড় অপরাধের কথা শুনে তিনি কিরে চুপ থাকতে পারেন; শুধু ইহাই নয় বরং ওমরকে বাধ্য করলেন খালেদের বিরুদ্ধে মুখ না খুলতে, তাহলে আবু বকর কি সত্যি সত্যি খালেদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে কোন মূল্যে এটা মানতে পারি না যে আবু বকর খালেদের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের স্বপক্ষে ছিলেন। খালেদ সেই ব্যক্তি যাকে ওমর "খোদার শত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর ওমরের রায় ছিল খালেদের হত্যা বৈধ আছে, কেননা সে বেগুনাহ মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাকে রজম করা হোক। কেননা সে মালেকের স্ত্রী লাইলার সঙ্গে জেনা করেছে কিন্তু এসব কিছুই হলো না কার্য্যত ওমর বিরুদ্ধে খালেদের জয় হয়েছে। কেননা ঐসব কথার পরও আবু বকর খালেদের পক্ষ নিয়ে নেন। আবু বকর অন্য সবার চেয়ে খালেদের স্বভাব চরিত্র বেশি জানতেন তার প্রমাণ এতো সব ঘটনার পরও আবু বকর আবার খালেদকে আল ইয়ামামাতে পাঠান। সেখানে গিয়ে সে বিজয়ী হয় এবং সেখানেও খালেদ অন্য এক মহিলার সঙ্গে জেনা করে মুখে কালিমা লেপন করে যেভাবে লায়লার সঙ্গে করেছিল। এখনো সেই মুসলমানদের কিংবা তাদের অনুসারীর রক্ত শুকানোর আগেই খালেদ আবার সেই একই কাণ্ড ঘটায়। এইবার কিন্তু আবু বকর খালেদকে ডেকে এনে পূর্বেকার চাইতে অনেক বেশী ধমক দেন।

ও বাচ্চাদেরকে বন্দী বানানো হয়। শেষ পর্যন্ত এটা খোদার উপর দোষ দেয়া হয়। হে মাবুদ! তুমি যে মাটি ও আকাশ এবং তার মধ্যে জিনিসগুলোকে অযথা সৃষ্টি করো নাই। আবু বকর যে খলিফাতুল মুসলিমীন ছিলেন তিনি কি করে এগুলোকে বৈধ বলে মেনে নিলেন। এতো বড় বড় অপরাধের কথা শুনে তিনি কি করে চুপ থাকতে পারলেন; শুধু ইহাই নয় বরং ওমরকে বাধ্য করলেন খালেদের বিরুদ্ধে মুখ না খুলতে, তাহলে আবু বকর কি সত্যি সত্যি খালেদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে কোন মূল্যে এটা মানতে পারি না যে আবু বকর খালেদের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের সপক্ষে ছিলেন। খালেদ সেই ব্যক্তি যাকে ওমর "খোদার শত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর ওমরের রায় ছিল খালেদের হত্যা বৈধ আছে কেননা সে বেগুনাহ মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাকে রজম করা হোক। কেননা সে মালেকের স্ত্রী লাইলার সঙ্গে জেনা করেছে, কিন্তু এসব কিছুই হলো কার্য্যতঃ ওমরের বিরুদ্ধে খালেদের জয় হয়েছে। কেননা ঐ সব কথার পরও আবু বকর খালেদের পক্ষ নিয়ে নেন। আবু বকর অন্য সবার চেয়ে খালেদের স্বভাব চরিত্র বেশী জানতেন তার প্রমান এতো সব ঘটনার পরও আবু বকর আবার খালেদকে আলইয়ামামাতে পাঠান। সেখানে গিয়ে সে বিজয়ী হয় এবং সেখানেও খালেদ অন্য এক মহিলার সঙ্গে জেনা করে মুখে কালিমা লেপন করে যেভাবে লায়লার সঙ্গে করেছিল। এখনো সেই মুসলমানদের কিংবা তাদের অনুসারীদের রক্ত শুকানোর আগেই খালেদ আবার সেই একই কান্ড ঘটায়।। এইবার কিন্তু আবু বকর খালেদকে ডেকে এনে পূর্বেকার চাইতে অনেক বেশী ধমক দেন।

এই মহিলারও স্বামী ছিল। তাকে হত্যা করে তার স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করে মুখে কালিমা লেপন করে যেভাবে মালেকের স্ত্রীর সঙ্গে করেছিল। এই জন্যই তো খালেদকে এতো বেশী ধমকানো হয় তা না হলে এতো ধমক দেওয়া প্রয়োজন ছিল না। ঐতিহাসিকরা সেই পত্রও নকল করেছেন যা আবু বকর খালেদকে লিখেছিলেন " হে খালেদ" তুই বার বার মেয়েদের বিয়ে করছিস আর এখনো তোর ঘরের নিকট

বারো শত মুসলমানের রক্ত পড়ে আছে যা শুকায়নি।" খালেদ যখন সেই চিঠি পড়ে, তখন বলে এটা সেই বাম হাতের কাজ (খালেদ ওমরকে বাম হাত বলে ডাকত) এই সব কাজের জন্য আমি সেই সকল সাহাবাদেরকে ঘৃণা করতে লাগলাম এবং তাদের সেই সব অনুসরণকারীদের কেও ঘৃণা করতে লাগলাম যারা সব সাহাবার নামের সঙ্গে রাজিআল্লাহ লাগিয়ে দেয় এবং সেই সব আলেমদেরকেও ঘৃণা করতে লাগলাম যারা বড় বাহাদুরির সঙ্গে সেই সব সাহাবীদের রক্ষা করে থাকে এবং কোরআনের বানীর বিরোধীতা করে আবু বকর, ওমর, উসমান, খালেদ বিন ওয়ালিদ, মুয়াবিয়া, ওমর ইবনুল আসের মত ব্যক্তিদের কর্মের যৌক্তিকতার সমর্থনে জাল হাদীস তৈরী করে।

হে আল্লাহ! আমার মাবুদ আমি সেই সব লোকদের থেকে আলাদা থাকতে চাই এবং তাদের সেই সব কথা ও কাজের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। যাদের কাজের দ্বারা তোর অবৈধ জিনিসকে তারা বৈধ করে নিয়েছে, তোর সীমালংঘন করেছে, তাদেরকে জেনে শুনে অনুসরণকারীও মান্যকারীদের কেও আমি ঘৃণা করছি। হে আমার প্রভু, আমি যখন জাহিল ছিলাম তাদেরকে মানতাম, ভালোবাসতাম। তুই আমার ভুলকে ক্ষমা করে দে কেননা তোর রাসুল (সাঃ) বলেছেন জাহিল আর অজ্ঞরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়।

হে খোদা, আমার বাপ দাদারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিল, সত্যকে আমাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছিল, কুফুরির দিকে ফিরে যাওয়া সাহাবীদেরকে, তোর নবীর পরে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমার বাপ দাদারা উমাইয়া এবং তার পর আব্বাসীদের প্রতারণার শিকার হয়ে গিয়েছিল। হে পরওয়ারদিগার, তাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও। প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথা তোমার জানা আছে। আমার বাপ দাদারা সেই কুফুরির দিকে ফিরে যাওয়া সাহাবীদেরকে, নবীর সাহায্যকারী ও মোহাব্বাতকারী জেনে ভালোবাসতো। হে প্রভু! তুমি ভালো করে জানো যে, আমাদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের

ভালবাসা সমস্ত ইমামদের জন্য যাঁদেরকে তুমি বেছে নিয়ে পাক পবিত্র করে রেখেছ, যাঁদেরকে উচ্চ আসনে বসিয়ে সম্মানিত করেছো এবং তাঁদেরই দলনেতা হলেন সাইয়্যেদুল মুসলেমিন, আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ)।

হে আল্লাহ! আমাকে তাঁদের পথে চালিত কর, যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যাঁরা তাঁদের পথের অনুসারী। তাঁদের কিস্তিতে আমাকে আরোহী করে দাও এবং তাঁদের সাথে শক্ত শিকল দ্বারা বাঁধতে আমাকে সাহায্য কর। তাঁদের দরজার ভিতরে আমাকে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং তাঁদের প্রেমে আমার জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণীত কর। আমাকে তাঁদের কথা ও কাজের অনুসরণ করতে সাহায্য কর এবং তাঁদের মহান গুণাবলীর প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে তাঁদের সাথে রাখ। যে জন্য তোমার রাসুল (সাঃ) বলেছেন, " মানুষকে একদিন যাদেরকে তারা ভালবাসে তাদের সাথে একত্রিত করা হবে (কেয়ামতের দিন)"।

নৌকার হাদীস

রাসুলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন– "তোমাদের নিকট আমার আহলে বায়তের উদাহরণ নূহ (আঃ) এর নৌকার সমতুল্য। সেই দিন নূহ (আঃ) এর নৌকায় যারা উঠেছিল তারাই নাজাত পেয়েছিল আর যারা উঠেনি তারাই ডুবে মরেছিল"।

মুসতারাক হাকীম, ইয়া নাবী আল মুয়াদেহ;

অন্য হাদীসে আছে, "তোমাদের নিকট আমার আহলে বায়তের উদাহরণ বনী ইসরাইলের তওবার গেইটের সমতুল্য। যে তাতে প্রবেশ করল ক্ষমা পেয়ে গেল"।

ইবনে হাজার মাক্কী এই হাদীস তাঁর 'সোয়ায়েকে মোহারেকা' নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন- নৌকার সঙ্গে এই জন্য তুলনা করেছেন, যারা তাদের প্রতি কৃত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে এবং তাঁদের সম্মান করবে তাঁদের আলেমদের প্রদর্শিত পথে চলবে তারা অসঙ্গতির অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং যারা তাঁদের বিরোধীতা করবে, অকৃতজ্ঞতার সাগরে ডুবে যাবে এবং জুলুম, অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তওবার গেইটের সঙ্গে এই জন্যে তুলনা করলেন যে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। বাবে হেতা হলো বায়তুল মোকাদ্দাস যা বনী ইসরাইলদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ করেছিলেন ঠিক একইভাবে আহলে বায়েত হচ্ছে এ জাতির মুক্তির মাধ্যম। মুসলমানদের আহলে বায়তের সঙ্গে ভালবাসা ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়।

আহ্! আমি যদি ইবনে হাযার মাক্কীকে কাছে পেতাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম আপনি কি সেই সবার মতো নৌকাতে উঠেছেন এবং সেই দরজায় প্রবেশ করেছেন, সেই আহলে বায়তের প্রদর্শিত পথে চলেছেন নাকি সেই সবার মতো যারা মুখে বলে এক, করে আর এক। এমন অনেক অন্ধ ও জাহিল আলেম আছেন তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি ও প্রশ্ন করেছি, আহলে বায়েত সম্বন্ধে। তখন তারা তড়িৎ উত্তর দেয় "আমরা অন্যদের চেয়ে বেশী আলী (আঃ) ও আহলে বায়েতের সঙ্গে আছি। আমরা আহলে বায়েতকে সম্মান করি" এমন কাউকেও পাওয়া যাবে না যে আহলে বায়তের গুনাবলী, মান মর্যাদাকে অস্বীকার করে।

জি হ্যাঁ, তারা সেই সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে থাকে না অথবা আহলে বায়েতকে মানেন ও সম্মান দেন, কিন্তু অনুসরণ করেন তাদের শত্রু, প্রতিপক্ষ বা তাদের হত্যাকারীদের আবার এমনও আছেন, যারা আহলে বায়েতকে চিনেনই না। কেননা যদি তাদেরকে

জিজ্ঞাসা করেন আহলে বায়েত কারা? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবে নবীর স্ত্রীগন, যাদেরকে আল্লাহ্ সকল অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখেছেন। এক আলেম আমার এ সমস্যা সমধান করে দিয়েছিলেন। আমি যখন সেই আলেমকে প্রশ্ন করি যে, "আহলে বায়েত কারা"? তিনি বললেন- "আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকলেই আহলে বায়তের প্রতিনিধিত্ব করি"। আমি তার কথায় হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কি করে হয় ভাই"? সে বলল- "রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন অর্ধেক ইসলাম তোমরা আমার বিবি আয়শার কাছ থেকে পেয়ে যাবে। সেহেতু আমরা অর্ধেক দ্বীন আহলে বায়তের (মানে আয়শার) কাছ থেকে পেয়ে গেলাম"।

আপনি দেখেছেন ইনারা আহলে বায়েত কাদেরকে মানেন। এইভাবে তারা আহলে বায়েতের সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন বার ইমামের নাম জানেন? তাহলে তারা হযরত আলী (আঃ) ইমাম হাসান (আঃ) ইমাম হোসেন (আঃ) ছাড়া কাউকেও জানেন না, এমন কি ইমাম হাসান ও হোসেনের ইমামতকে মানে না। এরা শুধু আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়ার মতো লোককে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

মাবিয়া সেই ব্যক্তি যে ইমাম হাসানকে বিষ দ্বারা হত্যা করিয়েছে। তাকেই আবার তারা কাতেবে ওহী নামে ডাকে। আসল কথা হল এই পরস্পর বিরোধী কথায় সংমিশ্রন ঘটিয়েসত্য জিনিসকে মিথ্যার দ্বারা লুকিয়ে রাখতে চায়। তা না হলে, এটা কি করে সম্ভব? একই মনে আল্লাহ্ ও শয়তানের প্রেমের সহঅবস্থান করতে পারে কিভাবে, আল্লাহর ঘোষণা- *"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ভালবাসে, হউক না এ বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা এদের জাতি গোত্র।এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন খোদায়ী নুরের আলো দিয়ে। তিনি এদেরকে বেহেশতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত সেখানে তা*

থাকবে। আল্লাহ এদের প্রতি প্রসন্ন এবং এরাও তাতে সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ আল্লাহার দলই সফলকাম হবে"। আল কোরআন মুজাদাল-২২।

অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে, "হে ঈমানদারগণ! আমার এবং তোমাদের নিজেদের শত্রুদের বন্ধু বানিও না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করিতেছ অথচ ওরা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছ"। আল কোরআন ৬০-১

৩। "যারা আমার মত চলবে" সে হাদীস

"যারা একথা পছন্দ করবে যে তারা আমার মত জীবন ধারণ করবে, আমার মত মৃত্যুবরণ করবে, মৃত্যুর পর জান্নাতে আনান্দে থাকবে। তবে তারা যেন আমার পর আলীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমার আহলে বায়তের অনুসরণ করে। কেননা তাঁদেরকে আমার ইল্‌ম ও জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার উম্মাতগণ যারা তাঁদের মর্যাদাকে অস্বীকার করবে, যারা আমার সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা ও সম্পর্ক অমান্য করবে তাদের জন্য দুঃখ হয়, খোদা যেন আমার সাফায়াত কখনও তাদের ভাগ্যে না জুটান"।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। এই হাদীসটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে এর অতিরিক্ত ব্যখ্যার কোন দরকার নাই। কারণ এতে খুব খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে আলীর (আঃ) এবং আহলে বায়তের অনুসরণ না করা হলে নবী (সাঃ) এর সাফায়াত পাবে না। এ ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ রাখা হয়নি, কোন অজুহাতের ও সুযোগ নাই। তা ছাড়া কথাগুলোর ভিন্নকোন ব্যাখ্যা দেওয়ারও অবকাশ নাই। উপরোক্ত ইবনে হজর আসকুলানী তার 'সাওয়াহিদ আল তওহীদ' ২য় খন্ড ৩৭১ পৃঃ গ্রন্থে যখন এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে- আমি নিবেদন করতে চাই এই হাদীসের অন্যতম রাবী ইয়াহিয়া বিন ইয়ালাল্‌ মুহারিবি একজন দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন- তখন আমি বুঝলাম যে আসলেই এই হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা কম। আর

এও বুঝলাম ইয়াহিয়া বিন মুহারিবি এই হাদীসটির গ্রহনযোগ্যতার জন্য একমাত্র অন্তরায় কেননা তিনি নির্ভরযোগ্য নন। কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি আমি যখন ইবরাহীম আল জাবানের 'আদর্শ সম্পির্কত আলোচনা শীর্ষক' বই পড়ছিলাম তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঘটনা এই ইব্রাহীম লিখেন আসলে ইয়াহীয়া বিন মুহারিবি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যার উপর বোখারী ও মুসলিমগণ নির্ভর করেছেন। তখন আমি বোখারীতে খুঁজতে থাকলাম হঠাৎ খোঁজতে খোঁজতে ৩য় খন্ড ৩১ পৃঃ যাতে অনেক হাদীসের সাথে এটাও তিনি লিখেছেন। আর মুসলিম ৫ম খন্ড ১১৯ পৃঃ নবুল হদুদে এই হাদীসটি লিখেছে এবং জাহবী হাদীসকে মুর্সাল বলেছেন। আরও অনেক ইমাম ও মুহাদ্দীস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর শায়খাইন, বোখারী, মুসলিম তা দিয়ে দলিল ও দিয়েছেন। তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কথা নয়। সত্যকে বদলে দিয়ে, একজন খালেছ বর্ণনাকারীকে মিথ্যে তুহমত দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দেখা গেল যখন সেহাসিত্তা এই হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন তখন সত্য প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আহলে বায়তের অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে যাচ্ছে তাই ইবনে হজর মুহারিবির উপর বদনাম ও তুহমতের খড়্গ নিয়ে আক্রমণ করেছেন।

কিন্তু ইবনে হজর জানেন না যে তাকে ছাড়াও অনেক বড় বড় আলেম আছে যারা তার ছোট বড় সব কাজেরই খবর রাখেন। তার মূর্খতার মুখোশ উন্মোচনের ক্ষমতা রাখেন কারণ তারা খোদাই নূরে আলোকিত আহলে বায়তের অনুসারীরা।

মূল বক্তব্যের বিরুদ্ধে গবেষণা চালানোর ফলে মুসলিম উম্মার এ দুর্দশা

এ গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে আমার যে উপলব্ধি হয়েছে তা হলো উম্মতে মুসলেমার জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও সাহাবাগণের ইজতেহাদ করা। এর ফল হয়েছে খোদার নির্ধারিত সীমানা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, আর সুন্নাতে রাসুল নির্মুল হয়েছে, আর সাহাবাদের পরের ইমাম ও ওলামাগণ সেই ইজতেহাদ অনুযায়ী কিয়াস করেছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে কখনও যদি সাহাবাদের কথা নবী (সাঃ) এর সুন্নাত ও কোরানের বিপক্ষেও গিয়েছে তবুও তারা সাহাবাগণকেই প্রামাণ্য দিয়ে কাজ করেছে।

সাহাবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে এই ইজতেহাদের কাজ করেছেন তিনি হলেন দ্বিতীয় খলিফা ওমর যে রাসুল (সাঃ) এর পর কোরানের বানী উপেক্ষা করে নিজের মতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন যাকাত দানের খাতকে কোরআন দুই ভাগে বিভক্ত করেছে একটি হলো ধর্মের প্রতি আগ্রহী বিধর্মীদের মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু ওমর এই খাতকে তার সময় এই বলে উঠিয়ে দেন যে- তোমাদের প্রয়োজন আমাদের নেই। আসল হাদীসের বিপরীতে সাহাবাদের ইজতেহাদ যে কত বেশী হয়েছে তার সংখ্যা অনেক। তারা ত নবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতেই অনেকবার তাঁর বিরোধিতা করেছে, যার বর্ণনা এ গ্রন্থের অনেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে আরও একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

ঘটনা হলো, রাসুলে খোদা (সাঃ) আবু হুরাইরাকে এই বলে পাঠান "যে রাস্তায় তোমার সাথে যার সাক্ষাত হবে সে যদি মনে মুখে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিও"। প্রথমেই রাস্তায় ওমরের সাথে সাক্ষাত হয়। আবু হুরাইরা ওমরকে রাসুল (সাঃ) এর উক্ত বানী শুনান- তৎক্ষণাৎ ওমর ক্ষেপে তাকে মারতে উদ্যত হন ও এটা বলতে মানা করেন এবং পরে এমন মার মারেন যে তিনি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। আবু হুরাইরা পড়ি-মরি করে কাঁদতে কাঁদতে রাসুল (সাঃ) এর খেদমতে এসে সব কথা বলেন। রাসুল (সাঃ) ওমরকে বলেন- "তুমি এটা কেন করলে?

ওমর বললেন- "হুজুর আপনি কি আবু হুরাইরাকে এটা বলেছেন যে, যে কোন ব্যক্তি যদি মনে বিশ্বাস রেখে মুখে লাইলাহা কলেমা বলে সে জান্নাতি"? হুজুর বললেন- হাঁ। ওমর বললেন- "হুজুর! এটা আর বলা ঠিক হবে না, আমার ভয় হয় মানুষ এজন্য শুধু লাইলাহার উপরই না শুধু নির্ভর করে চলে"।

আর হযরতের ওমরের পুত্র আবদুল্লাহর ভয় হলো যে তাইয়ামমুমের আয়াতের হুকুম মানুষ যদি জানতে পারে তাহলে আবার সর্দী জ্বরেও তাইয়াম্মুমের উপর নির্ভর করে বসবে। এ জন্য তিনি বলেছিলেন, "স্বপ্নদোষের পর পানি না থাকলে- নামাজ ছেড়ে দিতে হবে"।

আফসোস! এই সব ব্যক্তিরা যদি খোদাই হুকুম ও রাসুল (সাঃ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর উপর অযথা ইজতেহাদ না করে- শরিয়াতের মূল কথাকে যদি নষ্ট না করে দিত, খোদাই হুকুমকে যদি অযথা পরিবর্তন না করত, তাহলে উম্মতের মধ্যে অসংখ্য গ্রুপ, দল ও মাযহাবের গোড়াপত্তন হতো না ,তা হলে কতই না ভাল হত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রসুল (সাঃ) কে (মাসুম) ভুলের উর্দ্ধে মনে করে না- সেও অন্যসবের মত একজন মানুষ, শুধু কোরানের তাবলিগ করার ব্যাপারেই তিনি মাসুম। অন্য সব কাজ কর্মে তিনি আর সবার মতই মানুষ হিসাবে ভুল করতে পারেন। তাদের এই কথার সমর্থনে বলা হয় হযরত ওমর বেশ কয়বার রাসুল (সাঃ) এর ভুল শুদ্ধ করে দিয়েছেন।

যেমন অনেক মূর্খ ব্যক্তিদের ধারণা- রাসুল (সাঃ) ঘরের মধ্যে শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হন। একদা রাসুল (সাঃ) ঘরে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন, গজল পরিবেশন হচ্ছিল, ছোট ছোট বাচ্চারা দফ বাজাতে ছিলো আর স্ফূর্তি করছিল। এ সময় ওমর ঘরে প্রবেশ করেন- তখন শয়তান বিতাড়িত হয়, মেয়েরা দফকে নিজেদের পিছনে সরিয়ে ফেলেন। তখন রসুল (সাঃ) বললেন-"হে ওমর শয়তান যেইমাত্র তোমাকে দেখলো, তখন তুমি যে রাস্তায় এসেছিলে সে রাস্তায় না গিয়ে, অন্য রাস্তা ধরে পালিয়ে গেছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই"।

আসলেই এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে, ওমর দ্বীনের ব্যাপারে নিজে নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য ভাবতেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে এমনকি দ্বীনের ব্যাপারেও রসুলের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ছিলেন বলে মনে করতেন যেমন আবু হুরায়রার ঘটনা।

আল্লাহর কোরআনের বাণীর বিপরীতে নিজস্ব ইজতেহাদের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে সাহাবাদের মধ্যে একটি বিশেষ গ্রুপের সৃষ্টি হয়, যার নেতৃত্ব দেন ওমর বিন খাত্তাব। আর এই জামাতটাই কাগজ কলম আনতে বলার হাদীসে বর্ণিত ঘটনার সময় হযরত ওমরকে পুরাপুরি সমর্থন করে। অথচ এ ধরণের আচরণ ছিল মূলতঃ লজ্জারজনক। তারা যে এক মূহুর্তের জন্যও গাদিরে খোমের ঘটনাকে মেনে নিতে পারেনি এটা তারই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। যেখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাসুল (সাঃ) এর এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তারপর আলী মুসলমানদের খলিফা হবে। তারাই আলীকে খলিফা হওয়া থেকে বঞ্চিত করে আর হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর যেই সুযোগ হাতে আসে তখনই তারা তড়িঘড়ি করে সকিফায় আবু বকরকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করে।

অতঃপর, তাদের নেতৃত্ব যখন পাকাপোক্ত হয়ে উঠে, মানুষের আবেগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে উঠে, তখন তারা খোদার বাণীর বিপরীতে একের পর এক ইজতেহাদ করতে থাকে। হযরত আলী (আঃ)কে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করার পর ফাতেমা (আঃ)কে অসন্তুষ্ট করার ঘটনা আসে এবং যাকাত সংক্রান্ত মতবিরোধের প্রেক্ষিতে রক্তারক্তি ঘটানোর অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এসবই ইজতেহাদের নমুনা। ওমরের খেলাফত লাভের পর আল্লাহ যে বিষয়কে নিষেধ করেছেন– ইজতেহাদ করে সেটাকে তিনি হালাল করেছেন যা হালাল ছিল, তা হারাম করেছেন। যেমন সুস্পষ্ট নির্দেশ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক হবে না অথচ তিনি সেটাকে তালাকে বায়েন সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উসমান যখন খলিফা হলেন তখন পূর্বসূরীদের তুলনায় আরও দু'পা অগ্রসর হয়ে তিনি ইজতিহাদের এমন সয়লাব ঘটালেন ফলে সাধারণ বিদ্রোহ দেখা দিলো যার ফলে নিজের জীবন পর্যন্ত তাকে দিতে হলো।

অতঃপর যখন আলী (আঃ) খেলাফতে আসলেন তখন তথাকথিত ধ্যান ধারনার পরিবর্তে তিনি মানুষকে সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) ও কোরআনের দিকে ফেরাতে গিয়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সেই ওমরের দ্বীন থেকে ফিরে আসতে চায়নি ফলে অসন্তোষ দানা বেধে উঠে। আমার–ত মনে হয় আলীর বিরোধিতা তারাই করেছে এবং করেছে একমাত্র প্রকৃত ইসলামের দিকে মানুষকে নিতে চাওয়ার কারণে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত
নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমি ইতিহাসে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, আমি শুধু এটুকুন পেয়েছি যে বছর মুয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করে, সকলে একত্রিত হয়ে, সে বছরের নাম "আল জামাত" রাখে। ঘটনা হলো, উসমান হত্যার পর মুসলমানেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল হযরত আলী (আঃ) এর অনুসরণকারী আর দ্বিতীয় দল হয়ে গেল মাবিয়ার অনুসারী। যখন হযরত আলী (আঃ) শহীদ হয়ে যান এবং মাবিয়া, ইমাম হাসান (আঃ) এর সঙ্গে সন্ধি করে যখন আমিরুল মুমেনিন হয়ে যায় তখন সে বছরের নাম রাখে "আল জামাত"। এর মানে এই হলো যে আহলে সুন্নাত আল জামাত সুন্নাতে মাবিয়ার অনুসরণকারী এবং মাবিয়ার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণকারী। এর মানে এরা রাসুল (সাঃ) এর খাঁটি সুন্নাতের অনুসরণকারী জামাত নয়। এজন্যে এটা মানতে হবে যে আহলে বায়েতই রাসুল (সাঃ) এর আসল সুন্নাতকে সবচেয়ে বেশী জানতেন। এটা স্বাভাবিক যে ঘরের লোকেরা ঘরের খবর বেশী জানে যেমন মক্কাবাসীরা মক্কার পথ ঘাট অন্যের চেয়ে বেশী জানে। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই রাসুল (সাঃ) এর বংশের মাসুম ইমামদের বিরোধীতা করেছি। যে বারোজন ইমাম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন আমরা সেই বারো ইমামের শত্রুদের অনুসরণ আরম্ভ করে দিয়েছি। সেই হাদিসকে মেনে নেওয়ার পরও যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বারোজন খলিফার কথা বলেছিলেন এবং এও বলে ছিলেন তারা সকলে কোরাইশ বংশের হবে। আমরা যখন খলিফা হিসাব করি তখন চতুর্থতে এসে থেমে যাই এ জন্যেই মাবিয়া আমাদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাখে। তার ইচ্ছা এই ছিল হযরত আলী (আঃ) ও আহলে বায়তের উপর থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অত্যন্ত সুকৌশলে সরায়ে ইমামগণের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা। সে এমন সুন্নাতের প্রচলন করে যাতে মানুষ এই মাবিয়ার নকল সুন্নাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মাবিয়ার এই সুন্নাত ষাট বছর পর্যন্ত চালু ছিল। ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ) ব্যতীত এটাকে কেহ খতম করতে পারে নাই। ইহার জন্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন ওমর বিন

আব্দুল আজিজ যদিও উমাইয়া ছিলেন তবুও উমাইয়ারাই তাঁর হত্যা পরিকল্পনা বানায় এবং হত্যা করায়। কেননা তিনি সুন্নাতে মাবিয়া অর্থাৎ ইমাম আলীও আহলে বায়তের উপর লানত (অভিসম্পাত) কে বন্ধ করান। হে আমার ভাইয়েরা! আমাদেরকে সন্দেহমুক্ত হয়ে সত্যকে খুঁজতে হবে, আমরা বনি আব্বাস এর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি, আমরা অন্ধকার ইতিহাসের (কালো অধ্যায়) শিকার হয়েছি। আমরা বাপ-দাদার চিন্তার দুর্বলতার শিকার হয়েছি। আমরা মাবিয়া, ওমর ইবনুল আস, মুগিরা বিন সোবার মত আরও অন্যান্য চালাক ও ধূর্ত লোকের ফাঁদে পড়েছি। আমাদের সত্যিকার ইসলাম ও সত্যিকার ইতিহাস তালাশ করতে হবে যাতে আমরা উজ্জ্বল, ভবিষ্যতের দিকে এগুতে পারি, সত্য পথ পেতে পারি। খোদার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা। নিশ্চয়ই আল্লাহ এর দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। হতে পারে আমাদের দ্বারা আল্লাহ, নবী (সাঃ) এর তিরোধানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত তিহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত মুসলিম উম্মাকে জাগিয়ে তুলে উম্মতে মুসলেমাকে ঐক্যবদ্ধ করাতে পারে। রসুল (সঃ) এর আহলে বায়েত এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, তাঁদেরকে মেনে চলার জন্য রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, *"আহলে বায়েতের আগে যাওয়ার চেষ্টা করো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।তাদের থেকে সরে যেয়ো না তাহলে দুঃখ-কষ্ট তোমার চির সাথী হয়ে যাবে।তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করো না, তাঁরা তোমাদের থেকে বেশী জ্ঞানী"।*

যদি আমরা এটা করি, তাহলে খোদা তাঁর রাগ এবং অসন্তুষ্টি আমাদের থেকে তুলে নেবেন, ভয়ের পরিবর্তে শান্তি দেবেন এবং আমাদেরকে ধরার বুকে সমৃদ্ধিশালী করে দেবেন। আমাদেরকে ধরাতে তাঁর প্রতিনিধি করে দেবেন। আমাদের জন্য ইমাম মেহেদী (আঃ) কে প্রকাশ করে দেবেন যার ওয়াদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) করেছেন। তিনি প্রকাশিত হয়ে প্রচলিত জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার দূরীভূত করে বিশ্বকে ন্যায়-ইনসাফে ভরে দেবেন, জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করবেন।

গবেষণার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বন্ধুদের প্রতি আমন্ত্রণ

এই পরিবর্তনের ফলে প্রথম থেকেই আমার মধ্যে এক আত্মিক পরিতৃপ্তির মনোভাব দেখা যাচ্ছিল। আমি অনুভব করেছি যে, আমার ভিতরের সত্ত্বা খুব পুলকিত হয়েছে, ধর্মের সঠিক আকিদা আমি, আবিষ্কার করেছি। আমি সন্দেহাতীতভাবে জেনে নিলাম যে, ইহাই সত্য ইসলাম। আমি নিজে খুব উৎফুল্ল ও গর্বিত হয়েছি যে, আল্লাহ তাঁর অশেষ অনুগ্রহে আমাকে তাঁর হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছেন। আমার মনের মধ্যে যে, তোলপাড় শুরু হয়েছিল, তা আমি গোপন রাখতে বা চুপ করে মেনে নিতে পারছি না এবং আমি নিজেকে বলছি, "সত্য আমাকে মানুষের নিকট প্রকাশ করতে হবে। "জানাও মানুষকে তোমার প্রভুর করুণার কথা" এবং এটাই সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই হলো পৃথিবীর এবং পরবর্তী জীবনের বড় পুরষ্কার এবং "যে কিনা এই সত্য জেনেও চুপ থাকে, সে একজন বোবা শয়তান এবং এ সত্য জানার পরও তার বিপথে যাওয়া ছাড়া তার কিছুই করার থাকে না।"

আল্লাহ্ বলেন, (মুসলমানগণ) *"তোমরাও পূর্বে সেইরূপ ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন"* ।- সূরা নেসা-৯৪]

আমি আমার চারজন সহকর্মীদের আমন্ত্রণ জানাই যারা, আমার সাথে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ান, তাদের মধ্যে দু'জন ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষক তৃতীয়জন আরবী এবং চতুর্থজন ইসলামী দর্শনের শিক্ষক। তাদের কেহউ কাফসা থেকে আসেননি বরং এসেছিলেন, তিউনিস, জাম্মাল এবং সিউসাহ থেকে। আমি তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমার সঙ্গে এই বিপজ্জনক বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য এবং তাদেরকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমি কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারছি না এবং কতগুলি বিষয়ের প্রতি আমার সন্দেহ জাগে এবং এ সব নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

তারা আমার আমন্ত্রণ গ্রহন করেছিল এবং সাব্যস্থ হয়, কাজের শেষে আমার বাসায় আসবেন। তাদের পৌছানোর পরে, আমি তাদেরকে "আল- মরাজাত" বইটি পড়তে দিয়েছিলাম এবং তাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, এর লেখক ইসলামের অনেক নতুন বিষয়ের দাবী করেন। বইটি, তাদের মধ্যে তিনজনের মনযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল, কিন্তু চতুর্থজন যিনি আরবী পড়াতেন, তিনি চার পাঁচবার বৈঠকের পর আমাদের ভৎসনা করলেন; বললেন, "পশ্চিমেরা এখন চন্দ্র গমন করেছে আর তুমি এখনও ইসলামের খলিফাদের নিয়ে গবেষণা করছো।"

এক মাসের মধ্যেই আমরা বইটি শেষ করলাম এবং আমরা সেই তিনজন বন্ধু আলোর দর্শন পেয়েছিল এবং আমি তাদের ঐ পথে চলার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করলাম, বিগত বছরগুলিতে অনুসন্ধানের ফলে আমি, যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সেগুলির সব কিছু আমি তাদের দিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি হেদায়েতের মধুর স্বাধ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলাম এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হতে শুরু করেছিলাম। প্রায়ই আমি কাফসার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাতাম, যারা আমার সাথে মসজিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) ও সুফি সম্প্রদায়ের সাহচর্যে থাকাকালীন পরিচিত হয়েছিল, এদের সাথে আমার কিছু বিশ্বস্ত ছাত্ররাও যোগ দিত। এক বছর অতিক্রান্তের পর, আল্লাহর বিশেষ রহমতে আমরা বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত হয়েছিলাম। আমরা সবাই আহলে বায়তের অনুসারী হয়েছিলাম। আমরা তাদের বন্ধুদের বন্ধু হলাম এবং তাঁদের শত্রুদের শত্রু হলাম। আমরা তাদের উৎসবগুলো পালন করি এবং আশুরায় বিলাপ ও শোক পালন করি।

আমার বিগত দুইটি চিঠিতে, "আল-গাদীর" উৎসব উপলক্ষ্যে, আমি আল- সৈয়দ আল খুইকে, আল-সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের আল সদরকে আমার এই জ্ঞান প্রচারের কথা জানাই, সে সময় আমরা প্রথম কাফসায় এই উৎসব পালন করেছিলাম। সবাই যখন জানতে পারলো যে, আমি শিয়া বিষয়ক জ্ঞান দান ও প্রচারনা চালাচ্ছি এবং মানুষদেরকে আহলে বায়তের পথ অনুসরণের ডাক দিচ্ছি তখন আমাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল এবং সারাদেশে

আমার বিরুদ্ধে বহুবিধ মিথ্যা প্রচারণা চলছিল। আমি ইসরাইলি এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত হলাম, এবং মানুষকে ভ্রান্ত পথে নেওয়ার চেষ্টা করছি ও মানুষকে বিরক্ত করছি, সাহাবাদের গালি দিচ্ছি, সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে ইত্যাদি। রাজধানী তিউনিসে আমি দুই বন্ধু রশিদ আল গানুসি এবং আব্দুল ফাত্তা মোরোকে সত্যের পথে আহ্বান জানাই, কিন্তু তারা আমার এই মনোভাবের জোর বিরোধিতা জানায় এবং যখন আমি আব্দুল ফাত্তার বাসায় আলাপরত ছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে, মুসলমান হিসাবে আমাদের পুনরায় বই পড়া উচিৎ এবং ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকানো উচিৎ এবং আমি তাদের কাছে, 'উদাহরণস্বরূপ, সহী আল বোখারীর বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত তুলে ধরেছিলাম, যে সব কিনা একজন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে কখনই স্বীকার করবে না। তারা আমার প্রতি খুবই রাগান্বিত হয়েছিল এবং বলেছিল, "তুমি কে যে আল- বোখারীর সমালোচনা করছো" আমি আমার সাধ্যমত তাদেরকে এই বিষয়ে গবেষনায় প্ররোচিত করেছিলাম কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং বলেছিল, "তুমি যদি নিজেকে শিয়া বানাতে চাও সেটি তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমাদের শিয়াদের পথে আনতে চেষ্টা করো না। আমাদের এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যেমন- ইসলামিক আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য আমাদের সরকারকে বাধ্য করা এবং সে অনুযায়ী আন্দোলন করা"।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম এই বলে "এটি করে কি লাভ? যদি তুমি ক্ষমতায় আসো, এখন তারা যা করছে তার চেয়ে তুমি বেশী করবে, কেননা তুমি জানো না কোন্টি সত্যিকার ইসলাম" এভাবে বিরূপ মনোভাবের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছিল।

কিছু মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের ভায়েরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার অভিযান শুরু করেছিল। কারণ সে সময়ে তারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে তাদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে গণআন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। আমার বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযোগ যে আমি সরকারী প্রতিনিধি, আমি মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের জন্য অনুপ্রাণীত করছি যাতে তারা মূল সমস্যা অর্থাৎ সরকার বিরোধী আন্দোলন হতে সরে যায়।

এভাবে ক্রমান্বয়ে লোকেরা বিশেষ করে মুসলিম ভাতৃসংঘের যুবক মুসলমান ভায়েরা এবং সুফী শেখরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে আমরা এক ঘরে হয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে আমাদের নিজেদের ভাইদের মধ্যে থেকে আমাদের বাড়িতে বসে এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছিল যেন আমরা নিজের ঘরে পরবাসী। কিন্তু আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া- আমাদের অবস্থা উন্নতির দিকে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন শহর থেকে অনেক যুবক সত্য অনুসন্ধানে আমাদের দেখতে এসেছিল এবং আমি তাদের সাধ্যমত সত্য দর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম এবং ফলশ্রুতিতে অনেক যুবক সত্যকে বুঝতে পেরেছিল; তারা তিউনিস, কায়রাওয়ান, সিউসা, সিডি-বু- জায়েদ থেকে এসেছিল। গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনে আমি ইরাকে যাই। আমি সমস্ত ইউরোপ ভ্রমন করতে থাকি এবং ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম এবং সেই বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করেছিলাম এবং আল্লাহ প্রতি অশেষ শুকরিয়া যে তারাও সত্যকে বুঝতে পেরেছিল।

আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম, যখন আমি পবিত্র নাজাফে আল- সৈয়দ মোহাম্মদ আল- সদরের বাসায় সাক্ষাত করেছিলাম। সেখানে তিনি একদল শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি আমাকে তাদের সাথে তিউনিসিয়ার শিয়া মতবাদের এর বীজ বলে পরিচয় করিয়েছিলেন। তিনি তাদের এও বলেছিলেন যে, আমার প্রথম চিঠি পাওয়ার পর তিনি কেঁদেছিলেন। কেননা সে চিঠিতে আমি লিখেছিলাম আল- গাদীরর উৎসব উৎযাপনের কথা এবং কিভাবে সত্য হীন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ন গণআন্দোলন এবং এক ঘরে করার ষড়যন্ত্র চলছিল।

আল- সৈয়দ বলেছিলেনঃ এটা সত্যের অনিবার্য দাবি এবং এজন্য আমাদের ইতিহাসের অনেক কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। কারণ আহলে বায়তের নির্দেশিত পথ

খুবই কঠিন। একদা এক লোক রাসুল (সাঃ) এর সহিত সাক্ষাত করতে এসেছিল এবং তাঁকে বলেছিল, "হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমি তোমায় ভালবাসি" তিনি প্রতি উত্তরে বলেছিলেন " অবিলম্বে দুর্দশা আশা করিও" লোকটি বলেছিল, "আমি তোমার চাচাতো ভাই আলী কে ভালবাসি" তিনি প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, "সে জন্য অনেক শত্রু আশা করিও" লোকটি বলেছিল, "আমি আল হাসান এবং আল হোসেন কে ভালবাসি" তিনি প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, "অবিলম্বে দারিদ্রের এবং শারীরিক ক্লেশের জন্য প্রস্তুত থেকো" ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কি ত্যাগ করতে পেরেছি যার জন্য কিনা আবু আব্দুল্লাহ- আল হোসেন (আঃ) তাঁর নিজের জীবন এবং তাঁর পরিবার এবং সহযোগীদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং যার জন্য সমগ্র ইতিহাসে একমাত্র আহলে বায়তের অনুসরণকারীদের জীবন ত্যাগ ও কোরবানীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে এবং আজও তারা বিশ্বব্যাপী এক বিরাট চক্রান্ত ও শত্রুতার মুকাবিলা করে চলেছে। শুধু আহলে বায়তের আনুগত্যের পুরস্কারের জন্যে। হে আমার ভাই, ইহা এমনি একটি আহবান যে ন্যায় ও সত্যের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সর্বদা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের মুকাবিলা করতে হবে এবং যদি আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে সঠিক পথে আনার জন্য তোমাকে সাহায্য করে তবে এটাই হলো সারা পৃথিবী এবং এর যতকিছু আছে সব কিছুর চাইতেও মহামূল্যবান পাওনা।

আল-সৈয়দ আল সদর আমাদেরকে মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকার জন্য উপদেশ দিলেন এবং আমাকে নিয়মিত সুন্নিভাইদের সংস্পর্শে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন যদিও তারা আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে এবং তাদের পিছনে নামাজ পড়তে বলেছিলেন যাতে সম্পর্কের বিচ্ছেদ না ঘটে এবং তাদেরকে বিকৃত ইতিহাস ও ভুল প্রচারণার নীরিহ শিকার হিসেবে বিবেচনা করতে বললেন, কারণ সাধারণ মুসলমানেরা জানে না কে তাদের শত্রু।

আল্ সৈয়দ আল খুঁই ও আমাকে একইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আল-সৈয়দ মোহাম্মদ আলী আল তাবাতাবাই আল হাকিম সব সময় আমাদেরকে চিঠির মাধ্যমে মূল্যবান উপদেশ দিতেন যা ভাইদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বড়ই প্রেরণাদায়ক।

পবিত্র নাজাফ শহর এবং শিক্ষিত আলেমগণের কারণে সেখানে আমার সফর বেশ ঘন ঘন হতে লাগলো এবং আমি নিজে নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে আমার প্রতি গ্রীষ্মের বন্ধে আমি - সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের আল- সদর এর নিকট জ্ঞান অন্বেষনে উপস্থিত হবো যেখান থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আমি মূল্যবান উপকার পেয়েছিলাম। এ ছাড়াও আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, বার ইমামগনের সকলের কবরে যেয়ে যিয়ারত করবো এবং আল্লাহ আমাকে এই ইচ্ছা পূরনে সাহায্য করেছিলেন, যার জন্য আমার পক্ষে রাশিয়া ও ইরানের সীমান্তের মধ্যবর্তী ইমাম আল- রেজা (আঃ) এর মাজার যিয়ারত করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে আরো অন্যান্য জ্ঞানী আলেমগণের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম এবং তাদের কাছ থেকে আমি অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আল- সৈয়দ আল- খুই যাঁকে আমরা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরন করি; তিনি আমাকে আমাদের আহলে বায়তের অনুসারীগণের সাহায্যে বিভিন্ন মূল্যবান বই প্রকাশনের ব্যাপারে এবং ইসলামের তাবলিগী বিভিন্ন কাজে, খুমস্ ও জাকাতের টাকা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। আমিও একটি ছোট লাইব্রেরী স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলাম, যাতে শিয়া-সুন্নি উভয় মতাদর্শের বেশ কিছু সহায়ক বই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি ইহার নাম দিয়াছিলাম "আহলে বায়ত লাইব্রেরী" এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর যে, অনেক লোক ইহা হতে উপকৃত হয়েছিল।

বছর পনের পূর্বে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যখন আমার বাড়ীর পার্শ্ববর্তী সড়কটি কাফসা নগর পরিষদ কর্তৃক "ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)" নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। যার

পরামর্শে এই কাজটি করা সম্ভব হয়েছিল তাকে আমার ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি একজন পরিশ্রমী মুসলমান এবং তিনি ইমাম আলী (আঃ) কে খুবই ভালবাসেন এবং সম্মান করেন। আমি তাকে, সারাফ আল দিনের "আল- মুরাজাত" বইটি উপহার দিয়েছিলাম। তিনি আমাদের গ্রুপের সঙ্গে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখেন। তাঁর মহানুভবতা ও উদারতার জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কৃত করুন!

কিছু দুষ্ট লোক সড়কের এই ফলকটি উঠে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে যেখানে এটা ছিল সেখানেই রয়ে গেল। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এই 'ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব সড়ক' নামে চিঠিপত্র পেয়ে থাকি এবং এই সম্মানিত নামটি আমাদের নগরের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ।

আহলে বায়েত (আঃ) এর উপদেশ অনুযায়ী এবং পবিত্র নাজাফ শহরের জ্ঞানী আলেমদের উপদেশ অনুযায়ী আমরা আমাদের অন্যান্য মাজহাবের ভাইদের সাথে সম্পর্ক রাখতে এবং একত্রে নামাজ পড়ার মধ্য দিয়ে সুন্নত ওয়াল জামাতদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলাম। ফলে লোকেরা আমাদের ঈমান- আকিদা, অজু ও নামাজ সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে।

সত্যের পথে পরিচালনা

দক্ষিণ তিউনিসিয়ার কোন এক গ্রামে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছু মহিলা বসে আলাপ করছিল। পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা বসে তাদের কথা শুনছিল। মহিলারা বলল যে, অমুকের ছেলের সঙ্গে অমুক লোকের মেয়ের বিবাহ হয়েছে। বৃদ্ধাতো অবাক! মহিলারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল- "এতে অবাক হওয়ার কি আছে"? বৃদ্ধা বলল- আমি সেই ছেলে ও মেয়েকে দুধ পান করিয়েছি। তারা দু'জনেই ভাইবোন সম্পর্ক"। ব্যাস, এই কথা মহিলারা ঘরে এসে নিজ নিজ স্বামীকে বলল এবং স্বামীরা খবর নিয়ে জানতে পারল যে, ঘটনা সত্য। সেই ছেলে ও মেয়ের মা-বাবারাও স্বীকার করল যে, তাদের ছেলে মেয়ে সেই বৃদ্ধা মহিলার দুধ পান করেছে। ব্যাস, আর যায় কোথায়। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল দাঙ্গা বেধে যায়। এমন দাঙ্গা মনে হয় কেয়ামত এসে গেছে। খোদা, পানাহ্ দাও! এক পক্ষ অপর পক্ষকে এই বলে দোষারোপ করছিল যে, এই ঘটনার জন্য তারা দায়ী। এই ঘটনা ভয়াবহতার রূপ ধারন করার কারণ এই যে, সেই বিবাহের দশ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। তাদের তিনটি সন্তানও হয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের কি হবে? মেয়েতো এই কথা শোনামাত্র বাপের বাড়ী পালিয়ে যায়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। মনের ব্যাথায় সে আত্মহত্যা করতে চায়। কারণ সে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ বসেছে। তিন তিনটা সন্তানও হয়েছে, আর সে কিছু জানে না।

সেই দাঙ্গায় উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত হয়েছে। এই খোদার গজবের সুরাহা হচ্ছিল না। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে সেই কবিলার এক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে দাঙ্গা থামে। সেই ব্যক্তি দুই পক্ষকে পরামর্শ দেয় যে, আশে পাশে বড় বড় শহরে গিয়ে আলেমদের কাছে ঘটনা খুলে বল। নিশ্চয়ই তারা এর কোন সমাধান করে দিবেন। সেই কথা মতো তারা আশে পাশের শহরগুলোতে গিয়ে আলেমদের কাছে ঘটনা খুলে বলতে লাগলেন। কিন্তু যখন কোন আলেমকে ঘটনা বলতেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই সব ফতুয়া দিতেন, এ বিবাহ হারাম এবং

স্বামী স্ত্রী চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করবে এবং দুই মাস বিরতীহীনভাবে রোযা রাখবে ও একটি গোলামকে মুক্ত করে দেয়ার আদেশের মতো আরো অনেক ফতুয়ার সম্মুখীন হতে হতো। এমতাবস্থায় তারা কাফসা নগরীতে এসে উপস্থিত হন। সেখানকার আলেমরাও সেই একই কথা বলতে লাগলেন। মালেকী ফতুয়ার মতে এক বিন্দু দুধ খেলেই সেটা রাজাত সাব্যস্ত হয়। কেননা সেই দেশের অধিকাংশ লোকই মালেকী। ইমাম মালেক দুধের সঙ্গে মদের তুলনা করেছেন, যে জিনিস বেশী খেলে নেশা হয়। তার এক বিন্দুও হারাম বলে পরিগণিত হবে। তাই এক বিন্দু দুধও রাজাত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এখানে এক ব্যক্তি তাদেরকে গোপনে আমার ঠিকানা দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই ব্যাপারে তোমরা তিজানীর সঙ্গে আলাপ কর গিয়ে। সে প্রতিটি মাযহাব সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে। কারণ আমি নিজে উনাকে অনেক আলেমের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে দেখেছি এবং প্রতিবারই তিনি জয়ী হয়েছেন। এই কথাগুলো আমাকে সেই স্বামী বলল, "যখন আমি তাদেরকে আমার লাইব্রেরীতে নিয়ে যাই, এবং সে বিবাহের ঘটনাও সবিস্তারে আমার কাছে তুলে ধরলো এবং সে বলল, মাওলানা আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে চায়। আমার বাচ্চারা মা হারা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর কোন সমাধান পাচ্ছি না। যখন সে ব্যক্তি আপনার ঠিকানা দিল এবং তার কথা মতো এখানে এসে যখন আমি এতো বই-পুস্তক দেখলাম তখন আমি খুশী হলাম এবং মনে বিশ্বাস জন্মাল যে, এখানে আমার সমস্যার সমাধান হবে। কারণ আমি আমার জীবনে এতো বই কোন দিন দেখি নাই"।

আমি তাদেরকে কিছু খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করি এবং জিজ্ঞাসা করি যে, "তোমার স্ত্রী সেই মহিলার কতবার দুধ পান করিয়াছে"। সে বলল- "আমি বলতে পারব না। আমার স্ত্রী বলেছে দুই কিংবা তিনবার পান করিয়াছে আর তার পিতাও এই কথা বলেছেন যে, "আমি দুই কিংবা তিনবার সেই বুড়ীর কাছে দুধ খাওয়াতে আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম"। তখন আমি বললাম, "যদি এই কথা ঠিক হয় তবে তোমার বিবাহ বৈধ"। এই কথা শুনা মাত্র "সে আমার পায়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ে যায়। কখনও আমার মাথাকে চুমা দিচ্ছিল, কখনও আমার হাতকে চুমা দিচ্ছিল। এবং বলতে ছিল খোদা

যেন আপনাকে এর প্রতিদান দেন। আপনি আমার শান্তির দ্বার খুলে দিলেন"। সে আমার কাছ থেকে যাবার অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের পরিবার পরিজন এবং তার কবিলার লোকদেরকে এই খুশীর খবর শুনাতে চলে গেল। সে স্বরবরাহকৃত খাদ্যও শেষ করেনি এবং কোন দলিলও আমার কাছে চায়নি।

কিন্তু একদিন পরই, সে তার পিতা, শ্বশুর, কবিলার সর্দার, জুমার নামাজের ইমাম, একজন পীর, একজন মুদাররেসসহ ৫/৭ জন নিয়ে এসে আমার কাছে হাজির হল এবং তারা সবাই আমার কাছে জানতে চাইলো আমি কিসের ভিত্তিতে এই ফতোয়া দিলাম। আমার মনে হল তারা আমার সাথে ঝগড়া করবে তাই তাদেরকে লাইব্রেরীতে নিলাম। নাস্তা করালাম। তখন তাদের একজন বললেন, "দুধ ভাইবোনের বিবাহ যেখানে কোরানে নিষেধ সেখানে কিভাবে আপনি এই বৈধতার ফতোয়া দিলেন? হাদীসেও আছে যে, বিষয়টির কারণে ঔরসজাত ছেলে-মেয়ে বিবাহ হারাম। সেই কারণে দুধ ভাই-বোনের বিবাহ হারাম- ইমাম মালেক (রঃ) এর ফতুয়াও তাই"।

আমি দেখলাম তারা অধৈর্য্যের মত একসাথে অনেকেই কথা বলছে তাই বললাম, "আপনাদের মাঝে আমার সাথে মাত্র একজনেই কথা বলবেন আর সবাই শুনবে"। এতে সাব্যস্ত হলো তাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী ও প্রবীণ পীর সাহেব কথা বলবেন।

পীর-"যেটা কোরআন-হাদীস ও ইমামগণ হারাম করে দিয়েছেন তা আপনি কিসের ভিত্তিতে, কি ভাবে হালাল বললেন"?

আমিঃ আল্লাহ যেন মাফ করুন- "অবশ্যই? আমি কিভাবে তা বৈধ বলতে পারি? তবে কথা হলো দুই ভাই বোন সম্পর্কে কোরানে রেজাতের যে আয়াত রয়েছে তা সংক্ষিপ্ত। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীসে আছে, সেখানে কিভাবে এবং কি পরিমাণ হলে, দুধ ভাইবোন সাব্যস্ত হয় তাও আছে"।

পীরঃ "ইমাম মালেক এক চামচ খেলেও বিবাহ হারাম বলেছেন"।

আমিঃ "জি-হ্যাঁ, আমিও জানি কিন্তু ইমাম মালেক সমস্ত উম্মতের জন্য দলিল নয়, তাহলে আপনি অন্য ইমামদের কি করবেন"?

পীরঃ খোদা সমস্ত ইমামদের উপর সন্তুষ্ট আছেন, তারা সবাই রাসূলে খোদা (সাঃ) এর হাদীসানুযায়ী কথা বলেন।

আমিঃ বললাম "আপনি কিয়ামতের দিন কাকে খোদার সামনে দলিল হিসাবে ব্যবহার করবেন, ইমাম মালেক (রহঃ) এর তাকলিদ করেন বলে তাকে? অথচ তার এই ফতুয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুস্পষ্ট হাদীসের বিপরীত ফতুয়া হয়ে গেছে"। আমার কথা শুনে তারা অস্থির হয়ে গেল। তাহারা বললেন, "আমরা এটা মানতে পারি না যে ইমাম মালেক সহ যারা বুজুর্গ ইমাম তার হাদীসের সুস্পষ্ট বিপরীত ফতুয়া দিতে পারেন"। আমার এই কথায় তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল কারণ ইমাম মালেক (রহঃ) সম্পর্কে এত বড় কথা ইতিপূর্বে আর কেউ বলেনি। আমি আমার কথা পরিষ্কার করার জন্য বললাম- "ইমাম মালেক সাহাবী"? তারা বললো "না" বললাম-"তাবেইন" তারা বলল; "না, বরং তিনি তাবে তাবেঈনদের অন্যতম একজন"। আমি আবার বললাম- "হযরত আলী (আঃ) ও ইমাম মালেকের মধ্যে কার কথার গুরুত্ব বেশী বলে আপনারা মনে করেন"?

পীরঃ "হযরত আলী (আঃ) কেননা তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন", তাদের একজন তখন বললো, "আলী জ্ঞানের দরজা"। আমি বললাম- তাহলে আপনারা জ্ঞানের দরজা ছেড়ে কেনো এমন ব্যক্তির অনুসরণ করছেন যিনি সাহাবীও নন আবার তাবেইনদের মধ্যেও নন, বরং যার জন্মটা ইসলামী বিশ্বের চরম বিশৃঙ্খল সময়ের পর এবং এজিদের সৈন্যরা যখন মদিনা শহর কে ধ্বংস করে দিয়েছিল তার পর। এজিদের সৈন্যরা যা কিছু করার সব করেছে, বড় বড় সাহাবায়ে কেরামদের হত্যা করেছে, নিজেরা কতিপয় বিদাতের জন্ম দিয়ে রাসুল (সাঃ) এর সুন্নতকে পরিবর্তন করেছে। এখন আপনারাই বলুন এই ধ্বংস যজ্ঞের পরের ইমামগণ মানুষের জন্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য হতে পারে যারা স্বৈরাচারী প্রশাসনের কৃপার দৃষ্টিতে থাকে এবং তাদের মর্জি মাফিক ফতোয়া দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। এই সময় উপস্থিত একজন বললেন, "আমি শুনেছি

আপনি শিয়া হয়ে গেছেন এবং আলীর ইবাদত করেন? এতটুকু বলতেই পাশের একজন তাকে খুব জোরে ঘুশি মারলো মনে হলো তাতে সে অনেক ব্যথা পেল এবং বললো "এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে এ কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না। আমি জীবনে অনেক আলেম দেখেছি কিন্তু তাঁর লাইব্রেরীর মত এতবড় লাইব্রেরী আর কোথাও দেখিনি। তাঁর কথাগুলো কতো যুক্তিসঙ্গত ভেবেছ"?

আমিঃ তাড়াতাড়ি বললাম "জি হ্যাঁ", আপনার কথাই ঠিক আমি একজন শিয়া। কিন্তু শিয়ারা কোন দিন আলীর ইবাদত করে না, তাঁরা ইমাম মালেকের পরিবর্তে হযরত আলী (আঃ) এর অনুসরণ করেন, যাঁকে তোমরাই জ্ঞানের শহরের দরজা বলছ"।

পীরঃ "তাহলে আলী (আঃ) কি একই মেয়েলোকের বুকের দুধে লালিত ছেলে-মেয়ের পরস্পরের বিবাহকে বৈধ মনে করে"?

আমিঃ "না আমি তো তা বলিনি বরং আমি বলতে চাই যদি বাচ্চা একই মায়ের একাধারে পনর বার দুধ খায় মাঝ খানে অন্য কোন মহিলার দুধ না পান করে তাহলে রাজাত বৈধ হবে এবং সেই ধরণের ছেলে মেয়েদের বিবাহ অবৈধ এতটুকু বলতেই মেয়ের বাবা খুশি হয়ে সোজা বললেন আলহামদুলিল্লাহ, আমার মেয়ে মাত্র দুই/তিনবার দুধ পান করেছে। হযরত আলী (আঃ) এর এই হাদীস আমাদেরকে মহা ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ আমরাতো নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম"।

পীরঃ এটার উপরে প্রমান উপস্থাপন করুন যাতে করে আমরা শান্ত হতে পারি। আমি সাইদ খুইর "মিনহাজ আল সালিহিন" কিতাবখানি তারে দিলাম তখন পীর সাহেব রেজাতের অধ্যায়টুকু ভাল করে পড়ে শুনালেন। তারা তো খুশিতে আটখানা বিশেষ করে স্বামী বেচারা তো মহাখুশী কারণ তার ভয় ছিল ভক্তদের সম্মুখে যদি সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হই। তারা আমার কাছে কিতাবটা ধার চাইল যাতে করে গ্রামবাসী কে প্রমান দেখানো যায়। আমি কিতাবটা দিয়ে দেওয়ার পর কৃতজ্ঞ হয়ে তারা চলে গেল, আমার ঘর থেকে বের হওয়ার কিছু পরেই এক দুশমন তাদের সাথে দেখা করে কতিপয় বিভ্রান্ত আলেমদের কাছে নিয়ে গেলেন। ব্যস যা হবার তাই হলো সবাইকে ভয় দেখানো শুরু করলো আমি নাকি

ইসরাইলের এজেন্ট। মিনহাজুস সাঙ্গিহীন একটা বিকৃত গ্রন্থ, ইরাকীরা সবাই কাফের ও মুনাফেক, শিয়ারা মাজুসি, তারা ভাই বোনেরও বিবাহ বৈধ বলে মনে করেন, তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই আমার এই বিবাহের বৈধতা বলায়, তারা ভরে ভয়ে সবাই উলটে গেল, এবং স্বামী বেচারা কে বাধ্য করলো কাফসা শহরের উচ্চ আদালতের পারিবারিক আইন এ তালাক সংক্রান্ত বিষয়ের হাকিমের কাছে এই ব্যাপারে দরখাস্ত করতে। অতপর জজ সাহেব স্বামীকে বললেন "যে তুমি রাষ্ট্রের প্রধান মুফতির কাছে দরখাস্ত কর"। অতঃপর স্বামী তিউনিস গেলেন এবং একমাস অপেক্ষা করার পর মুফতির সাক্ষাতে ঘটনার আদ্যপান্ত বিস্তারিতভাবে বললেন, তখন মুফতি সাহেব প্রশ্ন করলেন এই বিয়ের বৈধতার কথা কে বলেছে তিনি বললেন সবাই হারাম বলেছে কিন্তু একমাত্র ব্যক্তি যার নাম তিজানী সেই একমাত্র হালাল বলেছে, তখন মুফতি সাহেব আমার নাম ঠিকানা লিখে স্বামীকে বললো, "তুমি চলে যাও, আমি জজ সাহেবকে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দিব", যখন মুফতীর চিঠি স্বামীর উকিলকে দেওয়া হল উকিল সাহেব স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যে, মুফতী সাহেব এই বিবাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সাংঘাতিক দুর্বল ও ক্লান্ত স্বামী বেচারা আমাকে এসে এই ঘটনা বলল। সে অনেক দুঃখ প্রকাশ করল যে, "আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন"।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই মুফতীর উপর। সে কি করে সেই আকীদাকে বাতিল করে দিল। আমি স্বামীর কাছে সেই দরখাস্তের কপি চাইলাম যেটা মুফতী জজ সাহেবকে লিখেছেন। "আমি সেটা তিউনিসিয়ার পত্রিকায় তুলে দিব এবং জনগণকে বলবো যে মুফতী মুসলমানদের সব আকীদা সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং রাজাত সম্বন্ধে মুফতীদের কি ফতুয়া সেটাও সে জানে না"। কিন্তু স্বামী বলল যে, "আমি এই বিষয় সম্পর্কে সবিস্তারে কিছুই জানি না। চিঠির কপি আনা আমার পক্ষে অসম্ভব"। এই বলে সে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

কদিন পর জজ সাহেবের কাছ থেকে একটা নোটিশ আমার কাছে আসলো, "যে তুমি তোমার ফতুয়ার অনুকূলে সমস্ত প্রমানাদি নিয়ে আমার কোর্টে আস এবং প্রমাণ কর যে এই বিবাহ অবৈধ কেনো হবে না"।

আমি আগেই সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম তাই যথা সময়ে দলিল দস্তাবেজসহ কোর্টে হাজির হলাম, হেডক্লার্ক সাহেব আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, জেলাকোর্টের বিচারপতি, এবং ডি.সি ও সরকারী উকিল সহ তিনি বসে আছেন। আরও কয়েকজন সরকারী বেসরকারী বসেছিল। রুমের এক পাশে চোখ যেতেই দেখলাম সেই স্বামী বেচারাও বসে আছেন। সবাইকে আমি সম্মান দিয়ে সালাম দিলাম। কিন্তু মনে হলো সকলেই যেনো আমার প্রতি রেগে আছেন। আমি বসলাম। বোর্ডের প্রধান ব্যক্তিটি একটু জোরে আমাকে বললেন- "তোমার নামই কি তিজানী সামাভি"? বললাম, "জি হ্যাঁ", তিনি বললেন, "তুমি কি এ বিয়েতে বৈধতার ফতুয়া দিয়েছ"? বললাম, "আমি তো মুফতি না, তবে ইমাম ও মুসলমানদের উলেমাগণ এই বিষয় ফতুয়া দিয়েছেন," বোর্ড প্রধান বললেন, "এই জন্যই তোমাকে ডেকেছি। তুমি এখন আসামী, যদি তোমার বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দেখাতে না পার তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে এবং সোজা তোমাকে জেলে দেওয়া হবে"। তখন আমি বুঝলাম আমি একজন আসামী তবে এই ফতুয়ার জন্য নয় বরং আমার বিরুদ্ধে কিছু পাজি আলেমের কান ভারী করা বক্তব্যের কারণে। তারা বলেছে আমি একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী, সাহাবাদের গালাগাল করি, শিয়াদের প্রশংসা করি তাই প্রধান বিচারপতি বলে দিলেন যে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই জন স্বাক্ষী পাওয়া গেলে সোজা জেলে দিয়ে দেব। তৎক্ষণাত ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই ফতুয়াকে হযরত উসমানের কুর্তা বানিয়ে ফেলেছে এবং ছোট বড় সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে আমি ভাই বোনের বিবাহকে বৈধ বলি, আর শিয়াদের এটাই নাকি বিশ্বাস! এইগুলো আমি আগেই জানতাম কিন্তু আজ বোর্ডে হাকিম সাহেবের কথায় বিশ্বাস হলো। সে যাই হোক, আমি বললাম, "জনাব আমি কি নির্ভয়ে কথা বলতে পারি"? তখন প্রধান বিচারপতি বললেন, "কথা বলতে পার যেহেতু তোমার কোন উকিল নাই"।

আমিঃ প্রথমে আমি বলতে চাই যে মূলতঃ আমি কোন মুফতি নই, এই স্বামী বেচারার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন সে আমার দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে তার এই মহাবিপদ থেকে বাচার জন্য, আমি তাকে জিজ্ঞাস করেছি তোমার স্ত্রী কতবার দুধ খেয়েছিল সেই মহিলার? উত্তরে সে বলেছিল ২/৩ বার তখনি আমি তাকে এই বৈধতার ফতুয়া দিলাম।

বিচারপতিঃ "এর অর্থ হলো, তুমি ইসলাম সম্পর্কে ভাল জান আর আমরা সবাই মুর্খ"।

আমিঃ "আসতাগফিরুল্লাহ, অর্থাৎ এখানে সবাই যেহেতু হযরত মালেকের ফতুয়া মানেন আর আমি যেহেতু সব মাযহাবকে নিয়ে গবেষণা করেছি, তাই বিষয়টার সমাধান আমি পেয়েছি"।

বিচারপতিঃ "আপনি এটা কোথাই পেলেন? জনাব আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি"?

বিচারপতিঃ "হাঁ করতে পারেন"।

আমিঃ "ইসলামী মাযহাব সম্পর্কে আপনার ধারণা কি"?

বিচারপতিঃ "সব মাযহাবই সঠিক। সবাই আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণ করেন। তাদের এই মতপার্থক্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ"।

আমিঃ "তাহলে হুজুর, এই বেচারার উপর রহমত করুন, কেননা দুই মাসের বেশী হয় সে তার স্ত্রী সন্তান থেকে দূরে, অথচ অনেক মাযহাবে বিয়েটা বৈধ"।

বিচারপতিঃ রাগত স্বরে বললেন- "তোমাকে এটার প্রমাণ দেখাতে বলেছি। ওকালতি করতে বলিনি"। আমি তখন ব্যাগ থেকে সাইদ খুই এর "মেনহাজুস সালেহীন" বের করলাম এবং বললাম "এটা আহলে বায়তের মাযহাব, এতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে"। তিনি বললেন "রাখ তোমার আহলে বায়তের মাসলা এটা আমরা জানি না।

এতে আমাদের বিশ্বাস নেই"। আমি আগেই জানতাম এমন একটা কিছু হবে। তাই আহ্‌লে সুন্নাতের প্রমানাদি সাথে নিয়ে এসেছি এবং তা প্রয়োজনমতে সাজিয়ে রেখে ছিলাম। প্রথমে "বোখারী শরীফ" পরে "মুসলিম শরীফ" তার পর মাহামুদ সালতোতের "কিতাবুল ফতোয়া"। অতপর ইবনে রুশদের "বেদায়েতুল মুজতাহেদ ওয়া নেহায়েতুল মুকতাসিদ" রেখে দিলাম এছাড়াও সঙ্গে আরও অন্যান্য সুন্নি রেফারেন্সের কিতাব। আমি তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম "হুজুর আপনি কোন, কিতাবের উপরে বেশী আস্থাশীল"।

বিচারপতিঃ "বোখারী শরীফ" তখন আমি "বোখারী শরীফ" বের করে "রেজাতের" সেই নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটি খুলে দিলাম এবং বললাম, বিস্‌মিল্লাহ্ করে পড়ুন"।

বিচারপতিঃ 'না না আপনি পড়ুন',

আমি পড়তে শুরু করি..... উম্মোল মোমেনিন হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুলে খোদা (সাঃ) একই মায়ের বুকের দুধ যে ছেলে-মেয়েরা পাঁচ বার বা তার অধিক বার পান করেছে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হারাম করে দিয়ে গেছেন। বিচারপতি কিতাবটি আমার কাছ থেকে নিলেন, নিজে পড়লেন, সরকারী উকিল কে পড়তে দিলেন, সে পড়ে আরেক জনকে পড়তে দিল, এমতাবস্থায় আমি মুসলিম শরীফ বের করলাম এবং ঠিক একি হাদীসটাও সেখানে বের করে দেখালাম। অতঃপর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের "কিতাবুল ফতোয়া" গ্রন্থ খানি খুললাম, তিনি সেখানে রাজায়াত সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামদের মত পার্থক্য তুলে ধরেছেন কোন কোন উলেমা পনর বার, কেউ কেউ বলেছেন সাত বার কেউ বলেছেন পাঁচ বারের উপরে হলে বিবাহ অবৈধ। একমাত্র ইমাম মালেক প্রকাশ্য প্রমানাদিকে উপেক্ষা করে সামান্যতম দুধ পান করলেও বিবাহকে হারাম ফতুয়া দিয়েছেন। শেষ

সালতোত বলেন, "আমি মাঝখানের কথাটাকে মানি, অর্থাৎ সাত বারের বেশী পান করলে"। বিচারপতি এই সব বক্তব্য এবং প্রমানাদি পেয়ে বললেন, "ব্যাস যথেষ্ট"। অতঃপর তিনি স্বামী বেচারা কে বললেন, "এক্ষুণি যাও এবং তোমার শ্বশুরকে নিয়ে আস, সে যদি আমার সামনে সাক্ষী দেয় যে তার মেয়ে দুই/তিনবার দুধ খেয়েছে তাহলে তোমাদের বিয়ে বৈধ এবং আজই তোমরা তোমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে যেতে পার"।

বেচারা স্বামীত মহাখুশী। সরকারী উকিল সাহেব ও অন্যান্য সদস্যগণ কাজের তাড়া আছে বলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। প্রধান সবাইকে যেতে দিলেন। যখন ঘরে কেউ নেই তখন আমার দিকে চেয়ে বলেন- উসতাদ আমাকে মাফ করে দেন, মানুষ আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা দিয়েছিল এখন বুঝলাম সব বদমাশ, তারা খারাপ, পাজী লোক"।

খুশিতে মনে মনে বললাম এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন? বললাম- "খোদার শুকুর, তিনি আমার বিজয় আপনার হাতে রেখেছিলেন"। প্রধান বলেন- "শুনেছি আপনার বড় কুতুব খানা আছে, আচ্ছা সেখানে কি 'হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা' আছে"? আমি বললাম-"জি আছে"।

বিচারপতিঃ "তাহলে কিতাবটি কি আমাকে কদিনের জন্য ধার দিতে পারেন। দুবৎসর ধরে বইটি খুঁজেছি পাচ্ছি না"। আমি বললাম- "ঠিক আছে আমি দিয়ে যাব"।

বিচারপতিঃ "আপনার কি সময় হবে, আমি আপনার লাইব্রেরীতে আসবো এবং কিছু ফায়দা নেব"?

আমিঃ "তওবা তওবা! কি বলেন- আমি আপনার কাছ থেকে উপকৃত হবো, আপনার বয়স পদমর্যদা কত বেশী। আমার সপ্তাহে চার দিন ছুটি, আপনি আসলে ভালই হয়"।

অতঃপর তিনি আমার কাছ থেকে সেই ফতুয়ার রেফারেন্স হাদীসও কিতাবগুলি চাইলেন- যেন হুবহু নকল করে রাখতে পারেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যখন গেলাম আমাকে জেলে দেবে বলেছিল অথচ ফুলের মালা পেলাম। শুধু আহলে বায়তের পথে চলার কারণে আজ এই সম্মানটুকু পেয়েছি।

মেয়েটির স্বামী তার গ্রামে পুরা ঘটনা ফাস করে দিয়েছে। ফলে আশ পাশের গ্রামগুলোতেও খবর ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি স্বামীর ঘরে গেল আর বিবাহের এই ঘটনা বৈধতার মধ্যে সমাপ্ত হলো।

একদিন সেই স্বামী ভদ্রলোক বড় গাড়ী নিয়ে এসে হাজির এবং আমাকে আমার বাচ্চাকাচ্চাদের সহ তার গ্রামে যাবার দাওয়াত দিল। বলল, "গ্রামবাসী আপনার আগমনের অপেক্ষায় এবং সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে। তিনটি গরুর বাছুর কোরবানী হবে"। বললাম "ইচ্ছা ত খুব করছে কিন্তু কাফসায় অসম্ভব কাজ থাকায় আপাততঃ যেতে পারলাম না, পরে ইনশাল্লাহ। একদিন যাব"।

সেই বিচারপতিও তার বন্ধুদের সাথে পুরা ঘটনা বর্ণনা করেছে। আর একথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর কিছু লোক ক্ষমা চাওয়ার জন্য আসে, তাদের মধ্যে কিছু লোক শিয়া হয়ে যায়। এটাতো খোদার দয়া, যাকে পছন্দ করেন তাকে দান করেন, তিনি তো অসীম দয়ালু ও মেহেরবান।

আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ।